মাসুদ রানা

প্রতিশোধ

কাজী আনোয়ার হোসেন

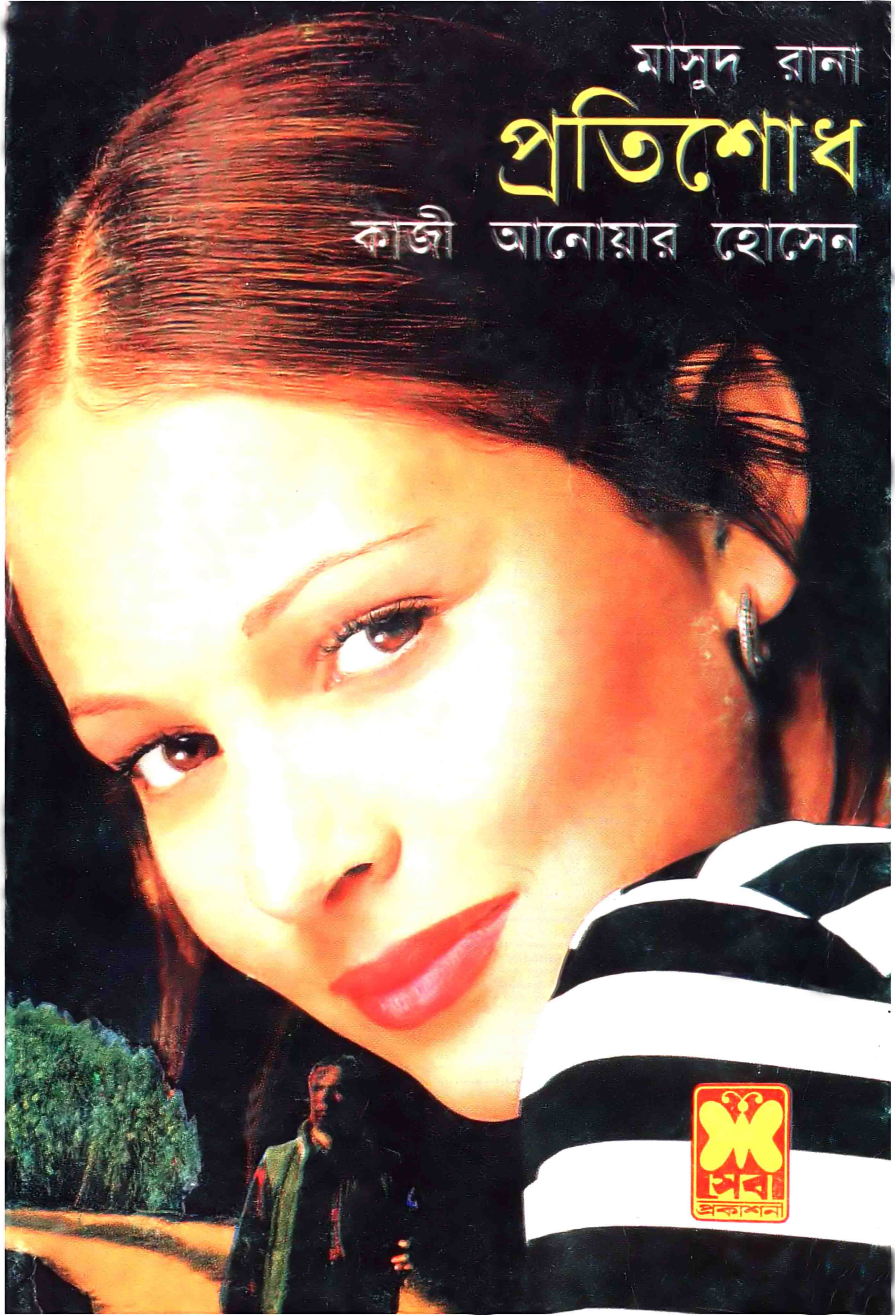

সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা

প্রতিশোধ

[দুইখণ্ড একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন

ডিউককে যদি কেউ বলে
অমুক লোকটাকে খুন করতে হবে—পারবে?
প্রথমে সে জানতে চাইবে বিনিময়ে
কত টাকা দেয়া হবে তাকে।
দরে বনলে অর্ধেক টাকা অগ্রিম চাইবে সে।
এবং টাকা নিয়ে কাজটা করবে না।
কারও কিচ্ছুটি করবার উপায় নেই—
এ নিয়ে তো আর থানা-পুলিস চলে না।
বেশ চলছিল এরকম।

কিন্তু ভুলটা করল তখনই
যখন আশি হাজার টাকা নিল সে
কেয়া চৌধুরীর কাছ থেকে—যে জানে,
টাকা নিয়ে কাজ করবার অভ্যেস নেই ওর।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মাসুদ রানা

প্রতিশোধ

(দুইখণ্ড একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-7107-7

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮২
ষষ্ঠ প্রকাশ: ২০০৪

প্রচ্ছদ: আলীম আজিজ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৮০৭৪০৮ (M—M)
জি. পি ও বক্স: ৮৫০
E-mail: Sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana
PROTISHODH
Part I & II
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনী

ছত্রিশ টাকা

প্রতিশোধ-১ ৫—৯৬
প্রতিশোধ-২ ৯৭—১৯২

সস্তায় মাসুদ রানার বইঃ ভলিউম

১-২-৩	ধ্বংস পাহাড়+ভারতনাট্যম+স্বর্ণমৃগ	৪৬/-
৪-৫-৬	দুঃসাহসিক+মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা+দুর্গম দুর্গ	৪২/-
৮-৯	সাগর সঙ্গম-১,২ (একত্রে)	২৮/-
১০-১১	রানা! সাবধান!!+বিস্মরণ	৪১/-
১২-৫৫	রুদ্রদ্বীপ+কুটচক্র	৩৮/-
১৩-১৪	নীল আতঙ্ক-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১৫-১৬	কায়রো+মৃত্যু প্রহর	৩৭/-
১৭-১৮	গুপ্তচক্র+মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র	৩৪/-
১৯-২০	রাত্রি অন্ধকার+জাল	৩১/-
২১-২২	অটল সিংহাসন+মৃত্যুর ঠিকানা	৩২/-
২৩-২৪	ক্ষ্যাপা নতক+শয়তানের দূত	৩২/-
২৫-২৬	এখনও ষড়যন্ত্র+প্রমাণ কই	২৭/-
২৭-২৮	বিপদজনক-১,২ (একত্রে)	২৯/-
২৯-৩০	রক্তের রঙ-১,২ (একত্রে)	২৮/-
৩১-৩২	অদৃশ্য শত্রু+পিশাচ দ্বীপ (একত্রে)	৩৫/-
৩৩-৩৪	বিদেশী গুপ্তচর-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৩৫-৩৬	ব্ল্যাক স্পাইডার-১,২ (একত্রে)	৩০/-
৩৭-৩৮	গুপ্তহত্যা+তিনশত্রু	৩৪/-
৩৯-৪০	অকস্মাৎ সীমান্ত-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
৪১-৪৬	সতর্ক শত্রুতান+পাগল বৈজ্ঞানিক	৪০/-
৪২-৪৩	নীল ছবি-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
৪৪-৪৫	প্রবেশ নিষেধ-১,২ (একত্রে)	৩১/-
৪৭-৪৮	এসপিওনাজ-১,২ (একত্রে)	২৯/-
৪৯-৫০	লাল পাহাড়+হঠকম্পন	৩৫/-
৫১-৫২	প্রতিহিংসা-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
৫৩-৫৪	হংকং সম্রাট-১,২ (একত্রে)	২৮/-
৫৬-৫৭-৫৮	বিদায়, রানা-১,২,৩ (একত্রে)	৪৬/-
৫৯-৬০	প্রতিদ্বন্দ্বী-১,২ (একত্রে)	২৯/-
৬১-৬২	আক্রমণ (একত্রে)	৪১/-
৬৩-৬৪	গ্রাস-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
৬৫-৬৬	স্বর্ণতরী-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৬৭-১৬১	পর্দা+বুমেরাং	৪৫/-
৬৮-৬৯	জিপসী-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
৭০-৭১	আমিই রানা-১,২ (একত্রে)	৪০/-
৭২-৭৩	সেই উ সেন-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
৭৪-৭৫	হ্যালো, সোহানা (একত্রে)	৪০/-
৭৬-৭৭	হাইজ্যাক-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৭৮-৭৯-৮০	আই লাভ ইউ, ম্যান (তিনখণ্ড একত্রে)	৫৮/-
৮১-৮২	সাগর কন্যা-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
৮৩-৮৪	পালাবে কোথায়-১,২ (একত্রে)	৪২/-
৮৫-৮৬	টার্গেট নাইন-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৮৭-৮৮	বিষ নিঃশ্বাস-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৮৯-৯০	প্রেতাত্মা-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৯১-৯২	বন্দী গগল+জিম্মি	৩৭/-
৯৩-৯৪	তুষার যাত্রা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৯৫-৯৬	স্বর্ণ সংকট-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৯৭-৯৮	সন্ন্যাসিনী+পাশের কামরা	৪১/-
৯৯-১০০	নিরাপদ কারাগার-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১০১-১০২	স্বর্গরাজ্য-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১০৩-১০৪	উদ্ধার-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
১০৫-১০৬	হামলা-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১০৭-১০৮	প্রতিশোধ-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১০৯-১১০	মেজর রাহাত-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১১১-১১২	লেনিনগ্রাদ-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১১৩-১১৪	অ্যামবুশ-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১১৫-১১৬	আরেক বারমুডা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১১৭-১১৮	বেনামী বন্দর-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১১৯-১২০	নকল রানা-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১২১-১২২	রিপোর্টার-১,২ (একত্রে)	৪২/-
১২৩-১২৪	মৃত্যুযাত্রা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১২৫-১৩১	বন্ধু+চ্যালেঞ্জ	৪৪/-
১২৬-১২৭-১২৮	সংকেত-১,২,৩ (একত্রে)	৫৫/-
১২৯-১৩০	স্পর্ধা-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১৩২-১৫৩	শত্রুপক্ষ+ছদ্মবেশী	৪৪/-
১৩৩-১৩৪	চারিদিকে শত্রু-১,২	৩৪/-
১৩৫-১৩৬	অগ্নিপুরুষ (একত্রে)	৪১/-
১৩৭-১৩৮	অন্ধকারে চিতা-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১৩৯-১৪০	মরণকামড়-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১৪১-১৪২	মরণখেলা-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১৪৩-১৪৪	অপহরণ-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৪৫-১৪৬	আবার সেই দুঃস্বপ্ন-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১৪৭-১৪৮	বিপর্যয়-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৪৯-১৫০	শান্তিদূত-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১৫১-১৫২	শ্বেত সন্ত্রাস-১,২	৫০/-
১৫৮-১৬২	সময়সীমা মধ্যরাত+মাফিয়া	৪৬/-
১৫৯-১৬০	আবার উ সেন-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
১৬২-১৬৫	কে কেন কিভাবে+কুচক্র	৪৭/-
১৭২-১৭৩	জুয়াড়ী ১,২ (একত্রে)	৩৪/-
১৮০-১৮১	সত্যবাবা-১,২	৩৮/-
১৮২-১৮৩	যাত্রীরা হুশিয়ার+অপারেশন চিতা	৪৩/-
১৯৫-১৯৬	ব্ল্যাক ম্যাজিক-১, ২ (একত্রে)	৩৬/-
১৯৭-১৯৮	তিক্ত অবকাশ-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
১৯৯-২০০	ডাবল এজেন্ট-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২০১-২০২	আমি সোহানা-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২০৩-২০৪	অগ্নিপথ-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
২০৫-২০৬-২০৭	জাপানী ফ্যানাটিক-১,২,৩ (একত্রে)	৫০/-
২০৮-২০৯	সাক্ষাৎ শয়তান-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২১০-২১১	গুপ্তঘাতক-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২১৭-২১৮	অন্তরীণকারী-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২১৯-২২০	দুই নম্বর-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২২১-২২২	কৃষ্ণপক্ষ-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২২৩-২২৪	কালোছায়া-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২২৫-২২৬	নকল বিজ্ঞানী-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
২৩৪-২৩৫	অপচ্ছায়া-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২৩৬-২৩৭	ব্যর্থ মিশন-১,২ (একত্রে)	৩১/-
২৩৮-২৩৯	নীল দংশন-১,২ (একত্রে)	৩২/-
২৪০-২৪১	সাউদিয়া ১০৩-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
২৪৫-২৪৬	নীল বজ্র ১,২ (একত্রে)	৩২/-
২৫৮-২৬৫	রক্তচোষা+সাত রাজার ধন	৪৩/-
২৬৯-২৮৫	বিগব্যাঙ+মাদকচক্র	৪১/-
২৭০-২৭১	অপারেশন বসনিয়া+টার্গেট বাংলাদেশ	৩৮/-
২৭২-২৭৩	মহাপ্রলয়+যুদ্ধবাজ	৩৯/-
২৭৬-২৭৪	মৃত্যু ফাঁদ+সীমানজ্ঞন	৪১/-
২৭৯-২৮২	মায়ান ট্রেজার+জলদস্যু	৪৭/-
২৮০-	ঝড়ের পূর্বাভাস+কালসাপ	৩৮/-
২৮১-২৭৭	আক্রান্ত দূতাবাস+শয়তানের ঘাঁটি	৪২/-
২৮৩-২৮৮	দুর্গম গিরি+তুরুপের তাস	৩৮/-
২৮৪-৩১২	মরণযাত্রা+সিক্রেট এজেন্ট	৪২/-
২৯২-২৯৮	রুদ্রবড়ু+আগুনবাণ	৩৭/-
২৯৯-২৭৮	কুহেলি রাত+ধ্বংসের নকশা	৪০/-

প্রতিশোধ-১

প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর, ১৯৮২

এক

সেই বিকেল থেকে করুণ রসে সিক্ত হচ্ছে মহানগরী ঢাকা। মাঝে মধ্যে একটু হালকা হয়, কিন্তু একেবারে থেমে যায় না, আবার শুরু হয় অঝোর ধারায় তুমুল বর্ষণ। ভাদ্র মাসের কাঠফাটা রোদে তেতে গরম উনুন হয়ে উঠেছিল শহরটা, চারটের দিকে কালো পাখির ডানার মত ছোট এক টুকরো মেঘ দেখা গেল পূব আকাশের কোণে। দেখতে দেখতে সেই কালো পাখির ডানা ঢেকে ফেলল গোটা আকাশ। সূর্য ডুবতে তখনও অনেক দেরি, কিন্তু চারদিক ছাপিয়ে নেমে এল অন্ধকার। শুরু হলো ঘন ঘন বিদ্যুৎচমক আর মুহুর্মুহু বজ্রপাতের গর্জন। কর্ম-ক্লান্ত মানুষ সময়ের আগেই ঘর-মুখো হলো। তাদের ডাকে সাড়া না দিয়ে গ্যারেজের দিকে ফিরে চলল রিকশাওয়ালারা, ফাঁকা হয়ে গেল রাস্তা-ঘাট, থেমে গেল সমস্ত ব্যস্ততা আর কোলাহল। তারপর বড় বড় ফোঁটায় নামল শান্তি-ধারা। সেই যে নামল, আর থামাথামি নেই।

রাত দশটা। মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা। এমনিতেও সন্ধের পর মৃত্যুপুরী হয়ে ওঠে অফিস পাড়াটা, শুধু এখানে সেখানে দৈত্যের নিষ্পলক চোখের মত দু'একটা নগ্ন বালব জ্বলতে দেখা যায় পানবিড়ি-সিগারেটের অস্থায়ী দোকানে—আজ তাও নেই। গোটা অফিস পাড়ায় একটা কুকুর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না আজ।

নির্জন রাস্তা। কদাচ নিঃসঙ্গ গাড়ি পানি ছিটিয়ে ছুটে যায়। কে যেন হাঁটছে। বৃষ্টি পড়ছে এখনও, কিন্তু ঝিরিঝিরি। রাস্তার দু'পাশের অফিস ভবনে প্রতিধ্বনি তুলছে একজোড়া বুট জুতোর ভারী, গম্ভীর খট খট শব্দ। ধীর, শান্ত পা ফেলে আসছে কে যেন।

নিওন সাইনের নিচে দেখা গেল মূর্তিটাকে। পরনে গোড়ালি ছুঁই ছুঁই রেনকোট। মাথায় কার্নিসওয়ালা হ্যাট। রেনকোটের দু'পকেটের গভীরে ঢুকে আছে হাত। হ্যাটটা সামনের দিকে নামানো, মুখ দেখার উপায় নেই। হাঁটার ভঙ্গিতে ড্যাম-কেয়ার একটা ভাব, পা তোলা আর ফেলার মধ্যে লক্ষ্য করা যায় আশ্চর্য প্রাণচাঞ্চল্য, শক্তি আর ক্ষিপ্রতার আভাস।

ডিউক। ঢাকার কুখ্যাত গুণ্ডা। মগবাজার, ফার্মগেট, মোহাম্মদপুর আর মতিঝিল এলাকার রংবাজ। এসব এলাকায় এমন কেউ নেই যে ডিউকের নাম শোনেনি বা নামটা শুনে যার বুক কাঁপে না। তার আসল নাম জানা নেই কারও। কেউ জানে না হঠাৎ হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায় সে, আবার হুট করে কোত্থেকেই বা ঘটে তার আবির্ভাব।

রাস্তার তেমাথায় এসে সিগারেট ধরাবার জন্যে থামল ডিউক। দিয়াশলাইয়ের

আগুনটাকে হাত দিয়ে ঘিরে বৃষ্টি থেকে আড়াল করার সময় পিছু নেয়া পায়ের আওয়াজটা কান পেতে শুনতে চেষ্টা করল ও। কিছুই ঢুকল না কানে। কাঁধের ওপর দিয়ে পিছন দিকে তাকাল। লম্বা রাস্তা অনেক দূর পর্যন্ত দেখা গেল। কেউ নেই কোথাও। সিগারেট ধরিয়ে দিয়াশলাইয়ের কাঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিল ও। বাঁক নিয়ে এগোল আবার, এবার বাড়িয়ে দিল হাঁটার গতি।

কারা যেন অনুসরণ করছে ওকে। কবে থেকে, সঠিক জানে না ও। তবে প্রথম টের পেয়েছে গতকাল রাতে এই সময়, তারমানে চব্বিশ ঘণ্টা হয়ে গেছে। চীফের নির্দেশে কিছুদিন গায়েব থাকার পর আবার আজ হপ্তাখানেক হলো ডিউক হিসেবে উদয় হয়েছে মাসুদ রানা। ঢাকার মাস্তান মহলে একটানা কয়েকদিন গরহাজির থাকলে ওকে সবাই ভুলে যেতে পারে, এই ভেবেই নির্দেশটা দিয়েছেন তিনি। ডিউককে তিনি বিশেষ কিছু কাজে লাগাচ্ছেন, তাই ইমেজটা নষ্ট হতে দিতে চান না।

নতুন করে উদয় হয়ে প্রথম দিনেই আবিষ্কার করে রানা, ডিউক হিসেবে তার কুখ্যাতি এত তাড়াতাড়ি ম্লান হবার নয়। কাউকে কিছু বলতে হয়নি, শুধু সুরত্ দেখিয়েই সতর্ক, সাবধান করে দেয়া গেছে মাস্তান মহলটাকে। ওর সাথে দেখা হয়নি, অথচ নতুন-পুরানো অনেক 'মক্কেল' এরই মধ্যে ওর উপস্থিতির খবর জেনে ফেলেছে—কেউ কেউ যোগাযোগ করারও চেষ্টা চালিয়েছে। নিছক দাম বাড়াবার জন্যেই তাদের কারও সাথে দেখা করার গরজ দেখায়নি রানা। ডিউক যে ফিরে এসেছে, পুলিসেরও তা অজানা নেই। এই ক'টা দিন ফার্মগেট, মগবাজার আর মোহাম্মদপুরে কাটিয়েছে ও। মতিঝিলে আজ এই প্রথম পা পড়ল।

অনুসরণের ঘটনা ওর জীবনে এই প্রথম ঘটছে না। লক্ষণগুলো চেনা হয়ে গেছে ওর। দেখতে না পেলেও প্রখর হয়ে ওঠা ইন্দ্রিয় আর অনুভূতি ওকে জানিয়ে দেয়—পিছনে ফেউ লেগেছে। এই ঘটনাটাও সেই রকম। কিন্তু কেন কেউ তাকে অনুসরণ করবে, বুঝতে পারছে না রানা। ঘটনাটার মধ্যে বেশ কয়েকটা বৈশিষ্ট্য আছে, সেগুলো আরও চিন্তিত করে তুলেছে ওকে। অনুসরণ করছে, অথচ আচরণে কোন রকম তাড়াহুড়ো ভাব নেই। তাছাড়া ওকে অনুসরণ করার দরকারটাই বা কি? কোথায় থাকে সে, কোথায় আড্ডা মারে, কাদের সাথে মেলামেশা করে, এসব কিছুই গোপন রাখেনি ও। ডিউকের শত্রুর সংখ্যা কম নয় তা ঠিক, কেউ কেউ সুযোগের অপেক্ষায় আছে প্রতিশোধ নেবে বলে। কিন্তু এই অনুসরণকারীদের সুযোগ দিয়েও দেখেছে রানা—কই, ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েনি তো! ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওকে শুধু চোখে চোখে রাখা হচ্ছে। কেন? ব্যাপারটা কি?

আকাশে মেঘ দেখে নিজের ডেরায় ফিরে গিয়েছিল রানা। বৃষ্টি কিছুটা ধরে আসতেই বাইরে চোখ বুলিয়ে বুঝতে পারে, ওর ঘরের দিকে নজর রাখা হয়েছে। যতটা না উদ্বেগ, তারচেয়ে রাগ হলো ওর বেশি। সাথে সাথে, বৃষ্টি মাথায় করেই বেরিয়ে পড়েছে সে ব্যাপারটার ইতি টানার জন্যে। সে-ও প্রায় দু'ঘণ্টা হয়ে গেল।

এই দু'ঘণ্টায় জানা সমস্ত কৌশল খাটিয়েছে রানা, কিন্তু কারও চেহারা দেখতে পায়নি। অনুসরণ হয়তো একজনই করছে ওকে, তবে সময়টা বোধহয় কয়েকজন পালা করে ভাগ করে নিয়েছে নিজেদের মধ্যে। একা একজন চব্বিশ ঘণ্টা ধরে চোখ

রাখছে, এ হতে পারে না। দ্রুত বাঁক নিয়ে কোন গেটের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে থেকেছে রানা, হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে হন হন করে ফিরতি পথে এগিয়েছে বেশ খানিক দূর, কিন্তু কোন ভাবেই অনুসরণকারীর কায়া দেখতে পায়নি ও। ধরাছোঁয়ার বাইরে, অদৃশ্যই রয়ে গেছে লোকটা। কিন্তু এত সহজে ধৈর্য হারাবার পাত্র নয় রানা। আগে হোক পরে হোক ভুল একটা ওদেরকে করতেই হবে।

কাছেই হোটেল জনপদ। রানা ঠিক করল, ওখানে যাবে ও। তাতে অন্তত বৃষ্টির মধ্যে দাঁড় করিয়ে রাখা হবে লোকটাকে। বলা যায় না, জনপদের দোতলা থেকে লোকটাকে এক পলক দেখেও ফেলতে পারে। বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে ভিজতে হলে আর কিছু না হোক, লোকটার উৎসাহে কিছুটা অন্তত ভাটা পড়বে।

দু'বার বাঁক নিয়ে চওড়া একটা লেনে ঢুকে পড়ল রানা। এই গলি থেকে বেরোবার আর কোন পথ নেই, হোটেলটা একেবারে শেষ মাথায়। হোটেল জনপদের মালিক লোকটা দু'মুখো সাপ, গুণ্ডাপাণ্ডাদের গালেও চুমো খায়, পুলিসের সাথেও গলায় গলায় ভাব রাখে। হোটেলটা থেকে বেরিয়ে যাবার চোরা পথ আছে, মোটা টাকার বিনিময়ে ফেরারি আসামী বা পুলিস খুঁজছে এমন লোককে সেই পথ দিয়ে পালাবার সুযোগ করে দেয় আলি হোসেন, তারপর ফোন করে লোকটাকে কোথায় পাওয়া যাবে জানিয়ে দেয় পুলিসকে। পুলিসের ইনফরমার হিসেবেও ভাল রোজগার করে সে। এই এলাকায় তার দাপট আছে, মাস্তানরা তাকে ঘাঁটাতে সাহস পায় না। কিন্তু ডিউককে যমের মত ভয় করে লোকটা। ওর সামনে পড়লে একেবারে কেঁচো হয়ে যায়। তবু লোকটার ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন থাকে রানা, জানে, বেকাদায় পেলে তাকেও এক হাত দেখিয়ে দেবার সুযোগটা ছাড়বে না আলি হোসেন।

রাত বারোটার পর হোটেলের মেইন গেট বন্ধ হয়ে গেলেও জানাশোনা বিশেষ অতিথিদের জন্যে জনপদের বার সারারাতই খোলা থাকে। হোটেলের সামনে কয়েকটা মোটর সাইকেল আর প্রাইভেট কার দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল রানা। কোন লোকজন নেই। হোটেলে ঢুকে সোজা বারের দিকে এগোল ও।

লম্বাটে একটা কামরা। দেয়ালগুলো লাল পর্দায় ঢাকা। এক কোণে ছোট একটা স্টেজ। গ্লাস-টপ টেবিল, চেয়ারগুলো বেতের তৈরি। কামরার আরেক কোণে ইংরেজী এস অক্ষরের আকৃতি নিয়ে বার কাউন্টার। কাউন্টারের পিছনে, দরজার দিকে মুখ করে একটা উঁচু চেয়ারে বসে আছে আলি হোসেন। অস্বাভাবিক ফর্সা সে, যে-কেউ ভুল করে মনে করতে পারে রক্তশূন্যতায় ভুগছে। মাথায় অকৃপণ হাতে তেল ঢেলেছে। চোখের দৃষ্টি সারাক্ষণ ছুটে বেড়াচ্ছে চারদিকে। শুধু যে নিষ্ঠুর তাই নয়, ওর মধ্যে বিবেক, নীতি, মানবিকতা—কোন কিছুরই কোন বালাই নেই। রানার দৃষ্টিতে, লোকটা কাপুরুষ। সামনাসামনি কিছু করার সাহস রাখে না, কিন্তু পিছন থেকে ছুরি মারার ওস্তাদ। কালো রঙের একটা স্যুট পরে আছে সে। লাল-সাদা ছিট কাপড়ের টাই। বাঁ-হাতের কড়ে আঙুলে একটা হীরে বসানো আঙটি।

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল রানা, কবাটের গায়ে হেলান দিয়ে চোখ বুলাল চারদিকে। রেনকোটের কিনারা থেকে টপ টপ করে পানি ঝরে ভিজিয়ে দিচ্ছে লাল কার্পেট। বৃষ্টির রাত, বারে আজ একটু বেশি ভিড় আশা করেছিল রানা। কিন্তু তা

নয়। সব মিলিয়ে দশ-বারো জন নারী-পুরুষ বসে আছে। মেয়েদের মধ্যে দু'জন অ্যাংলো। মেয়ে-পুরুষ সবাই সিগারেট টানছে। ধোঁয়ায় ভরে আছে ঘরটা। দরজা খোলার শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সবাই।

হঠাৎ করেই থেমে গেল মৃদু গুঞ্জন। কেউ কেউ মদের গ্লাস তুলছিল মুখে, মাঝপথে থেমে গেল হাত। ডিউককে যারা চেনে, বেড়ে গেল তাদের হার্টবিটের গতি। যারা চেনে না তারা দেখল, লোকটা তাদের পরিচিত কেউ নয়, আবার পুলিসও নয়, অথচ কবাটের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানার ভঙ্গির মধ্যে পরিষ্কার ফুটে আছে বেপরোয়া, কর্তৃত্বের একটা ভাব। সতর্ক, সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল সবাই।

যেন কিছুই লক্ষ্য করেনি, এই রকম নির্লিপ্ত একটা ভাব নিয়ে বারের দিকে এগোল রানা। ও কাছে পৌঁছবার আগেই জোর করা সবিনয় হাসিতে মুখ উজ্জ্বল করে তুলে একটা হাত বাড়িয়ে দিল আলি হোসেন। 'সবাই বলছিল বটে আপনি নাকি ফিরে এসেছেন,' হে হে করে হাসল সে, 'কিন্তু কথাটা আমি বিশ্বাস করিনি। আমি তো এই দেশ থেকে একবার বেরুতে পারলে এ-জন্মে আর কখনও...'

'তাতে দেশের কোন লোকসান হবে না,' আলি হোসেনের বাড়িয়ে দেয়া হাতটা গ্রাহ্য করল না রানা। 'একটা ডবল স্কচ দিতে বলো।' টুল টেনে বসল ও।

স্টেজের ওপর রোগা এক যুবক গিটার বাজাচ্ছে। পরনে লাল-সাদা চেক শার্ট। ওর নাম রায়হান গফুর। খুব ভাল বাজায়।

গ্লাসে স্কচ ভরে রানার সামনে, কাউন্টারে রাখল বেয়ারা। আলি হোসেন জিজ্ঞেস করল, 'শুনলাম আপনি নাকি ইন্ডিয়ায় গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।' অন্যদিকে তাকিয়ে আছে রানা।

'সবচেয়ে বড় গণতন্ত্রের দেশ,' চেহারায় মুগ্ধ একটা ভাব ফুটিয়ে তুলে বলল আলি হোসেন। 'আপেল, আঙুর, বেদানা, কমলা এসব নাকি পানির দর।'

'হ্যাঁ,' অন্যমনস্কভাবে বলল রানা।

'তাহলে চলে এলেন কেন?'

'আপেল, আঙুর, বেদানা, কমলা এসব কেনে একজন, আর ভিড় করে তাই দেখে বিশজন,' বলল রানা। 'এই বিশজনের ফতুয়ায় কোন পকেটই নেই। তাই চলে এলাম।'

'কিন্তু আমি শুনেছি...' হে হে করে আবার খানিক হাসল আলি হোসেন। 'শুনেছি, ইন্ডিয়ার পুলিস নাকি সাংঘাতিক কড়া। এতই কড়া যে শেষ পর্যন্ত আপনাকে...সত্যি নাকি?'

চোখ ফিরিয়ে নিজের গ্লাসের দিকে তাকাল রানা, কঠোর হয়ে উঠল চেহারা। তারপর ধীরে ধীরে মুখ তুলল। ঠাণ্ডা সুরে বলল, 'তোমার মুখের ভেতরটাকে নিয়ে আমার একটা প্ল্যান আছে। সেটা কি জানতে চাও?'

আলি হোসেনের মুখের হাসি গায়েব হয়ে গেল।

'ভাঙা বোতল ভরে দেব,' বলল রানা।

হাত কচলাতে শুরু করল আলি হোসেন। 'আরে, বস্, রাগ করেন কেন! আমি তো স্রেফ ঠাট্টা করছিলাম। আসলে আপনি আগের মতই আছেন, মানে আপনার

টেমপার…'

'আমার টেমপার নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না,' কঠিন সুরে বলল রানা।

কয়েক মুহূর্তের অস্বস্তিকর নীরবতা। তারপর নিস্তব্ধতা ভাঙল আলি হোসেনই। 'আর সব খবর কি, বস্? ব্যস্ত?'

জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল রানা, 'আমার খোঁজ করেছিল কেউ?'

'না। বেশ কিছুদিন ছিলেন না তো, অনেকেই আপনাকে ভুলে গেছে।' সতর্ক কৌতূহলের সাথে রানাকে লক্ষ্য করল আলি হোসেন। 'ফিরে এসে নতুন কোন কাজে হাত দিয়েছেন? কিংবা কিসে হাত দেবেন ভেবেছেন কিছু?'

'তোমাকে সব বলি, আর তুমি সব জানিয়ে দাও পুলিসকে, এই তো?' বলল রানা, 'তোমার পুলিস বন্ধুর খবর কি? আগের মত আসা-যাওয়া আছে তো?'

'পুলিস, বন্ধু?' বুঝেও না বোঝার ভান করল আলি হোসেন।

'ইন্সপেক্টর ফয়েজ আহমেদের কথা বলছি।'

'প্রায়ই তো আসেন। কিন্তু কই, আপনার কথা জানতে চেয়েছেন কিনা ঠিক মনে করতে পারছি না।'

তাহলে অনুসরণকারীরা পুলিস নয়। পুলিস হলে আলি হোসেনকে প্রশ্ন করত তারা।

ঘাড় ফিরিয়ে বারের চারদিকে আরেকবার দৃষ্টি বোলাতে শুরু করল রানা, ঠোঁট নেড়ে মৃদু সুরে বলল, 'আমার ব্যাপারে কারা যেন আগ্রহী হয়ে উঠেছে। আঠার মত লেগে আছে পেছনে।'

রানা যে তাকে উদ্দেশ্য করে কথাটা বলল, বুঝতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল আলি হোসেনের। 'তাই নাকি?' একটু থেমে আবার বলল সে, 'তাতে আপনার উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই, বস্। এর আগে যারাই আপনার পিছু নিয়েছে…' কথা শেষ না করে কৃত্রিম আতঙ্কে দু'হাত দিয়ে নিজের মুখ ঢাকল আলি হোসেন। তারপর মুখ থেকে হাত সরিয়ে গম্ভীর সুরে বলল, 'তাদের জন্যে আমার দুঃখ হয়।'

ঘাড় সোজা করে গ্লাসে চুমুক দিল রানা।

'আর পুলিস যদি আপনার পিছু নিয়ে থাকে, তাতেও চিন্তিত হবার কিছু নেই,' হে হে করে হাসল আলি হোসেন। 'অতীতের রেকর্ড বলে, তারাও আপনাকে ধরতে পারেনি। কিভাবে যেন ফেউ আপনি ঠিকই খাসিয়ে ফেলেন। বস্, বাড়িয়ে বলছি না…'

'প্রশংসা করলে এখুনি ভাঙা বোতল…' কথার বাকি অংশ শেষ করতে হলো না রানাকে, চেহারায় ক্ষমা-প্রার্থনার ভাব ফুটিয়ে তুলে হাত কচলাতে শুরু করল আলি হোসেন। 'এরা পুলিস নয়। জানো, কারা?'

'আমি? আমি কিভাবে জানব? ঝুট-ঝামেলার মধ্যে আজকাল নেই আমি, বস্, খোদার কসম!'

আলি হোসেনের সাদা ফ্যাকাসে মুখের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল রানা। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, ভুলে যাও। আমি নিজেই জেনে নেব।' স্কচের দাম মিটিয়ে দিল ও।

'হে হে, এর কি দরকার ছিল···আপনার জন্যে আমার এখানে অনেক কিছুই ফ্রী···'

রানা চোখ তুলে তাকাতেই থেমে গেল আলি হোসেন। টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। 'বাইরে বৃষ্টি, কিছুক্ষণ আছি আরও। কেউ যেন বিরক্ত না করে।'

'ঠিক আছে, বস্, ঠিক আছে। যতক্ষণ খুশি থাকুন আপনি। কেউ আপনাকে বিরক্ত করবে না।' হঠাৎ গলার আওয়াজ নামিয়ে জানতে চাইল, 'লাগবে নাকি, বস্? ভাল একটা মাল আছে হাতে···'

'না। তোমার ভাল মালগুলো পেত্নীর চেয়েও খারাপ—আমার জন্যে নয়।' বলে ঘুরে দাঁড়াল রানা, এগোল স্টেজের দিকে। সরাসরি কারও দিকে না তাকিয়েও বুঝল, সবাই অস্বস্তির সাথে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। স্টেজের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও। ঠোঁট থেকে সিগারেট নামাল না, বলল, 'হ্যালো, রায়হান।'

গিটার থামাল না রায়হান গফুর। ঠোঁট না নেড়ে বলল, 'হ্যালো।'

রায়হানের হাতের আঙুলের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। জাদু আছে আঙুলগুলোয়। 'খবর আছে কিছু?'

জনপ্রিয় একটা হিন্দী গানের সুর বাজাচ্ছিল রায়হান। চোখ দুটো ঢুলুঢুলু। রানার দিকে তাকালই না। বাজনা শেষ করে বলল, 'আছে। একটা মেয়ে।'

'পঞ্চাশ টাকা,' নিচু গলায় বলল রানা।

একগাল হেসে রানার দিকে তাকাল রায়হান। এখন আর চোখে ঢুলুঢুলু ভাব নেই। ঠোঁট নাড়ল না, বলল, 'আপনাকে খুঁজছিল মেয়েটা। দু'রাত আগে নঈমের সাথে এসেছিল এখানে।'

সিগারেট নামিয়ে কার্পেটের ওপর ছাই ঝাড়ল রানা। 'কে মেয়েটা?'

'আগে কখনও দেখিনি। কেমন যেন একটা অস্থির ভাব লক্ষ্য করেছি। বিদেশী হলে আশ্চর্য হব না। বয়স···বাইশ থেকে ত্রিশ। উজ্জ্বল শ্যামলা। এই বড় বড় চোখ। ম্যাক্সি পরেছিল। নাম বলল কেয়া। মনে হলো, মেয়েটাকে যমের মত ভয় পায় নঈম।'

'কি জানতে চাইল তোমার কাছে?'

'আপনি কোথায় থাকেন, ইদানীং এদিকে আসা-যাওয়া করেন কিনা, এই সব। বললাম, মাস দুই হলো আপনার সাথে দেখা নেই আমার।'

অন্যমনস্কভাবে মাথা দোলাল রানা। 'আর কিছু না?'

'বলল, আপনাকে দেখলে আমি যেন নঈমকে খবরটা জানিয়ে দিই, পাঁচশো টাকা পাব।'

আর কিছু না, শুধু ডিউকের খবর পাবার জন্যে পাঁচশো টাকা? আপন মনে হাসল রানা। 'মক্কেল' বোধহয় খুব অসুবিধের মধ্যে আছে! 'আমাকে তাহলে নঈমের সাথে দেখা করতে হয়।'

'বস্, আমাকে কিন্তু এসবের মধ্যে জড়াবেন না!' এই প্রথম ঠোঁট নাড়ল রায়হান। চেহারায় অনুরোধ ফুটে উঠল।

'ঠিক হ্যায়। ধন্যবাদ, রায়হান। রুবির কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা নিয়ে নিয়ো।'

'আপনাকে দেখে ভারি খুশি হবে রুবি।'

সুন্দর এক টুকরো হাসি ফুটল রানার মুখে। 'কেমন আছে ও?'

'ঠোঁটটা যদি ওর কাটা না হত, খোদার কসম, ওকে আমি বিয়ে করে ফেলতাম!' চাপা উত্তেজনার সাথে বলল রায়হান। 'মাইরি, মেরিলিন মনরোও ওর কাছে কিছু না। কি একখানা ফিগার!' একটু থেমে ম্লান সুরে বলল, 'ওর মত একটা মেয়ে এই নরকে ঘর-দোর পরিষ্কারের কাজ করছে, ভাবা যায় না।'

হঠাৎ বদলে গেল রানার চেহারা। ঠাণ্ডা সুরে বলল, 'আমি বলে দেবার পর ওকে আর কেউ বিরক্ত করেছিল?'

'মাথা খারাপ!' চোখ দুটো বিস্ফারিত করে বলল রায়হান। 'আপনি সাবধান করে দেবার পর কার ঘাড়ে দুটো মাথা আছে হাত বাড়ায় রুবির দিকে?'

'কারও সামনে মুখ খুলো না।' স্টেজের সামনে থেকে সরে গেল রানা।

নঈম···নঈমের কথা ভুলেই গিয়েছিল রানা। প্রায় বছর খানেক হলো লোকটাকে দেখেনি ও। তবে চেহারাটা পরিষ্কার মনে আছে। মাঝারি আকারের রোগাপাতলা লোক, বয়স ত্রিশের কোঠায়। চেহারায় অদ্ভুত একটা আভিজাত্য আছে, পোশাক-আশাকও নিখুঁত। পরিষ্কার, পরিপাটি থাকতে ভালবাসে। ঠাণ্ডা মেজাজের লোক, কখনও কারও সাথে ঝগড়া-ফ্যাসাদে জড়াতে দেখা যায়নি। ভাবতে গিয়ে এখন মনে পড়ছে, লোকটার একটা ব্যাপার খুব রহস্যময় লাগত রানার। কেউ জানত না তার রোজগারের উৎসটা কি। দেখেশুনে বুঝতে অসুবিধে হত না, ভাল কামায় সে। কেউ কেউ বলত মেয়েদের দিয়ে ব্যবসা করায়। কেউ বলত, নঈম আসলে পুলিসের ইনফর্মার। সঠিক উত্তরটা না জানলেও, এসব কথা বিশ্বাস করেনি রানা। নঈমকে কেউ কখনও কোন কাজ করতে দেখেনি। বেশির-ভাগ হোটেল রেস্তোরাঁয়, বারে, পার্কে, থিয়েটারে, সিনেমা হলে বা রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় তাকে। যতদূর মনে পড়ছে, কোন কারণ ছাড়াই লোকটাকে কেউ তেমন বিশ্বাস করত না। প্রায় সবাই এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করত তাকে। অনেক ভেবেও কারণটা উদ্ধার করতে পারেনি রানা।

মুখ চেনা লোক, রানার সাথে কথা হয়েছিল মাত্র একদিন। বছর দুই আগের ঘটনা। কোন এক হোটেলের চোরা-ঘরে বসে জুয়া খেলছিল রানা। একনাগাড়ে একাই জিতছিল ও। এই সময় ভেতরে ঢুকে খেলায় যোগ দেয় নঈম। তারপর থেকেই হারতে শুরু করল রানা। ছয় সাত দান খেলেই নঈম কিভাবে চুরি করছে সেটা হাতেনাতে ধরে ফেলল রানা। আরেক সেট কার্ড সাথে করে নিয়ে এসেছিল সে, লুকিয়ে রেখেছিল পকেটে। প্রয়োজনমত সেখান থেকে টেক্কা, রাজা, রাণী বের করে হাতের তাসের সাথে মিলিয়ে নিয়ে সবাইকে প্রায় ফতুর করে ফেলেছিল সে। ধরা পড়েও চেহারায় ভাবের কোন পরিবর্তন দেখা যায়নি, সেটাই রানার রাগের কারণ। খালি বিয়ারের বোতলটা ভেঙে নিয়ে তার মাথায় একটা ঘা বসিয়ে দিয়েছিল ও। দু'ইঞ্চি লম্বা, আধইঞ্চি গভীর একটা ক্ষত নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল নঈম। তারপরও দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে, কিন্তু তাড়াহুড়ো করে সামনে থেকে সরে গেছে নঈম।

দু'বছর আগের সেই ঘটনার কথা মনে রেখেছে নঈম? এতদিন পর প্রতিশোধ

নেবার কথা ভাবছে সে? ভাবতে ভাবতে বারের কোণের একটা টেবিল দখল করে বসল রানা। লক্ষ্য করল, কাউন্টার থেকে ওর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে আছে আলি হোসেন। বারের অতিথিরাও ওর উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন, কথা বলছে ওকে নিয়েই। মেয়েটা কে? রায়হান বলল, বিদেশী হতে পারে। অ্যাশট্রেতে সিগারেট গুঁজে আরেকটা ধরাল রানা। হতে পারে···ভাবল ও, নঈম হয়তো প্রতিশোধ নিতে চায়। কিছু লোক এই রকম হয়, কেউ অপমান করলে সারাজীবন মনে রাখে। তাই যদি হয়, নঈম ওর জন্যে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। শান্তশিষ্ট লোকেরাই প্রতিশোধ নেবার সময় ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। নঈমের অসাধারণ একটা গুণ হলো, অন্যের গোপন ব্যাপার কিভাবে যেন জেনে ফেলে।

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বারের সামনে চলে এল রানা। 'দোতলার কোন্ ঘরটা থেকে নিচের রাস্তা দেখা যায়?'

'কেন, বস্?' চেহারায় সন্দেহ নিয়ে জানতে চাইল আলি হোসেন।

'ঘরটা কিছুক্ষণের জন্যে দরকার আমার।'

খানিক ইতস্তত করে আলি হোসেন বলল, 'রুবির কামরা থেকে দেখতে পাবেন। কাজ করছে, এখনও শোয়নি··· ঠিক আছে, ওকে আমি ডেকে পাঠাচ্ছি।' বারের পিছনের দরজা খুলে ভেতরে উঁকি দিল সে। শিস দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করল কারও, বলল, 'এই রুবি, কে এসেছে দেখে যাও।' রানার সামনে ফিরে এল আবার। 'ওপরের জানালা দিয়ে কি দেখতে চান, বস্?'

'নিজের চরকায় তেল দাও,' ঝাঁঝের সাথে বলল রানা।

'আপনি শুধু শুধু রাগ করেন, বস্!' অভিমানের সুরে বলল আলি হোসেন। 'কিছু জিজ্ঞেস করতেও পারব না?'

'শাটআপ!' চাপা গলায় গর্জে উঠল রানা। 'তোমার গলার আওয়াজ শুনলে বমি পায় আমার!'

বারের পিছনের দরজা খুলে গেল, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল সতেরো বছরের একটা কালো মেয়েকে।

ধবধবে সাদা চোখের জমিতে কালো কুচকুচে মণি, সেখানে রাজ্যের বিষণ্ণতা। সরল, অদ্ভুত কোমল একটা অবয়ব। রূপ নেই, কিন্তু কমনীয়তা আছে। রঙ নেই, কিন্তু গড়ন আছে। বছর দুয়েক আগে দেখা রুবিকে চিনতেই পারল না রানা। হাড্ডিসার কাঙালিনীর মত চেহারা ছিল, এখন সেখানে যৌবনের জোয়ার জাঁকিয়ে বসেছে। মেরিলিন মনরোর সাথে তুলনা করছিল রায়হান, খুব বেশি বাড়িয়ে বলেনি। কিন্তু মুখের ক্রটিটা আগের চেয়ে উৎকট দেখাচ্ছে। ওপরের ঠোঁটটা নাকের গোড়া পর্যন্ত চেরা। রুবি যখন খুব ছোট, গ্রামের বাড়িতে থাকত, সেখানে একদিন নাকি ডাকাত পড়েছিল। ভয়ে কাঁদছিল সে, তার কান্না থামাবার জন্যে ডাকাতদের একজন ওর মুখে ছুরি মারে।

রানাকে দেখেই বদলে গেল রুবির চেহারা। আনন্দে ঝিক্ করে উঠল চোখের মণি। এক নিমেষে দূর হয়ে গেল সমস্ত বিষণ্ণতা। রক্ত উঠে এসে লালচে হয়ে উঠল মুখ।

'এই যে রুবি, আছ কেমন? চিনতে পারছ তো?' বলল রানা। ভোলেনি,

জানে রানা। দু'জন মাতাল কিশোরী রুবিকে নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করছিল, সেই অবস্থা থেকে তাকে উদ্ধার করেছিল ও। শুধু তাই নয়, আলি হোসেন খানের শার্টের কলার চেপে ধরে জানিয়ে দিয়েছিল, মেয়েটার দিকে ফের যদি কেউ হাত বাড়ায়, তোমাকে দায়ী করব আমি। ওর ওপর অদ্ভুত একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল রানার। রুবিকে বুঝতে দিয়েছে ও, ডিউক তার নিঃস্বার্থ বন্ধু। মেয়েটার কাছ থেকে কোনও রকমের সাহায্য পাবার ইচ্ছে বা চাহিদা, কোনটাই নেই ওর। কিন্তু মনে মনে জানে রানা, ডিউকের জীবনে রুবি একজন শুভাকাঙ্ক্ষী। নিখরচায় এই রকম একজন শুভাকাঙ্ক্ষী পাওয়া ভাগ্য বলে মনে করে রানা।

রানার প্রশ্নের উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করল না রুবি। মৃদু সুরে বলল, 'কেমন আছেন, ডিউক ভাই?'

চোখ পিট পিট করে একবার রানা, পরমুহূর্তে রুবির দিকে তাকাল আলি হোসেন। এদের দু'জনের সম্পর্কটাকে ঠিক বুঝতে পারে না সে। প্রেম নয়, এটুকু বোঝে। কিন্তু স্নেহ-মায়া বলে বিশ্বাস করতে পারে না। খুক খুক করে কেশে বলল সে, 'বসকে ওপরে, তোমার কামরায় নিয়ে যাও। ওখান থেকে নিচের রাস্তাটা বোধহয় মাপজোক করতে চান উনি। একটু খেয়াল রেখো।' শেষ কথাটা বলল ফিসফিস করে, যাতে শুধু রুবিই শুনতে পায়।

রুবির পিছু পিছু সরু একটা প্যাসেজে বেরিয়ে এল রানা। দরজা বন্ধ করে দিতে বারের কোলাহল, বাজনার আওয়াজ সব থেমে গেল। রুবির একটা হাত ধরে তাকে একটু কাছে টানল রানা। 'সত্যি কথা বলবে কিন্তু!' চোখ পাকিয়ে বলল ও। 'ভাবতে পেরেছিলে, আবার দেখা হবে?'

'না, ডিউক ভাই!' শান্ত, কোমল সুরে বলল রুবি। 'কেন যেন মনে হয়েছিল, আপনি বোধহয় আর ফিরে আসবেন না!' কথাটা বলেই চোখ নামিয়ে নিল রুবি, বোধহয় চোখের পানি লুকাবার জন্যে। 'মনে হয়েছিল, আপনি বোধহয় ভুলে গেছেন আমাকে।'

অভাগিনী মেয়ের মনের অবস্থা বুঝতে পারল রানা। হোটেলের সামনে ঘুরঘুর করতে দেখে ডেকে নিয়ে কাজে লাগিয়ে দিয়েছিল ওকে আলি হোসেন। সে আজ কয়েক বছর আগের কথা। অনেক করে বুঝিয়েও ওর কাছ থেকে মা-বাবার পরিচয় বের করতে পারেনি আলি হোসেন। বলত, দুনিয়ায় আমার কেউ নেই। কিন্তু রানার কাছে সত্য গোপন করেনি রুবি। কেউ নেই কথাটা ঠিক নয়। ওর বাবা আছে, কিন্তু তাকে বাবা বলে মেনে নিতে রাজি নয় রুবি। মা মারা যাবার পর ওর বাবা আবার বিয়ে করে। অনটনের সংসার, এমনিতেই দু'বেলা খাবার জোটে না, তার ওপর সৎ মায়ের অত্যাচার। তবু মুখ বুজে পড়ে ছিল রুবি। কিন্তু তাও ভাগ্যে সইল না। সৎ মায়ের মিথ্যে অভিযোগ শুনে এক রাতে বেদম মারধর করল বাবা, তারপর সেই রাতেই বের করে দিল ঘর থেকে। অসহায়, অসুস্থ কিশোরীর ঠিকানা হলো সরকারী রাস্তা।

স্নেহ-মায়া-ভালবাসা কাকে বলে জানে না রুবি। রাস্তায় বেরোবার পর থেকে অনেকেই ওর হাতে টাকা গুঁজে দিতে চেয়েছে, বিনিময়ে দিতে চেয়েছে কদর্য সোহাগ। দুর্বল হলেও, সাধ্য মত তাদেরকে বাধা দিয়েছে রুবি। তারপর হোটেল

জনপদে চাকরি হলো তার। বছর দুয়েক যেতেই এখানেও সেই একই অবস্থা। ভদ্রলোকের ছেলেরা মদ খেয়ে মাতাল হয় এখানে, রুবিকে জড়িয়ে ধরে বলতে চায়, এসো, কথা শোনো, তোমাকে আমরা রাণী বানিয়ে রাখব। আর কত দিন তাদেরকে ঠেকিয়ে রাখতে পারত কে জানে, এই সময় সব সমস্যার সমাধান হয়ে ওর জীবনে আসে ডিউক ভাই। সেই ডিউক ভাই হঠাৎ হঠাৎ গায়েব হয়ে যায়। রুবি ভাবে, এই রকম একদিন গায়েব হয়ে গিয়ে আর বোধহয় কোন দিন ফিরে আসবে না মানুষটা। কথাটা মনে হলেই নিঃসঙ্গ একাকী, অসহায় বোধ করে সে। চোখ ফেটে পানি নামে।

'তাই বুঝি? মনে হয়েছিল আমি ফিরে আসব না?' আশ্বাস দিয়ে হাসল রানা। 'তুমি একটা বোকা মেয়ে, রুবি। ঢাকার ছেলে, যাব কোথায়?' তারপর, কিছু না ভেবেই বলে বসল, 'যে ক'দিন বাইরে ছিলাম, তোমার কথা প্রায়ই মনে পড়েছে আমার। মন খারাপ করেছে।' হাত খানেক দূরে দাঁড়ানো রুবির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ উপলব্ধি করল রানা, নিজের অজান্তে একটা সত্যি কথা বেরিয়ে গেছে মুখ থেকে। অদ্ভুত একটা মায়া অনুভব করল ও। 'কিন্তু, মাত্র বছর দুয়েকের মধ্যে একি সাংঘাতিক অবস্থা হয়েছে তোমার! রাতারাতি এতটা বড় হয়ে উঠবে, ভাবতেও পারিনি! জানো, খুব সুন্দর লাগছে তোমাকে।'

ঝট করে হাত তুলে ঠোঁট ঢাকল রুবি। আরও কালো হয়ে উঠল মুখের চেহারা। 'ডিউক ভাই, আপনিও আমাকে খোঁটা দেবেন?'

'দুত্তোরি ছাই!' হাত ঝাপটা দিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করল রানা। 'তোমার ঠোঁটের ওই···ওটা একটা সামান্য ব্যাপার। ওটা মেরামত করা এমন কিছু কঠিন নয়।' হঠাৎ লাফ দিয়ে একটা আইডিয়া গজাল মাথার ভেতর। গোটা ব্যাপারটা বিবেচনা করে না দেখেই ফস করে বলে ফেলল, 'নাম করা একজন প্লাস্টিক সার্জেন আছেন, এখন থেকে তিনি ঢাকাতেই প্র্যাকটিস করবেন। তার কাছে এটা কোন সমস্যাই নয়। হাতে কিছু টাকা আসুক, প্রথম কাজ হবে তোমার এটা সারানো। আর বড়জোর মাসখানেক অপেক্ষা করতে হবে তোমাকে। খুশি?'

কিন্তু কথাগুলো বলেই বুঝল রানা, মারাত্মক একটা ভুল করে ফেলেছে ও। প্লাস্টিক সার্জারীর সাহায্যে রুবির এই ঠোঁট ঠিক করতে অনেক-অনেক টাকা লাগবে। এক মাসের মধ্যে অত টাকা পাবে কোথায় সে? বিশেষ করে ডিউক হিসেবে যতক্ষণ আছে? নিজের ওপর রেগে উঠল ও। ইদানীং বড় বেশি দুর্বল হয়ে পড়েছে মনটা। একটা কিছু দেখলেই কাতর হয়ে পড়ে। গত হপ্তায় খোঁড়া এক ভিখারিণীকে দেখে কি যে হলো, কিছু না ভেবেই পকেট থেকে পাঁচশো টাকা বের করে গুঁজে দিল বুড়ির হাতে, তারপর হন হন করে পালিয়ে এল সেখান থেকে। তার পরদিন আরেক ঘটনা। এক বুড়ো-বুড়ি থিয়েটার দেখতে এসে টিকেটের দাম বেশি দেখে ফিরে যাচ্ছিল, তাড়াহুড়ো করে দুটো টিকেট কিনে গুঁজে দিল বুড়োর হাতে, বলল, আমার বোন আসার কথা ছিল, কই এখনও তো এসে পৌঁছুল না, তাই থিয়েটার দেখব না আমি। এগুলো ফ্রী পাস, আপনারা নিতে পারেন। বলে সেখানে আর দাঁড়ায়নি ও।

কিন্তু রুবিকে কথা দিয়ে অন্নের ওপর দিয়ে পার পাবে না ও। আরও ঘাবড়ে

গেল, রুবির চেহারায় আশার আলো ফুটে উঠতে দেখে। ওর কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করেছে মেয়েটা। মনে পড়ল, রুবি ওর কথা দৈববাণী বলে মনে করে।

'এক মাসের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে আমার ঠোঁট!' উত্তেজনায় কেঁপে গেল রুবির গলা। 'সত্যি বলছেন, ডিউক ভাই?' নাগালের বাইরে পড়ে থাকা হাড়ের দিকে অভুক্ত কুকুর যেভাবে তাকিয়ে থাকে ঠিক সেভাবে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল মেয়েটা। 'দূর, আপনি আমার সাথে ঠাট্টা করছেন!'

'একমাস না হয়, দেড় মাস লাগবে। আসলে টাকার ওপর নির্ভর করছে সব। খুব বেশি হলে দু'মাস।' কথাগুলো দ্রুত, বেসুরো গলায় বলল রানা। এখনও রেগে আছে নিজের ওপর। কে জানে, অপারেশনে হয়তো পঞ্চাশ হাজার টাকা লাগবে। পুরো এক লাখও লাগতে পারে। ঠিক জানা নেই ওর। ছি ছি, বোকার মত এই রকম একটা কথা দিয়ে বসার কোন মানে হয়? কিন্তু একবার যখন কথা দেয়া হয়ে গেছে, পিছিয়ে যাবার উপায়ও নেই।

রানার গলার বেসুরো আওয়াজটা ধরতে পেরে চেহারাটা ম্লান হয়ে গেল রুবির। 'জানি, অনেক টাকা লাগবে। অত টাকা আপনি পাবেন কোথায়? তাছাড়া, পেলেও, আপনারও তো টাকার দরকার। থাকগে, এ নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। বিশ্বাস করুন, আমি কিছু মনে করব না। আপনি আমার ভালমন্দ ভাবেন, আমার জন্যে এটুকুই যথেষ্ট।'

'বড় বেশি কথা বলতে শিখেছ তুমি!' ধমকের সুরে বলল রানা। প্রতিশ্রুতিটা দিয়েছে বলে হঠাৎ খুশি হয়ে উঠল ও। রুবির জন্যে একটা কিছু করার সময় হয়েছে। ওর বিয়ে হোক, ঘর-সংসার হোক, দুঃখী মেয়েটার জীবনে সুখ হোক, এসব চায় ও। কাজেই কিছু করা দরকার। প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভালই করেছে। সেটা রক্ষা করার একটা না একটা উপায় বেরিয়ে যাবেই। রুবির শুভেচ্ছা পাবে সে, বিনিময়ে কিছুই দেবে না, এমন তো হতে পারে না। 'চলো, ওপরে নিয়ে চলো আমাকে। আরেক সময় এ নিয়ে আলোচনা করা যাবে।'

রানার দিকে পিছন ফিরতে পেরে স্বস্তি বোধ করল রুবি। চোখের কোণে পানি এসে গেছে সেটা দেখতে দিতে চায় না। সিঁড়ির ধাপ বেয়ে উঠতে শুরু করল সে। অলস পায়ে তাকে অনুসরণ করল রানা। ভাবনায় পড়ে গেছে। খানিক আগে পর্যন্ত কোন গরজ ছিল না, কিন্তু এখন কাজ পাবার জন্যে একটা অস্থিরতা অনুভব করছে। টাকা দরকার। অনেক টাকা। অসহায় একটা মেয়ের মন ভাঙার মত নিষ্ঠুর হওয়া তার পক্ষে কোনকালেই সম্ভব নয়।

দোতলায় উঠে একটা দরজার সামনে থামল রুবি। দরজা খুলে বলল, 'আসুন।'

'আলো জ্বেলো না,' বলে অন্ধকার ঘরের ভিতর ঢুকল রানা।

'কেন?' অবাক হয়ে জানতে চাইল রুবি। ঘরের ভিতর ঢুকে থমকে গেল সে।

'বাইরে একজন অপেক্ষা করছে, তোমার জানালা দিয়ে দেখব তাকে।'

জানালার সামনে এসে দাঁড়াল রানা। ওর পাশে চলে এল রুবি।

'কে, ডিউক ভাই?' নিচু গলায় জানতে চাইল রুবি।

'সেটাই তো জানতে চাই।' নিচের রাস্তাটা বাঁক পর্যন্ত দেখতে পেল রানা।

লাইটপোস্টের আলোয় বৃষ্টির ফোঁটা ছাড়া দেখা গেল না কিছু। কোথাও কোন লোকজন নেই। ধৈর্য ধরে প্রায় মিনিট পাঁচেক দাঁড়িয়ে থাকল ও। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'কোথাও ঘাপটি মেরে আছে।' বলেই গ্রিল ফিট করা জানালার স্ক্রুগুলো পরীক্ষা করতে শুরু করল। তেমন শক্তভাবে আঁটা নয় দেখে স্ক্রু-ড্রাইভারের প্রয়োজন বোধ করল না, ছোট্ট ছুরির ফলা দিয়ে এক এক করে খুলে ফেলল সবগুলো।

'ডিউক ভাই!' চাপা গলায় আঁতকে উঠল রুবি। 'একি করছেন আপনি?'

ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে জানালার উপর উঠে বসল রানা। 'একটু ভাল করে দেখা দরকার।' বলেই আরেকটা লাফ দিয়ে নিচের ঢালু ছাদে নেমে পড়ল ও। রেনকোটের খসখস আওয়াজ ছাড়া আর কিছু শুনতে পেল না রুবি। উঁকি দিয়ে দেখল, সাবধানে পা ফেলে ছাদের কিনারার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে রানা।

'কিন্তু আপনি যে পড়ে যাবেন!' চাপা গলায় বলল সে। 'ফিরে আসুন, ডিউক ভাই! খোদার দোহাই লাগে...'

'চুপ!' চাপা গলায় ধমক দিল রানা। 'কে বলেছে পড়ব? এসব আমার অভ্যেস আছে।'

'কিন্তু...।'

'আবার কথা বলে!' এবার সত্যি সত্যি রেগে উঠল রানা।

ছাদের কিনারায় এসে বসে পড়ল ও। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে এগোল ছাদের বাঁ কোণ লক্ষ্য করে। রানাকে দেখতে পাবার জন্যে জানালার বাইরে মাথাটা বের করে দিল রুবি, বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে ওর মুখে। ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকাল রানা। আবছা আলোয় রুবির চেহারা পরিষ্কার দেখতে না পেলেও বুঝল, উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে মেয়েটা। ওর জন্যে কেউ সত্যিই উদ্বিগ্ন হয়, ভাবতে ভাল লাগল। টালির ছাদ, ভিজে পিচ্ছিল হয়ে আছে। সন্তর্পণে ছাদের শেষ প্রান্তে এসে থামল ও। পাশের বিল্ডিঙের পাঁচিলটা হাত তিনেক দূরে, অনায়াসে ফাঁকটা পেরিয়ে পাঁচিলে উঠল ও। চওড়া পাঁচিল, হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে শুরু করল শিকারী বিড়ালের মত। বড় রাস্তা পর্যন্ত গেছে লম্বা পাঁচিলটা। কিন্তু তার আগেই রয়েছে একটা বিশাল গেট। গেটের দু'মাথায় সুদৃশ শেড সহ বাতি ছিল—চুরি হয়ে গেছে। এখন অন্ধকার। দেয়ালের সাথে সেঁটে চুপচাপ শুয়ে রইল ও মিনিট তিনেক। কিন্তু কিছু নড়তে চড়তে দেখল না। তবু অপেক্ষা করাই স্থির করল ও। লোকটা যে ওই গেটের আড়ালেই রয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ধৈর্য ধরে আরও মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করার পর ভাগ্য প্রসন্ন হলো। গেটের আড়াল থেকে উঁকি দিল একটা মাথা।

উঁকি দিয়ে হোটেল জনপদের গেটটা দেখে নিল লোকটা। এমনি সময়ে হোটেলের গেট দিয়ে বেরিয়ে এল দু'জন লোক। কোনও দিকে না তাকিয়ে সোজা পার্ক করা একটা কারে উঠল তারা। জ্বলে উঠল হেডলাইট। লোকটাকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা। গেটের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসছে। সদ্য স্টার্ট নেয়া গাড়ির ভেতরটা দেখতে চায়। এই গাড়িতে করে ডিউক কেটে পড়ছে কিনা সেটা জানাই তার উদ্দেশ্য। মুচকি একটু হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। হেডলাইটের আলোয় লোকটার পোশাক, চেহারা সব পরিষ্কার দেখা গেল। নীল রঙের শার্ট পরে

আছে, বাদামী রঙের ট্রাউজার। পায়ে টেনিস কেডটস, হাতে ছাতা। সরু, লম্বাটে মুখ। বেশ লম্বা। নড়াচড়ায় একটা সাবলীল ভাব লক্ষ করা গেল। আবার দেখলে চিনে নিতে অসুবিধে হবে না রানার। পাশ কাটিয়ে চলে গেল গাড়ি। আবার গেটের আড়ালে গা ঢাকা দিল নীল শার্ট।

কে হতে পারে লোকটা? আগে কখনও দেখেনি একে রানা। এই বৃষ্টির মধ্যে কেনই বা সে অপেক্ষা করছে ওর জন্যে? লোকটা একা নয়, জানে ও। বিদেশী মেয়েটা, নঈমের সাথে জনপদে এসেছিল যে, সে-ও হয়তো এদেরই একজন।

পিছিয়ে এসে ঢালু ছাতে উঠে পড়ল রানা। ফিরে এল রুবির কামরায়। নীল শার্টকে এখুনি পাকড়াও করে লাভ নেই। আগে জানা দরকার, কি চায় ওরা। নঈম নিশ্চয়ই জানে সব। আলি হোসেন বলতে পারবে কোথায় থাকে নঈম। নঈমের কাছ থেকে সব জেনে নেবে ও।

দুই

পরদিন সকাল দশটার কিছু পরে নঈমের ফ্ল্যাটে পৌঁছল রানা।

রাতটা হোটেল জনপদে কাটিয়েছে ও। কিছু বলতে হয়নি, রাতটা হোটেলেই কাটাবে শুনে সেরা কামরাটা দিয়েছিল আলি হোসেন। রাতে কোন এক সময় থেমে গিয়েছিল বৃষ্টি। সকালে বেয়ারা পাঠিয়ে জেনে নিয়েছে রানা—আশে পাশে কোথাও কোন নীল শার্টের চিহ্ন নেই। তবু হোটেল থেকে দশটার দিকে বেরোবার সময় কোন রকম ঝুঁকি না নিয়ে চোরা পথ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল আরেক রাস্তায়।

গোসল, শেভ, ব্রেকফাস্ট ইত্যাদি হোটেলেই সেরে নিয়েছে। রিকশা থেকে নামল টিকাটুলির মোড়ে। নঈমের ফ্ল্যাট গোপীবাগে, বাকি পথটা হেঁটেই যাবে ও।

চারতলা একটা ফ্ল্যাটবাড়ি, প্রতি তলায় দুটো করে ফ্ল্যাট। প্রতি ফ্ল্যাটে চারটে করে কামরা। তিনতলার একটায় থাকে নঈম। বাড়িটাকে সুরম্য অট্টালিকা বলা যেতে পারে, এক একটা ফ্ল্যাটের ভাড়া দু'আড়াই হাজার টাকার কম হবে না। এত দামী একটা ফ্ল্যাটে থাকে নঈম, একটু অবাকই হলো রানা।

কিন্তু রানা আরও অবাক হত যদি জানত নঈম এই ফ্ল্যাটের ভাড়া যোগাড় করে স্রেফ দু'আঙুলের জাদু দেখিয়ে। আঙুল দুটোই তার একমাত্র মূলধন। পেশায়—এটাকে যদি পেশা বলা যায়—নঈম একজন পকেটমার। নিজের এই পেশার কথা ঘুণাক্ষরেও কাউকে টের পেতে দেয় না সে। এই রকম একটা পেশায় নিয়োজিত বলে লজ্জিতও নয় সে।

তা আজ বছর কয়েক ধরে পকেট কাটছে নঈম। পুলিসকে যমের মত ভয় করে সে। গ্রেফতার হওয়া আর অকাল মৃত্যু, তার কাছে সমান কথা। তাই অবিশ্বাস্য সতর্কতার সাথে শিকার বাছে সে। কত পাবে তার একটা প্রায়-নিখুঁত আন্দাজ না পেলে কারও পকেটে হাত দেয়ার ঝুঁকি নেয় না। সম্ভবত নিথর বাতাসের সাথেই শুধু তুলনা চলে তার আঙুলের—অদৃশ্য, ওজন নেই, স্পর্শ নেই।

কব্জিতে জড়ানো হাতঘড়ি পর্যন্ত খুলে নিতে পারে সে, কোটের ভেতরের পকেটে রাখা মানিব্যাগ বের করে আনতে পারে অনায়াসে—মালিক কিচ্ছু টের পাবে না। কোন মেয়ের গলা থেকে নেকলেস খুলে নেয়া বা কারও হাতে ধরা ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে ভেতরের জিনিস সরিয়ে ফেলা পানির মত সহজ কাজ তার কাছে। ধরা পড়া তো দূরের কথা, আজ পর্যন্ত কেউ তাকে সন্দেহ পর্যন্ত করতে পারেনি। পুলিস বিভাগ জানে, শহরে গুণী একজন পকেটমার কাজ করছে, কিন্তু অনেকভাবে ফাঁদ পেতেও তারা কোন সুবিধে করতে পারেনি।

ফ্ল্যাটবাড়ির নিচতলায় সারি সারি দোকান-পাট। গেটে দারোয়ানও আছে। ভেতরে ঢোকার সময় অনেকেই দেখল রানাকে, দারোয়ান লোকটা তো বিশেষভাবেই লক্ষ করল।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কলিং বেলের বোতামে চাপ দিল রানা। তারপর কবাটের গায়ে কান ঠেকাল। কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল। শোনা গেল পায়ের আওয়াজ, ছিটকিনি খোলার শব্দ হলো। দরজা খুলে বাইরে তাকাল নঈম।

অনেকদিন দেখা নেই, তবু সাথে সাথে তাকে চিনতে পারল রানা। আগের চেয়ে একটু বোধহয় মোটা হয়েছে লোকটা, বাকি সব ঠিক যেমন দেখেছিল তেমনি আছে। পরিপাটি করে আঁচড়ানো চুল। নিখুঁতভাবে কামানো দাড়ি। অভিজাত চেহারা। ধোপ-দুরস্ত কাপড়-চোপড়। বোঝা গেল কোথাও বেরোবার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছিল নঈম।

রানাকে চিনতে পেরেই মৃদু একটা ঝাঁকি খেল নঈম, লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেল। তাড়াহুড়ো করে দরজাটা বন্ধ করে দেবার চেষ্টা করল সে, কিন্তু এরই মধ্যে ঘরের ভিতর একটা পা ঢুকিয়ে দিয়ে সে উপায় বন্ধ করে দিয়েছে রানা। কবাটের গায়ে হেলান দিল ও। 'হ্যালো, নঈম?' শান্ত গলায় বলল রানা। 'আমাকে তুমি খুঁজছ, তাই না?'

ঘাড় ফিরিয়ে কামরার ভেতরটা দ্রুত একবার দেখে নিল নঈম। মস্ত একটা ঢোক গিলল সে। কারণটা বুঝতে পারল না রানা, নঈমকে রীতিমত হাঁপাতে দেখে অবাকই হলো ও। চেহারায় কেমন যেন অস্থির ভাব, যা কখনও দেখাও যায়নি, মানায়ও না। যে-কোন কারণেই হোক, সাংঘাতিক ভয় পেয়েছে লোকটা।

'আপনি চলে যান!' কাঁপা কাঁপা গলায় অনুরোধ করল নঈম। 'এখন··· অসুবিধে আছে।'

নঈমের বুকে হাত রেখে ধাক্কা দিল রানা। আরেকটু হলে পড়েই যাচ্ছিল সে, দেখে মৃদু হাসল ও। ভেতরে ঢুকে বন্ধ করে দিল দরজাটা। নঈমের চুলের দিকে চোখ রেখে মাথা ঝাঁকাল ও। 'বাহ্, চমৎকার! মাথার দাগটা চুলের নিচে সুন্দর ঢেকে ফেলেছ দেখছি। কি দিয়ে মেরেছিলাম যেন? ও মনে পড়েছে, ভাঙা বিয়ারের বোতল দিয়ে।' কামরার চারদিকে তাকাল রানা। 'ভেঙে না হয় আমিই নেব, কিন্তু দরকার হলে দু'একটা বোতল তোমার ঘরে পাব তো, নঈম?'

পিছিয়ে যেতে শুরু করল নঈম। 'ডিউক সাহেব, দোহাই লাগে! আপনি চলে যান! জরুরী কাজ আছে, বাইরে যাচ্ছি আমি···আপনি পরে আসবেন।' চাপ দিয়ে হাত দুটো পালা করে ম্যাসেজ করতে শুরু করল সে। রানা ব্যাপারটা লক্ষ করছে

দেখে তাড়াতাড়ি ম্যাসেজ থামিয়ে পকেটে লুকিয়ে ফেলল হাত দুটো। 'দুঃখিত, ডিউক সাহেব। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে আমার। অন্য যে-কোন দিন আসবেন।' ভয়ের প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়ে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করল সে, কিন্তু চেহারা থেকে অস্থির ভাবটা তাতে দূর হলো না।

চারদিকে চোখ বুলাল রানা। লম্বাটে একটা কামরা, হল রুমই বলা যায়। বেশ পরিপাটি, রুচিসম্মতভাবে সাজানো। ফ্লাওয়ার ভাসে তাজাফুল, দেয়ালে বাঁধানো ফটো, বিদেশী ক্যালেন্ডার, টেবিলে দামী অ্যাশট্রে। পিছিয়ে দেয়ালে পিঠ ঠেকাল নঈম।

'তোমার কি মনে হয়, এত তাড়াতাড়ি চলে যাব বলে এসেছি আমি, নঈম?' ঠাণ্ডা সুরে জানতে চাইল রানা।

'কি···কি চান আপনি?'

'সেটা আমার চেয়ে তোমারই ভাল জানার কথা।'

হাসতে চেষ্টা করে পারল না নঈম। আগের চেয়েও অসহায়, সন্ত্রস্ত দেখাল তাকে। 'প্লীজ, এখনি আমাকে বেরিয়ে যেতে হবে···।'

'ফ্ল্যাটে তুমি একা?' জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ। কিন্তু···আমাকে ছোঁবেন না!' চেষ্টা করলেও, গলার সুরে হুমকিটা ফুটল না। 'আমি থানায় রেস করব···' থানার ভয় ডিউকের মত লোককে দেখিয়ে কোনই লাভ নেই, হঠাৎ সেটা বুঝতে পেরে থেমে গেল সে। আবার বলল, 'আমাকে ছুঁলে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি!'

'জানি,' সায় দেবার সুরে বলল রানা। 'তোমাকে ছুঁলে সারাদেশ আমার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলবে।' ভেজানো একটা দরজা দেখাল তাকে ও। 'ওখানে ঢোকো, তোমার সাথে কথা আছে।'

কয়েক সেকেন্ড নিঃশব্দে করুণ চোখে তাকিয়ে থাকার পর নঈম বুঝল, প্রতিবাদ করে বা বাধা দিয়ে লাভ নেই। দরজার দিকে এগোল সে। পিছন থেকে রানা হঠাৎ লাফ দিয়ে ঘাড়ে পড়ে কিনা দেখার জন্যে বারবার কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল সে। পিছনে রানাকে নিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকল, দরজাটা বন্ধ করে দিল রানা। চোখ বুলাল চারদিকে। বিস্ময় বাড়ল বৈ কমল না। অত্যন্ত দামী আর আরামদায়ক আসবাবে সাজানো কামরাটা। ধনী, সৌখিন লোকের লিভিং রুম হিসেবে অনায়াসে চালিয়ে দেয়া যেতে পারে। বিদেশী কাপড়ের কাভার মোড়া সোফা থেকে শুরু করে দামী টেলিভিশন, সব আছে। মেঝেতে পুরু কার্পেট। এখানেও তাজা ফুলের সমারোহ লক্ষ করা গেল। ফুলের সাথে নঈমের সহবাস হয় কিভাবে ভেবে পেল না রানা। গোলাপের গন্ধে ভরে আছে ঘরের বাতাস।

'বাহ্, চমৎকার। আরাম কাকে বলে জানো তুমি।' প্রশংসার সুরে বলল রানা। একটা ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিল ও। 'তোমাকে দেখে আমার ঈর্ষাই হচ্ছে, নঈম।'

সোফার পিছনে, দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল নঈম। এখনও হাঁপাচ্ছে সে। চেহারা দেখে মনে হলো, যে-কোন মুহূর্তে জ্ঞান হারিয়ে ফেলতে পারে।

সিগারেট ধরাবার ফাঁকে নঈমের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। এত ভয় পাবার

কি কারণ থাকতে পারে? সহজে ভয় পাবার পাত্র আর যেই হোক, নঈম নয়। জুয়ায় চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে কেমন স্বাভাবিক ছিল তার চেহারা, মনে পড়ে গেল রানার। 'কি হয়েছে তোমার?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইল ও। 'এত ভয় পাবার কি আছে?'

দুর্বোধ্য অস্পষ্ট একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল নঈমের গলার ভেতর থেকে। বিড়বিড় করে কি বলল বোঝা গেল না। রানার দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করে কি মনে করে থেমে গেল আবার। হঠাৎ মনে পড়ল, কিছু একটা বলা দরকার। তাড়াহুড়ো করে বলল, 'কই? কে বলল ভয় পেয়েছি? হবে আবার কি, কিছুই হয়নি!'

'তাহলে ধরে নিতে হয়, অভিনয় করছ তুমি,' বলল রানা। 'কেয়া কে?'

দেয়াল ঘড়ির টিক টিক ছাড়া আর কিছু শোনা গেল না অনেকক্ষণ।

'ক'দিন আগে মেয়েটাকে হোটেল জনপদের বারে নিয়ে গিয়েছিলে তুমি—কে সে?' আবার জানতে চাইল রানা।

নঈমের মুখের মাংস নানা ভঙ্গিতে নড়তে চড়তে শুরু করল। হঠাৎ ফিসফিস করে বলল, 'চলে যান! তা না হলে পুলিস ডাকব আমি।'

'বোকা নাকি?' বার দুয়েক সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল রানা। 'গিটারিস্ট রায়হানকে আমার কথা জিজ্ঞেস করেছে মেয়েটা। কেন? কে সে?'

'মিথ্যে কথা!' চাপা গলায় বলল নঈম। 'আপনাকে সে চেনেই না!' শার্টের কলার ধরে টানাটানি শুরু করল সে, ওটা যেন একটা ফাঁস হয়ে চেপে বসেছে তার গলায়। 'রায়হানকে আপনার কথা জিজ্ঞেস করার কি দরকার তার? মিথ্যে কথা!'

'ঠিক আছে, মিথ্যে কথা! কিন্তু মেয়েটা কে?'

ইতস্তত একটা ভাব দেখা গেল নঈমের চেহারায়। লোকটাকে যতই দেখছে রানা, ততই বিস্মিত হচ্ছে। ভয়ে কাহিল হয়ে আছে, সেটা বোঝা গেছে আগেই। এখন একটু একটু করে পরিষ্কার হচ্ছে, ওকে নয়, আর কাউকে ভয় পাচ্ছে সে। রানা দরজার কলিং বেল বাজাবার আগে থেকেই কুঁকড়ে ছিল লোকটা।

'আপনার চেনা কোন মেয়ে নয়,' সাবধানে বলল নঈম। 'আমার বান্ধবী। তার পরিচয়ে আপনার কি দরকার?'

মুখ থেকে ধোঁয়ার রিঙ ছাড়ল রানা, রিঙের ভেতর একটা আঙুল ঢুকিয়ে দিল। বলল, 'বোতল খুঁজে বের করি, তাই চাও?' নরম একটা ভাব ফুটে উঠল ওর চেহারায়। রিঙটা ভেঙে যেতে দেখল। 'আমাকে তুমি চেনো। দরকার হলে ভাঙা বোতল দিয়ে মাথা ফাটাতে পারি, তাও জানো। তারচেয়ে, গড় গড় করে বলে ফেলো সব। কে জানে, আমি হয়তো তোমার উপকারেই লাগব।'

শক্ত হয়ে গেল নঈম। হুমকিটা যে আসবে, জানত সে। জানে, এটা শুধুই হুমকি নয়, ডিউক তা করেও দেখাবে। মারপিটের মধ্যে কখনও ছিল না সে, এসবে তার ভারী আতঙ্ক। এরই মধ্যে রানার মুঠি পাকানো হাতের স্পর্শ অনুভব করতে শুরু করেছে মুখে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল সে, দ্রুত চিন্তা করছে কি করবে। ঘাড় ফিরিয়ে আরেকটা দরজার দিকে তাকাল সে। তারপর ফিরল রানার দিকে। রানার মনে হলো, নিঃশব্দ ইঙ্গিতে কি যেন বলতে চায় তাকে নঈম।

'আমি আপনার কোন ক্ষতি করিনি,' বলল নঈম! 'আমাকে ছোঁবেন না!' আবার দরজাটার দিকে তাকাল সে।

নঈম কি আসলে বলতে চাইছে, ফ্ল্যাটে সে একা নয়? ঠিক বুঝতে পারল না রানা। দরজার দিকে তাকাল ও, তারপর নঈমের দিকে, সবশেষে ভুরু নাচিয়ে নিঃশব্দে জানতে চাইল, ব্যাপারটা কি? দ্রুত মাথা ঝাঁকাল নঈম। তারপর একটা আঙুল খাড়া করল ঠোঁটে।

নঈমের অঙ্গভঙ্গি দেখে হাসিই পেল রানার, কিন্তু নিজেকে সামলে রাখল ও। বলল, 'কেয়ার কথা বলো আমাকে।' ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল ইজিচেয়ার থেকে।

'বলার মত কিছু নেই।' নঈমের সন্ত্রস্ত চোখের দৃষ্টি আরেকবার দরজার দিক থেকে ঘুরে এল। 'আমার চেনা একটা মেয়ে, ব্যস।'

নিঃশব্দ পায়ে নঈমের সামনে এসে দাঁড়াল রানা। ফিসফিস করে জানতে চাইল, 'কে আছে ওখানে?' তারপর স্বাভাবিক গলায় প্রশ্ন করল, 'কি করে মেয়েটা? কোত্থেকে এসেছে?'

নঈমের সারা মুখ ভিজে গেছে ঘামে। রানার চোখের সামনে তিনটে আঙুল খাড়া করল সে, ইঙ্গিতে দরজাটা দেখাল।

'মেয়েটার কথা কিছুই আমি জানি না,' বলল সে। 'রাস্তায় দেখা, সাথে করে নিয়ে এসেছিলাম। দু'দিন একসাথে ঘুরে বেড়িয়েছি, ব্যস। হঠাৎ পেয়েছিলাম, আবার হঠাৎই হারিয়ে ফেলেছি।'

'তিনজন লোক আছে ওখানে?' ফিসফিস করে জানতে চাইল রানা।

মাথা ঝাঁকাল নঈম। আগের চেয়ে একটু স্বাভাবিক দেখাল তাকে। চেহারায় একটু একটু করে আত্মবিশ্বাসের ছাপ ফুটতে শুরু করেছে।

গলা চড়িয়ে জানতে চাইল রানা, 'নীল শার্ট পরা কোন লোককে চেনো তুমি? যে আমাকে অনুসরণ করছে?'

এক নিমেষে রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে হয়ে গেল নঈমের চেহারা। টলে উঠল শরীরটা, যেন প্রচণ্ড এক ঘুসি খেয়েছে সে। 'বুঝলাম না!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, পরমুহূর্তে চিৎকার করে উঠল, 'বেরিয়ে যান! যথেষ্ট সহ্য করেছি, আর নয়! এটা আমার ফ্ল্যাট, আপনার কোন অধিকার নেই...'

হা হা করে হেসে উঠল রানা। তারপর দরজার দিকে ফিরে বলল, 'বেরিয়ে এসো তোমরা। নঈম তোমাদের কথা বলে দিয়েছে আমাকে।'

হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল নঈমের, ধপাস করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল সে।

দড়াম করে খুলে গেল দরজা। নীল শার্ট পরা লোকটা শান্তভাবে ঢুকল ভেতরে। দস্তানা পরা হাতে একটা মাউজার।

ওর দিকে পিস্তল তাক করার ঘটনা এই প্রথম নয়। ঘটনাটা যখনই ঘটে, রাগ হয় রানার, নার্ভাস বোধ করে; এই জন্যে যে ও জানে বোকা লোকটা না চাইলেও তার হাতের পিস্তল থেকে গুলি বেরিয়ে যেতে পারে। যার হাতে পিস্তল থাকে, সাধারণত সে নিজেই নার্ভাসনেসের শিকার হয়ে পড়ে—এবং তার ফলে তার আঙুল যে কোন মুহূর্তে একটা অঘটন ঘটিয়ে দিতে পারে।

কিছু লোক আছে যারা পিস্তল তাক করে গুলি করার জন্যে নয়, শুধু গুলি করার ভয় দেখাবার জন্যে। আর কিছু লোক আছে যারা গুলি করার জন্যেই পিস্তল তাক করে। নীল শার্ট পরা লোকটার চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝল রানা, একটু সুযোগ তৈরি করে দেয়া হলে নির্দ্বিধায় গুলি করবে এই লোক। তার চোখে স্থির, অপলক দৃষ্টি। চেহারায় কোন ইতস্তত ভাব নেই। হাতে পিস্তল, অথচ শান্ত স্বাভাবিক দেখাল তাকে। এদেরকে চেনা আছে রানার। একটাই পরিচয় এদের—বিপজ্জনক লোক।

'নড়াচড়া কোরো না, বন্ধু,' বলল নীল শার্ট। গলার আওয়াজ একটু খসখসে শোনাল, ঠাণ্ডা লাগলে এ-রকম হয়ে থাকে। 'তোমার ভালর জন্যেই বলছি, কোন রকম চালাকি নয়।' পিস্তলের মুখ রানার বুক লক্ষ্য করে ধরা আছে।

নীল শার্টকে ছাড়িয়ে দরজার দিকে চলে গেল রানার দৃষ্টি। দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা, হাত দুটো বুকের ওপর ভাঁজ করা। কালো সালোয়ার আর কালো কামিজ পরা মেয়েটাকে রঙচঙে উজ্জ্বল কামরার ভেতর মূর্তিমান শোক বলে মনে হলো। ছোটখাট গড়ন মেয়েটার, কিন্তু ভারি সুন্দর। গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যামলা। চোখ দুটো বড় বড়, পটলচেরা। নিখুঁতভাবে ছাঁটা কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল। ওড়নার ভেতর থেকে মাথাচাড়া দিয়ে আছে সুউন্নত বুক। কোমরের কাছটা সরু। সরাসরি রানার দিকেই তাকিয়ে আছে সে। স্থির, কঠিন দৃষ্টি, পলক নেই। চেহারায় বিতৃষ্ণা আর সন্দেহ, অবিশ্বাস আর ক্রোধের ছাপ।

'হ্যালো, কেয়া!' দেঁতো হেসে বলল রানা। 'পিস্তল তাক করার মানেটা কি জানতে পারি?'

হাতটা লম্বা করে রানাকে একটা চেয়ার দেখাল মেয়েটা। 'ওখানে বসো। হাত দুটো যেন দেখতে পাই।' চেহারার মত গলার সুরটাও কঠিন। 'তোমার সাথে কথা বলতে চাই আমরা।'

হাসিটা রানার মুখে লেগে থাকলেও, ঠোঁট জোড়া আড়ষ্ট হয়ে উঠল। নঈমের দিকে তাকাল একবার, চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে সে। রানার কাছ থেকে একটু একটু করে পিছিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখ দুটো স্থির হয়ে আছে পিস্তলের ওপর।

'সে জন্যেই কি এই লম্বা সময় ধরে অনুসরণ করছ আমাকে?' জানতে চাইল রানা। 'ডেকে কথা বলতে লজ্জা পাচ্ছিলে, নাকি ভয়...'

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বাধা দিল মেয়েটা। 'যা বলছি করো!'

নীল শার্ট পরা লোকটা পিস্তল নেড়ে জানালার পাশের একটা আর্ম-চেয়ার দেখিয়ে দিল রানাকে। 'ওখানে।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বসে পড়ল রানা। বলল, 'কিন্তু পিস্তল কেন?'

খোলা দরজা দিয়ে উঁকি দিল আরেকজন লোক। মোটাসোটা। চোখে শিশুর সারল্য। ডান জুলফির কাছ থেকে নাকের পাশ পর্যন্ত একটা শুকনো ক্ষতচিহ্ন বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে চেহারার। লোকটার একটা হাত নেই। ছোট করে ছাঁটা গোঁফ জোড়া ভারি সুন্দর। জীনসের প্যান্ট আর হাওয়াই শার্ট পরে আছে।

'সব ঠিক আছে, কেয়া?' পরিশীলিত উচ্চারণ। মাথা ঝাঁকিয়ে প্রশ্ন করার

ভঙ্গিটা সুন্দর লাগল। 'এদিকে তোমরা যদি ম্যানেজ করতে পারো, ওদিকে কাজ শেষ করতে পারি আমি।'

'পারব,' বলল কেয়া। 'তবে তুমি বরং সাথে করে নিয়ে যাও ওকে।' ইঙ্গিতে নঈমকে দেখাল সে। 'ডিউকের সাথে কথা বলার সময় কোন ঝামেলা চাই না।'

খাড়া তর্জনী নেড়ে নঈমকে ডাকল হাওয়াই শার্ট। নরম সুরে বলল, 'এসো।' গুটি গুটি পায়ে তার দিকে এগোল নঈম। এতক্ষণে রানার দিকে তাকাল হাওয়াই শার্ট। একটু হাসি ফুটল ঠোঁটে। লম্বা একটা ক্ষত থাকা সত্ত্বেও সুন্দর লাগল হাসিটা। 'আমাদের পরিচয় জানা দরকার তোমার।' ইঙ্গিতে মেয়েটাকে দেখিয়ে বলল, 'কেয়া চৌধুরী। পিস্তল ধরে আছে আকরাম খান। আমি শাহেদ আলি।' একটু থেমে আবার হাসল সে। 'কেয়া যা বলে শোনো। উপায় থাকলে এসব ঘটাতাম না আমরা, বিশ্বাস করো। পিস্তলের সামনে বসেই কথা শুনতে হবে তোমাকে। তোমার রক্তে ভায়োলেন্সের বীজ আছে, মিথ্যে বললাম? চেহারা দেখেই তো বুঝতে পারছ, মারপিটের মধ্যে নেই আমি। আর আকরাম একা তোমার সাথে এঁটে উঠবে না!' আবার শান্ত হাসি দেখা গেল তার মুখে। 'আমি যাই, একটা কাজ শেষ করতে হবে।' নঈমের দিকে তাকাল একবার। 'ও আমাদের কেউ নয়। তবে ভুল করে জড়িয়ে পড়েছে। সেজন্যে কে বেশি দুঃখিত, আমরা নাকি ও, বলা মুশকিল।' নঈমকে নিয়ে পাশের কামরায় চলে গেল সে। ভেতরে ঢুকে বন্ধ করে দিল দরজা।

রানার দিকে মুখ করে খাড়া পিঠের একটা চেয়ারে বসল কেয়া। সামনে টেবিল। সরে গিয়ে তার পিছনে দাঁড়াল আকরাম, পিস্তলটা রানার বুকের দিকে তাক করা। তার চোখে কোন ভাব নেই, চেহারাটাও শান্ত, নির্বিকার।

'সবচেয়ে আগে ব্যক্তিগত কিছু প্রশ্ন করব তোমাকে,' হঠাৎ শুরু করল কেয়া। টেবিলের ওপর পড়ে থাকা দু'হাতের আঙুল পরস্পরের খাঁজে আটকে নিল সে, সরাসরি তাকাল রানার দিকে। 'সময় নষ্ট না করে ঠিক যা জিজ্ঞেস করব তার উত্তর দেবে।'

'আমি চাই না কেউ আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাক,' গম্ভীর সুরে বলল রানা। পিস্তলের কথা সারাক্ষণ মনে আছে ওর। 'আজে বাজে প্রশ্ন না করে তোমাদের ব্যাপারটা কি তাই খুলে বলো। কি চাও তোমরা? কি মনে করো নিজেদেরকে?'

কঠিন হয়ে উঠল কেয়ার চেহারা। কেউ ঝাঁঝ দেখাবে, আর সে তা সহ্য করবে, তেমন পাত্রী নয় সে। কিন্তু মেয়েটার রেগে ওঠাটাকে গ্রাহ্য করল না রানা। যত রাগবে, ততই সুবিধে। রাগী মানুষের সাথে কি রকম ব্যবহার করতে হয়, জানা আছে ওর।

'একজন লোককে খুঁজে বের করতে চাই আমরা। তাকে দিয়ে বিশেষ একটা কাজ আছে আমাদের।' সতর্কতার সাথে শব্দ বাছাই করে বলল মেয়েটা। একটু চিন্তিত দেখাল তাকে। সামান্য একটু কুঁচকে থাকল ভুরু জোড়া। 'কিন্তু সে-প্রসঙ্গে আসার আগে আমাদের জানতে হবে, তুমি আসল লোক কিনা। মানে, তুমি সত্যি ডিউক কিনা। ভুল-ভ্রান্তির কোন ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না।'

'শুধু শুধু আমার সময় নষ্ট করছ তোমরা। আমি কাজ খুঁজছি না।'

'টাকার দরকার নেই তোমার?' জানতে চাইল কেয়া। 'আমরা টাকা দেব।'

'তাই?' চেহারায় লোভ এবং কৌতূহল ফুটিয়ে তুলতে বেগ পেতে হলো না রানাকে। 'টাকা দেবে? কত টাকা?'

ঠাণ্ডা চোখে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল কেয়া। রানার চোখেও পলক পড়ল না। মাঝখানে শুধু একটা টেবিল, কিন্তু রানা উপলব্ধি করল, দু'জনের মাঝখানে শত-সহস্র মাইলের ব্যবধান। কেন যেন মনে হলো, বড় রহস্যময়ী এক ডাইনীর পাল্লায় পড়েছে ও। মেয়েটার অন্তরের গহীন গভীরে কি ভাবনা-চিন্তা চলছে ডুব দিয়ে তা উদ্ধার করার সাধ্য নেই ওর। এই রকম একটা অদ্ভুত অনুভূতি কেন হলো, বলতে পারবে না রানা। শরীরে যৌবনের জোয়ার, অথচ সন্দেহ, অবিশ্বাস, কাঠিন্য আর তিক্ততার আবরণে চাপা পড়ে আছে স্নেহ-মমতা, প্রেম-ভালবাসা। রক্ত-মাংসের মেয়ে, অথচ মনে হয় নিষ্প্রাণ। এর সাথে এক বিছানায় শোবার কথা কল্পনাতেও আনতে পারবে না ও। মনে মনে সিদ্ধান্তে পৌঁছল, মেয়েটার জীবনে ভয়ঙ্কর একটা কিছু অবশ্যই ঘটেছে। আল্লাই মালুম, কী সেটা!

'অনেক টাকা,' বলল কেয়া। 'এক লাখ।'

কেয়ার পোশাকের দিকে তাকাল রানা। সালোয়ার-কামিজ দামী কাপড়ের তৈরি। কিন্তু তাতে কিছু প্রমাণ হয় না। শরীরে কোন অলঙ্কার নেই। দৃষ্টি পড়ল আকরামের দিকে। কাল রাতে বৃষ্টির মধ্যে ঘুরে বেড়িয়েছে, ট্রাউজারের পায়ায় কাদার দাগ, সেটা এখনও বদলায়নি। এত টাকা আছে ওদের? এক লাখ টাকা কম নয়। তবু, উৎসাহ বোধ করল রানা।

'কাজটা কি?'

'তার আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দেবে কি?' জানতে চাইল কেয়া। আগের মতই শান্ত আর দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ দেখাল তাকে। রানা উৎসাহিত হয়ে উঠেছে দেখেও চেহারায় কোন পরিবর্তন এল না। নিজের পথ থেকে এক চুল নড়তে জানে না এই মেয়ে। যার গৃহিণী হবে, বারোটা বেজে যাবে তার।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে এমন একটা হাসি দিল রানা যাতে কেয়া বুঝতে পারে তার জেদই বজায় থাকছে। 'কি জানতে চাও শুনি?' তবে মনে মনে নিজের কাছে স্বীকার করল, নাহ্, কৌতূহলী হয়ে উঠছে সে। এক লাখ টাকার ব্যাপার···সব জানা দরকার!

'তোমার নামের আগে-পিছে কিছু নেই, তুমি শুধু ডিউক নামে পরিচিত। বয়স ছাব্বিশ। কোন আত্মীয়-স্বজন নেই। বিয়ে করোনি। এসব তথ্যে কোন ভুল আছে?'

জুলফির নিচেটা আঙুল দিয়ে ঘষতে ঘষতে বলল রানা, 'নেই।' কেয়ার দিক থেকে আকরামের দিকে তাকাল ও। ভাবলেশহীন চেহারা, তাকিয়ে আছে ওরই দিকে। পিস্তল ধরা হাতটা এখন আর ওর দিকে তাক করে নেই, শরীরের পাশে ঝুলছে।

'নির্দিষ্ট কোন কাজ নিয়ে পড়ে থাকা তোমার স্বভাব নয়,' বলল কেয়া। 'আবার, সব ধরনের কাজই করো তুমি—টাকা পাবে জানলে কোন কাজেই তোমার আপত্তি থাকে না। লোক ঠকানোই তোমার বিশেষত্ব। তোমার যত

কুখ্যাতি, সব তুমি মাত্র মাস তিনেকের মধ্যে কামিয়েছ। ঢাকা শহরে ডিউক বলতেই এখন ঠগ, জোচ্চোর, জুয়াড়ী, হাইজ্যাকার, লম্পট, ডাকাত, এমনকি খুনী পর্যন্ত বোঝায়। কাজ করে দেবার কথা বলে অর্ধেক টাকা অ্যাডভান্স নাও তুমি, তারপর কাজটা করে দাও না। কাজগুলো বেআইনী বলে কেউ পুলিসের কাছে তোমার নামে অভিযোগও করতে পারে না। ঠিক?'

মিটি মিটি হাসল রানা।

'কিছুদিন বক্সার হিসেবে বিদেশে কাজ করেছ। সিকিম রাজপরিবারের একজন প্রিন্সের বডিগার্ড হিসেবেও ছিলে মাস কয়েক। ঢাকা-সিঙ্গাপর ফ্লাইটে ঘন ঘন যাওয়া-আসা করতে এক সময়, কিন্তু কাস্টমস চেকিং কড়া হয়ে ওঠায় স্মাগলিঙের পথ ছেড়ে দিতে বাধ্য হও। লোকে বলাবলি করে ঢাকার কুখ্যাত রংবাজদের মধ্যে যারা খুন হয়েছে তারা তোমার প্রাণের শত্রু ছিল, তাদের খুন হওয়ার পেছনে তোমার হাত ছিল।'

'শুনতে ভাল লাগে এই রকম আরও কিছু ঘটনা আছে,' বলল রানা। 'কিন্তু তোমরা বোধহয় সেগুলোর কথা জানতে পারোনি?' মুখে যাই বলুক, মনে মনে বাহবা দিল রানা: এত কথা জানল কিভাবে!

'তোমার সম্পর্কে সব, স-ব জানি আমরা,' ঠাণ্ডা সুরে বলল কেয়া। 'শুনতে ভাল লাগে এই রকম মাত্র একটা ঘটনার কথা বলছি, তাহলেই বুঝতে পারবে, তোমার সম্পর্কে কতটা জানি।'

সিগারেট ধরাল রানা। কারা এরা? ওর সম্পর্কে আর কি জানে? অনেক প্রশ্ন ভিড় করে এল ওর মনে।

নিজের হাত দুটোর দিকে তাকিয়ে কি যেন ভেবে নিল কেয়া, তারপর মুখ তুলে শুরু করল, 'গত বছর বাংলাদেশ পররাষ্ট্র দফতরের একজন কর্মকর্তা একটা কাজে ভাড়া করেছিল তোমাকে। প্রতিবেশী একটা দেশে গিয়ে অবন্ধুভাবাপন্ন কোন এক দেশের দূতাবাস থেকে কিছু কাগজ-পত্র চুরি করে নিয়ে আসতে হবে—এই ছিল কাজটা। কাগজগুলো দেশের জন্যে অত্যন্ত দরকারী ছিল, কিন্তু তোমাকে আগেই জানিয়ে দেয়া হয়, কাজটা করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলে সরকার তোমাকে সাহায্য করার কোন চেষ্টা করবে না। মোটা টাকার বিনিময়ে কাজটা করে দিতে রাজি হও তুমি। প্রতিবেশী দেশে গিয়ে নির্দিষ্ট দূতাবাসে ঢুকতেও অসুবিধে হয়নি তোমার, কিন্তু সেফ ভেঙে কাগজগুলো বের করার সময় অ্যামবাসাডরের সেক্রেটারির হাতে ধরা পড়ে যাও।' থামল কেয়া, নিজের হাতের দিকে তাকাল। তারপর শান্ত বলল, 'তাকে তুমি খুন করো।'

রানার জুলফির নিচে স্থির হয়ে গেল আঙুলগুলো, তারপর আবার চুলকাতে শুরু করল। চোখে উদাস, নির্লিপ্ত দৃষ্টি, যেন অন্য কোথাও পড়ে আছে মন, কেয়ার কথা শুনতে পাচ্ছে না।

'পালাবার সময় লোকের চোখে পড়ে যাও তুমি, কিন্তু সবাইকে ফাঁকি দিয়ে কেটে পড়তে পারো। পরদিন সীমান্ত টপকে দেশে ফিরে আসো, কাগজগুলো তুলে দাও সেই কর্মকর্তার হাতে। ঠিক?'

দেঁতো একটু হেসে বলল রানা, 'হয়তো। ওই ধরনের একটা ঘটনার কথা

আমার মনে থাকবে, নিশ্চয়ই এটা তোমরা আশা করো না!'

'আর কোন ঘটনার কথা শুনতে চাও?' জানতে চাইল কেয়া।

'আর কি জানো?'

'মাঝে মধ্যে হঠাৎ করে গায়েব হয়ে যাও তুমি—এই যেমন মাস দুই আগে গিয়েছিলে। তারপর হপ্তাখানেক হলো আবার তোমাকে দেখা যাচ্ছে ঢাকায়। শোনা যায়, এই দু'মাস তুমি নাকি ইন্ডিয়ায় ছিলে। সত্য-মিথ্যে যাচাই করে দেখার প্রয়োজন বোধ করিনি আমরা। তুমি সত্যি ডিউক কিনা জানতে পারলেই আমরা সন্তুষ্ট।'

'যদি হই?'

'তাহলে তোমাকে একটা কাজ দেব আমরা। পছন্দ না হলেও করতে হবে। যাতে করো, তার ব্যবস্থা করব আমরা। এবং এ কাজের জন্য নগদ এক লাখ টাকা পাবে।'

দরজা খুলে কামরায় ঢুকল শাহেদ। একটাই হাত, ট্রাউজারের পকেটে ঢোকানো। দ্রুত একবার তাকাল রানার দিকে, তারপর এগিয়ে এসে দাঁড়াল কেয়ার পাশে।

'দু'জনের বনিবনা হচ্ছে তো?' জানতে চেয়ে উৎসাহ দিয়ে হাসল সে। রানাকে লক্ষ করে একটা চোখ টিপল। 'তোমার সম্পর্কে কিছু খোঁজ-খবর নিতে হয়েছে আমাদের। প্রায় সবই জানি, কি বলো?' আলতো ভাবে কেয়ার চেয়ারের ব্যাকরেস্টে হাত রাখল সে।

'নষ্ট করার মত সময় থাকলে যে-কোন লোকের অনেক কথাই জানা যায়,' বলে পকেটে হাত ভরল রানা। সাথে সাথে মাউজার তুলল আকরাম।

'বের করো হাত!' শান্ত কিন্তু রূঢ় কণ্ঠে বলল সে। 'আস্তে আস্তে।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' তাড়াতাড়ি বলল শাহেদ। 'ডিউক কোন বোকামি করতে যাচ্ছে না। পিস্তলটা সরাও।'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'ওই জিনিসটা দেখলেই আমার ভেতর কাঁপুনি ধরে যায়। ভয়ে, না রাগে, বলা মুশকিল। সরিয়ে ফেলাই ভাল।' পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল ও। শাহেদের দিকে তাকিয়ে হাসল। 'ঠিক ধরেছ, বেঘোরে প্রাণ দেয়ার মত অতটা বোকা আমি নই।' বলে হঠাৎ হা হা করে হেসে উঠল।

'উঁহু,' শান্ত দৃঢ় সুরে শাহেদকে বলল আকরাম। 'পিস্তল সরাতে রাজি নই আমি। তুমি করতে পারো, কিন্তু ওকে আমি বিশ্বাস করি না।'

'কাজটার কথা তোলার আগে আরও একটা ব্যাপার হলো,' কে কি বলছে না বলছে সেদিকে মন না দিয়ে শুরু করল কেয়া, 'তুমি, ডিউক...'

'আমি কি বলছি শুনছ?' কেয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইল আকরাম। 'ওকে আমি বিশ্বাস করি না—'

তীক্ষ্ণ, কর্কশ শোনাল কেয়ার গলা। 'চুপ করো! আমি কথা বলছি! একদম চুপ!'

আকরামের দিকে চোখ পাকিয়ে তাকাল রানা। 'অর্ডার!' গলার আওয়াজ ভারী, ঘড়ঘড়ে করে তুলে তাকে ব্যঙ্গ করল।

'তোমাকে আর একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার আছে আমার,' রানার দিকে ফিরে বলল কেয়া। কালো চোখ জোড়া জ্বলজ্বল করছে।

আবার সেই দেঁতো হাসি দেখা গেল রানার মুখে।

খানিক ইতস্তত করল কেয়া, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল শাহেদের দিকে। 'তুমিই জিজ্ঞেস করো, শাহেদ।'

'ও—হ্যাঁ,' বলল শাহেদ। 'ডিউক, কিছু যদি মনে না করো, তোমার বুক আর পিঠটা দেখি তো। কেন দেখতে চাইছি, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ? আসলে, তুমি যে সত্যি ডিউক, এখনও সেটা আমাদের কাছে ক্লিয়ার নয়। তোমার সম্পর্কে তথ্য আমরা কম যোগাড় করিনি, কিন্তু আমাদের রেকর্ডে তোমার কোন ফটোগ্রাফ নেই। ডিউকের বুক আর পিঠে দাগ আছে বলে শুনেছি, সেটা না দেখা পর্যন্ত তুমি ডিউক কিনা সে-ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত হতে পারছি না।'

পায়ের ওপর পা থেকে নামিয়ে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল রানা। রেগে গেছে ও। লাই দিয়ে মাথায় চড়ানো হয়ে গেছে ওদেরকে, আর নয়। চেহারাটা কঠিন হয়ে উঠল।

'উঠো না!' গম গম করে উঠল আকরামের গলা। পিস্তলের ট্রিগারে চেপে বসল তার আঙুল। 'নড়লে, আর কোন ছুতো লাগবে না আমার, তোমার একটা আঙুল উড়িয়ে দেব। বিশ্বাস করো।'

শরীর ঢিল করে দিয়ে চেয়ারে হেলান দিল রানা। 'জাহান্নামে যাও—তিনজনই!' ইচ্ছে হলো, ডাইভ দিয়ে পড়ে আকরামের ওপর। দুই হাত দিয়ে চেপে ধরে ওর টুঁটি। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রাখল ও।

কেউ কোন কথা বলল না। অস্বস্তিকর একটা নীরবতা পরিবেশটাকে গুমোট করে তুলল। তারপর এক পা সামনে বাড়ল আকরাম। কাঁধ দুটো সামনের দিকে ঝুঁকে আছে। বোঝা গেল, রানাকে ব্যক্তিগত শত্রু বলে ভাবছে সে। যে-কোন মুহূর্তে অঘটন ঘটিয়ে বসবে। রানা যদি তার একটা কথা অমান্য করে, অঘটনটা ঘটতে এক সেকেন্ডও লাগবে না। কিন্তু তার কব্জির ওপর চেপে বসল শাহেদের শক্ত মুঠো।

'পাগল হলে নাকি?' অবাক সুরে বলল সে। 'এই রকম মেজাজ দেখিয়ে কোন কাজ হয়? যাও, নঈমের ওপর নজর রাখো। এখানে তোমাকে আমাদের দরকার নেই।'

ঝাপটা দিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিল আকরাম। নেকড়ের মত দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে গর্জে উঠল সে, 'থামো! কি-জন্যে এত সময় নষ্ট করা?' চেয়ারে হেলান দিয়ে মিটিমিটি হাসছে ও, 'আমরা ওকে নরম সুরে জিজ্ঞেস করছি এটা ঠিক কিনা, ওটা ঠিক কিনা—কি জন্যে? এত কাকুতি-মিনতির দরকারটা কি? আমার হাতে ছেড়ে দাও ওকে, দেখো, দু'মিনিটে কেমন হাগিয়ে ছাড়ি!'

'ইডিয়েট!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল কেয়া। এক ঝটকায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। 'তুমি ওকে দিয়ে কথা বলাতে পারবে? তুমি, আকরাম? খান সেনারা ওর ওপর স্টীম রোলার চালিয়েও মুখ খোলাতে পারেনি—মনে নেই? ইডিয়েট!' ঠোঁট দুটো বিতৃষ্ণায় বেঁকে গেল কেয়ার।

ঝট করে কেয়ার দিকে ফিরল আকরাম। বোমার মত ফেটে পড়ল সে, 'ও একটা খুনী, একটা জোচ্চোর...'

চেয়ার থেকে ডাইভ দিল রানা। আলোর একটা ঝলকের মত দেখাল ওকে। চোখের পলকে আকরামের হাত থেকে মাউজার ছিনিয়ে নিল ও, সেই সাথে বাঁ হাতে লোকটার কানের ওপর বসিয়ে দিল একটা ঘুসি। টলে উঠল আকরাম, কিন্তু পড়ল না। দেয়ালে ঠেস দিয়ে হাঁপাতে লাগল সে। এক পা পিছিয়ে এল রানা।

নিথর দাঁড়িয়ে থাকল শাহেদ আর কেয়া। বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মাউজারের দিকে। সেটা ওদের তিনজনের দিকে তাক করে ধরে আছে রানা।

'ভায়া আকরাম ঠিকই বলেছে,' মুচকি হেসে বলল রানা। 'আমি একটা খুনী। এখন যদি তোমাদের সব ক'টাকে শেষ করে দিই, আমার খুনী পরিচয়টা আরও পাকাপোক্ত হবে, কি বলো?' মাউজারটা পকেটে ভরে ঝুঁকে পড়ল রানা, কার্পেট থেকে তুলে নিয়ে ঠোঁটে গুঁজল সিগারেট। 'আমার সম্পর্কে অনেক খবরই যোগাড় করেছ তোমরা, কিন্তু আমার মেজাজ সম্পর্কে কিছুই জানোনি। রেগে গেলে আমার হুঁশ থাকে না। এখন যদি তেড়ে আসত আকরাম, আমার হাতে খুন হয়ে যেত ও।' একটু থেমে আরও শান্ত, নিচু গলায় বলল ও, 'কাজেই আমার কাছ থেকে দূরে সরে থাকবে তোমরা। আমি নির্ঝঞ্ঝাট, একা থাকতে পছন্দ করি। আবার যদি আমাকে বিরক্ত করো, এ রকম ভদ্র ব্যবহার পাবে না।'

'সুন্দর দেখিয়েছ!' শাহেদের চেহারা থেকে প্রশংসা ঝরে পড়ল। আকরামের দিকে ফিরল সে। ঘুসির ধাক্কাটা এখনও সামলে উঠতে পারেনি। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাচ্ছে ধীরে ধীরে। 'যাও, নঈমের ওপর নজর রাখো। তুমি এখানে থাকলে গোটা ব্যাপারটা লেজে-গোবরে করে ছাড়বে।'

কোন কথা না বলে, কারও দিকে না তাকিয়ে পাশের কামরায় ঢুকে পড়ল আকরাম। দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজে কেঁপে উঠল বাড়িটা।

কামরা থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে আরেক দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়াল রানা।

'প্লীজ!' পিছন থেকে অনুরোধ করল শাহেদ। 'শোনো! তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছি আমরা। সেজন্যে সবার তরফ থেকে আমি মাফ চেয়ে নিচ্ছি। এসো না, এটাকে একটা ব্যবসায়িক আলোচনা মনে করে আবার আমরা বসি?'

থামল রানা, ঘাড় ফিরিয়ে প্রথমে শাহেদ, তারপর কেয়ার দিকে তাকাল। 'না।' কেয়ার চেহারায় কোন ভাব নেই লক্ষ করে বিস্মিত হয়েছে ও। শুধু চোখ দুটো ঠাণ্ডা পাথরের মত জ্বলজ্বল করছে।

'না কেন? তোমার রাগ করার কারণ আছে, কিন্তু ভুল তো মানুষের হতেই পারে, তাই না? মাফ চেয়ে নেবার পর তোমার অন্তত আমাদের প্রস্তাবটা শুনতে রাজি হওয়া উচিত।' কথা বলার ভঙ্গির মধ্যে আশ্চর্য একটা মার্জিত ভাব ফুটিয়ে তুলল শাহেদ। 'তোমার সাহায্য আমাদের দরকার। বিনিময়ে তোমাকে আমরা টাকাও দেব। আকরামটা বোকা, মাথা গরম। মনে করে পিস্তল হাতে থাকলে আর কিছু লাগে না। ওর কথা ছেড়ে দাও। বিশ্বাস করো, পিস্তল বের করার ব্যাপারে প্রথম থেকেই আপত্তি করে আসছি আমি।' একটু থেমে, খানিক ইতস্তত করে আবার জিজ্ঞেস করল সে, 'বলো তো, কিভাবে তোমাকে রাজি করানো যায়?

তোমার সাহায্য না পেলে যে চলবে না আমাদের।' অসহায় একটা ভঙ্গি করল সে।

হঠাৎ হেসে ফেলল রানা। 'করিয়ে ফেলেছ রাজি।' ফিরে এসে চেয়ারের হাতলে বসল ও। বেরিয়ে যাবার জন্যে তৈরি, আবার কথা শোনার জন্যেও প্রস্তুত। 'বলো, কাজটা কি?'

'তার আগে ও ডিউক কিনা জানতে হবে,' দ্রুত বলল কেয়া।

'হ্যাঁ,' ক্ষমা-প্রার্থনার ভঙ্গি করে হাসল শাহেদ। 'ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করো, ডিউক। কোথাও যদি ভুল করি, আমাদের জান নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে। বুঝতেই পারছ, একটা ক্রাইম করতে যাচ্ছি আমরা।' হঠাৎ অন্যমনস্ক দেখাল তাকে। মসৃণ কপালে রেখা ফুটল কয়েকটা। 'অন্তত, লোকের চোখে, আইনের চোখে কাজটা ক্রাইম। এরই মধ্যে একটা ভুল করে ফেলেছি আমরা। ওই লোকটা, নঈম, একজন পকেটমার। আমার মানিব্যাগ চুরি করে ও, তাতে পাকিস্তানী আর ভারতীয় টাকা ছিল, কিছু চিঠি-পত্র ছিল—আমাদের সিক্রেসি সব ফাঁস হয়ে যায় ওর কাছে। ওগুলো হারিয়ে পাগল হবার যোগাড় হয়েছিল আমাদের। ভাগ্যিস ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করে ও।'

এরা কি তবে বাংলাদেশী নয়? পাকিস্তান অথবা ভারত থেকে এসেছে?

'ওকে ধরে ওরই ডেরায় চলে এসেছি আমরা,' বলে চলল শাহেদ আলি। 'ও এখন আমাদের হাতে বন্দী। কি করা হবে ওকে নিয়ে তা এখনও ঠিক হয়নি। কাজেই বুঝতে পারছ, আরেকটা ভুল করার উপায় নেই আমাদের। তুমি যদি ডিউক হও, তাহলে তোমার বুকে আর পিঠে কাটা দাগ থাকবে, শুনেছি মুক্তিযুদ্ধের সময় খান-সেনারা বেয়োনেট দিয়ে...'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা, তারপর শার্ট-কাফের বোতাম খুলে আস্তিনটা একটু গুটিয়ে নিল। হাতটা উল্টো করতেই কব্জির ওপর একটা ক্ষতচিহ্ন দাগ দেখা গেল। 'রোজ রাতে হাতকড়া পরানো হত আমাকে। পরাবার সময় ওটাকে গরম করে নিত ওরা। হয়েছে?'

দু'জনেই নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে দেখল ক্ষতটা। কারও চেহারাতেই আতঙ্ক বা সহানুভূতি ফুটল না।

'কিভাবে টরচার করতে হয়, জানত ওরা,' নিজের মুখের লম্বা দাগের ওপর একটা আঙুলের ডগা বুলাল শাহেদ। 'এটা ওরা করেছিল চোখা বেয়োনেট দিয়ে।'

তীক্ষ্ণ হলো রানার দৃষ্টি। 'তুমি তাহলে মুক্তিযুদ্ধে ছিলে?'

'মুক্তিযুদ্ধ...' অপ্রতিভভাবে একটু হাসল শাহেদ। 'হ্যাঁ, তা ছিলাম বৈকি। আমি শুধু একা নই,' ইঙ্গিতে কেয়াকে দেখাল সে। 'ও-ও ছিল।' এগিয়ে এসে রানার কব্জির দাগটা কাছ থেকে দেখল সে। 'ঠিকই আছে,' কেয়ার পাশে ফিরে গিয়ে আবার বলল। 'ও ডিউক। ওর রেকর্ডে কব্জির এই দাগের কথাও আছে।'

'হ্যাঁ,' বলল কেয়া। 'তা আছে। বেশ, বলো তাহলে।'

টেবিল থেকে প্যাকেট তুলে বলল শাহেদ, সিগারেট বের করে ধরাল। শুরু করল রানার দিকে না তাকিয়েই, 'কাজটা একটু উদ্ভট মনে হতে পারে তোমার কাছে।' গভীর মনোযোগের সাথে সিগারেটের লাল আগুনের দিকে তাকিয়ে থাকল

সে। 'এবং বিপজ্জনক তো বটেই। তুমি ছাড়া আর কারও দ্বারা এটা সম্ভব বলে ভাবতে পারি না আমি। আমরা নিজেরা চেষ্টা করে দেখেছি, কিন্তু সুবিধে করতে পারিনি। তোমাকে জানাতে আপত্তি নেই, চেষ্টা করতে গিয়ে সংখ্যায় কমে গেছি আমরা। তুমি যদি না পারো, আমি মনে করি আর কেউ করতে পারবে না। অথচ কাজটা করতেই হবে।'

পা দুটো লম্বা করে দিল রানা। লক্ষ্য করল, কেয়ার সাথে এখন শাহেদও অপলক চোখে দেখছে ওকে। সংখ্যায় কমে গেছি মানে কেউ খুন হয়েছে তা নাও হতে পারে, ভাবল ও, শাহেদ হয়তো বোঝাতে চেয়েছে কেউ তাদের দল থেকে ছুটে গেছে।

'এত কথা না বলে সংক্ষেপে...'

'কাজটা হলো,' বলল শাহেদ, 'একজন লোককে শাস্তি দিতে হবে। সোজা কথায়, তাকে খুন করতে হবে। তোমাকে দিয়েই সেটা করাতে চাই আমরা।'

তিন

কেয়া বলল, 'অর্ধেক টাকা এখন পাবে, বাকি অর্ধেক কাজ শেষ হলে।'

ডিউকের জীবনে এ-ধরনের প্রস্তাব নতুন নয়। ঢাকায় এমন লোকের অভাব নেই যারা মানুষকে ভয় দেখিয়ে, মারধর করে, বা একেবারে খুন করে ফেলে নিজেদের স্বার্থ এবং লোভ চরিতার্থ করতে আগ্রহী। অথচ এসব কাজ করার ঝুঁকি তারা নিজেরা নিতে চায় না। এরাই নগদ টাকার বিনিময়ে ভাড়া করে ডিউককে। যে-কোন প্রস্তাবে রাজি হয় সে, কিন্তু সব সময় একটা শর্ত দেয়—'অর্ধেক টাকা এখুনি দিতে হবে, বাকিটা কাজ শেষ হলে।' প্রায় সময়ই দেখা যায়, অর্ধেক টাকা হাতে নিয়েই কাজটার কথা বেমালুম ভুলে গেছে ডিউক। প্রশ্ন তুললে বা তাগাদা দিলে বলে, 'যাও, কোর্টে গিয়ে আমার নামে কেস করো,' কথাটা বলে তাদের মুখের উপর হাসে সে। কিন্তু কার এমন বুকের পাটা যে ওর নামে কেস করবে? তাছাড়া, কাজগুলো প্রায় প্রত্যেকটাই বেআইনী, থানায় যাবারও উপায় থাকে না।

ভুক্তভোগীরা তাদের ঠকার কাহিনী চেপে যায়, ভয়ে দু'কান হতে দেয় না। কাজেই নিত্য-নতুন প্রস্তাব পায় ডিউক, অর্ধেক টাকা অ্যাডভান্স নেয়, এবং কাজে হাত না দিয়ে সময়টা কাটায় হোটেল-রেস্তোরাঁ আর ক্লাবে। এ-ব্যাপারে নীতির কোন বালাই নেই তার।

অর্ধেক টাকা অ্যাডভান্স নেয় সে, কথাটা তাহলে জানে এরা! টাকা নিয়ে কাজ করে না, তাও জানে! চিন্তায় পড়ে গেল রানা। প্রস্তাবটা গ্রহণ করা উচিত হবে কি? এ-ধরনের প্রস্তাব কালেভদ্রে আসে। এরা অন্য টাইপের লোক, এদের মত কেউ এর আগে ওর কাছে কোন প্রস্তাব নিয়ে আসেনি। মনের ভেতর থেকে কে যেন গেয়ে উঠল, 'বাছা, সাবধান!' কেটে পড়াই উচিত। কাজটা যদি ও করতে না চায়, কারও সাধ্য কি করায়। কিন্তু চেহারায় আগ্রহ আর কৌতূহল ফুটিয়ে রাখল

ও।

'তুমি থাকতে চাইলে থাকো,' কেয়ার দিকে ফিরে বলল শাহেদ, 'কিন্তু আমার মনে হয় ওর সাথে একা কথা বলতে পারলে সুবিধে হত...'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি দিল কেয়া, নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে। যাবার সময় রানার দিকে তাকালও না। কেয়া চলে যেতে কামরাটা কেমন যেন খালি খালি লাগছে অনুভব করে অবাক হলো রানা। কাঠের আলমিরা থেকে জনি ওয়াকারের একটা বোতল আর দুটো গ্লাস বের করল শাহেদ। 'মদ আমরা কেউ খেতাম না,' অপ্রতিভ একটা ভাব দেখা গেল তার হাসির মধ্যে। 'কিন্তু এখন সাংঘাতিক টেনশনে আছি তো, তাই কেয়ার সাজেশন মেনে নিয়ে ধরতে হয়েছে।' রানার দিকে তাকাল সে। 'তোমাকে দেব তো?' দুটো গ্লাসে হুইস্কি ঢালল সে। একটা ধরিয়ে দিল রানার হাতে।

গ্লাসে ছোট্ট একটা চুমুক দিল রানা। অসুবিধেটা কোথায়? জিজ্ঞেস করল নিজেকে। পঞ্চাশ হাজার দিতে চাইছে, দর কষাকষি করে কিছু যদি বাড়ানো যায় ভাল, তা নাহলে পঞ্চাশ হাজারই সই। নিজে থেকে আসছে যখন, নিতে বাধা কোথায়? পকেটে পঞ্চাশ হাজার নিয়ে অনায়াসে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারে ও। এই টাকাতেই হয়তো রুবির ঠোঁটটা জোড়া লাগানো হয়ে যাবে। রুবিকে কথা দিয়েছে, কাজটা করতে রাজি হলে সেটা রাখার একটা ব্যবস্থা হয়ে যায়। রুবির আনন্দ-অবিশ্বাস ভরা চেহারা কল্পনা করতে ভাল লাগল ওর।

'সত্যি বটে, এ-ধরনের ঘটনা নাটক-নভেলে পাওয়া যায়, বাস্তব জীবনে সচরাচর ঘটে না,' বলল শাহেদ। 'কিন্তু আমাদের কাছে এর গুরুত্ব অসীম।'

'কি তোমরা?' হঠাৎ জানতে চাইল রানা। 'গুপ্ত রাজনৈতিক দল বা ওই ধরনের কিছু?'

মৃদু শব্দে হাসল শাহেদ। 'না। তবে আমাদের সেন্টিমেন্ট তুমি বুঝবে। তোমার মত আমরাও মুক্তিযোদ্ধা।

'তবে আমাদের ওয়র-ফিল্ড ছিল হাজার মাইল দূরে। তুমি নিজের দেশে থেকে লড়েছ, আমরা বিদেশী মাটিতে দাঁড়িয়ে লড়েছি। তুমি মুক্তিযোদ্ধা ছিলে বলেই তোমাকে বেছে নিয়েছি আমরা। জানি, কাজটা করতে যদি রাজি না-ও হও, আমাদের কথা তুমি ফাঁস করে দেবে না।'

'কিছু ফাঁস করা আমার স্বভাব নয়,' বলল রানা। 'কিন্তু তার মানে এই নয় যে কাজটা আমি করব। তোমরা কি সিরিয়াস, সত্যি একজন লোককে...?' কথার মাঝখানে থেমে গেল রানা, খুন শব্দটা উচ্চারণ করতে কেমন যেন দ্বিধা বোধ করল। আজ হঠাৎ অতি-নাটকীয় লাগছে ওটা।

'সিরিয়াস নই মানে?' সাপের মত ঠাণ্ডা অথচ শান্ত একটা ভাব দেখা গেল শাহেদের চেহারায়। 'সব কথা...আমি বরং প্রথম থেকে বলি। কতটুকু সিরিয়াস আমরা, বুঝতে পারবে।' কিভাবে শুরু করবে ভেবে ঠিক করবার জন্যে কয়েক সেকেন্ড সময় নিল সে, তারপর শুরু করল, 'মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানে আটকা পড়েছিলাম আমরা। লাহোর টাউন ক্যাম্প থেকে পালিয়ে সীমান্ত এলাকায় একটা স্যাবোটাজ টীম গঠন করে কিছু বাঙালী, সেই দলে ছিলাম আমরা তিনজন। দলে

আমরা মোট ছিলাম নয়জন। দু'জন বরিশালের, ফিরোজ চৌধুরী আর রেন্টু, মেয়ে ছিল দু'জন, দু'জনই ঢাকার—কেয়া আর সাজিয়া; দু'জন রাজশাহীর, জাফর আর আকরাম, আমি দিনাজপুরের, বাকি দু'জন মনসুর আর আবিদুর রহমান—এরা ঢাকার ছেলে।'

মুক্তিযুদ্ধের সময় এ-ধরনের টীমের কথা অনেকের মুখে শুনেছে রানা। বাঙালী যারা, পাকিস্তানে আটকা পড়েছিল তাদের মধ্যে অনেকেই খান সেনাদের নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদ জানাতে ভয় পায়নি। এদের কেউ কেউ স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদের প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিতেও দ্বিধা করেনি। পাকিস্তানী জাহাজে লিমপেট মাইন ফিট করা থেকে শুরু করে প্লেন হ্যাইজাক পর্যন্ত, চেষ্টার তালিকা থেকে বাদ দেয়নি কিছু।

'পাহাড়ী এলাকায়, সীমান্তের কাছে আমাদের গোপন আস্তানা ছিল,' বলে চলল শাহেদ। 'দলে আমরা সবাই বাঙালী হলেও, স্থানীয় কিছু বন্ধু-বান্ধব ছিল আমাদের, নীতির খাতিরে আমাদেরকেই সমর্থন করত তারা, তাদের কাছ থেকে কিছু কিছু সহযোগিতাও পেতাম। আমাদের অনেক কাজের মধ্যে একটা ছিল লাইন থেকে ট্রেন ফেলে দেয়া। দিনের বেলা আস্তানায় গা ঢাকা দিয়ে থাকতাম, রাতের বেলা বেরুতাম অপারেশনে। মোটামুটি ভালই করছিলাম, ক্ষতির পরিমাণ দেখে ইয়াহিয়া সরকার খেপে আগুন হয়ে উঠেছিল।' চোখ দুটো আধবোজা হয়ে এল শাহেদের, বুঝতে অসুবিধে হয় না অতীতে ফিরে গেছে সে। ধীরে ধীরে শুরু করল আবার, 'আমাদের লীডার ছিল ফিরোজ চৌধুরী—ফিরোজ ভাই বলতে অজ্ঞান ছিলাম আমরা। ধৈর্য, বিচক্ষণতা, অসমসাহস আর চারিত্রিক দৃঢ়তা আর সততার অপূর্ব এক দৃষ্টান্ত ছিল ফিরোজ ভাই। তার গুণের বর্ণনা দেব, সে যোগ্যতা আমি রাখি না। ফিরোজ ভাই একজন ভাল মানুষ ছিল, প্রথম পরিচয়েই মানুষকে আপন করে নিতে পারত। আমরা তাকে ভালবাসতাম···তার কথায় মরতাম, তার কথায় বাঁচতাম। আমাদের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে সবচেয়ে ভালটা আদায় করে নিতে পারত সে। তাকে দেখে বিশ্বস্ত হবার প্রেরণা অনুভব করতাম আমরা।'

চোখে শূন্য দৃষ্টি নিয়ে ধীরে হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিল রানা। শাহেদ কি বলতে চাইছে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না ওর। ফিরোজ চৌধুরীর মত মানুষ যে সত্যি দুনিয়ার বুকে আছে, তার প্রমাণ অনেক বার পেয়েছে ও। যদিও, একজন মানুষ কোন্ পরিস্থিতি বা পরিবেশে যে স্বার্থবোধহীন হয় সেটা একটা অন্ধকার রহস্য ওর কাছে। এই সব লোকের হৃদয়-মন এত সাদা হবার পিছনে নিশ্চয়ই বড় কোন কারণ আছে, কিন্তু সেই কারণটা আজও আবিষ্কার করতে পারেনি ও।

'ফিরোজ ভাই আর কেয়া হোস্টেলে থেকে লাহোর ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করত,' মৃদু সুরে বলে চলল শাহেদ। 'পরস্পরকে ভালবাসত ওরা। নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ, আমাদের মধ্যে কেয়া একটু···মানে, ঠিক স্বাভাবিক নয় ও?'

'হ্যাঁ। কিন্তু বাকি দু'জনকেও আমার স্বাভাবিক বলে মনে হয়নি।'

'আমি চাই কেয়ার ব্যাপারটা তুমি ভাল করে বোঝো,' রানার কথায় কান না দিয়ে আবার শুরু করল শাহেদ। 'ফিরোজ ভাই আর কেয়া, এদের আলাদা কোন অস্তিত্ব ছিল না। একজন আরেকজনকে এত ভালবাসত, তার বুঝি তুলনা হয় না।

কিন্তু ওদের ভালবাসা আর দশটা প্রেমের মত ছিল না। ওদের শরীর, মন, মানসিকতা, স্বভাব, চরিত্র সব এক হয়ে গিয়েছিল। ওদের সম্পর্কটার ওপর এত জোর দিচ্ছি, কারণ, এখন যা ঘটতে যাচ্ছে তার ভিত্তিই হলো ওটা। ওরা পরস্পরের জন্যে বেঁচে ছিল।' ইতস্তত করতে দেখা গেল শাহেদকে। চেহারাটা ম্লান হয়ে গেল। 'আমি ভাল বলিয়ে নই। কোন জিনিসের বর্ণনা দিতে পারি না। ঠিক যা বলতে চাইছি, আসলে তা বোঝাতে পারছি না। ওরা পরস্পরের জন্যে প্রাণ দিতে পারত।' ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গি করে হাসল সে। 'এরচেয়ে ভাল করে বোঝানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'ওতেই চলবে,' রানার সুরে একটা অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পেল। 'তারপর কি হলো? তোমাদের মধ্যে কেউ একজন তার সাথে বেঈমানী করল, এই তো?'

স্থির, পাথুরে দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল শাহেদ আলি। অনেকক্ষণ কেটে যাবার পর বলল সে, 'তোমার কাছে ব্যাপারটার কোন গুরুত্ব নেই। ফিরোজ ভাইকে তুমি জানতে না। তাকে তুমি বুঝবে না। হ্যাঁ, ধরেছ ঠিকই। তার সাথে আমরা একজন বেঈমানী করি।'

হুইস্কিটা শেষ করল রানা। গোটা ব্যাপারটা কি নিয়ে, এখন তা পরিষ্কার হয়ে গেছে ওর কাছে। গেরিলা-যুদ্ধে, অপেশাদার গেরিলা যুদ্ধে এ-ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে। 'কিন্তু এটা তোমাদের মাথাব্যথা, তাই না? এর মধ্যে আমাকে টেনে আনা কেন?'

'সে প্রসঙ্গে আসছি,' বলল শাহেদ। 'যতটা পারি সংক্ষেপে বলব। কেয়া, আবিদ আর আমি ধরা পড়ে যাই। তিনজন একটা অপারেশনে বেরিয়েছিলাম, ফেরার পথে পাঞ্জাবী কমান্ডো গ্রুপের অ্যামবুশের মধ্যে পড়ে গেলাম। ধরা পড়ার সময় কেউ তেমন জখম হয়নি। আমাদেরকে লাহোর ক্যান্টনমেন্টে চালান দেয়া হয়। আমরা ফিরোজ ভাইয়ের দলে আছি, ওরা তা জানত। জেরা করা হলো আমাদের। আমরা কিছু না, ফিরোজ ভাইকে চায় ওরা। জানত, এ-সবের পিছনে সে-ই আছে, সে যতদিন নাগালের বাইরে থাকবে একের পর এক স্যাবোটাজ চলতেই থাকবে: ডিরেইল্ড হবে ট্রেন, টেলিফোন লাইন কাত হবে, পাওয়ার হাউসে আগুন ধরবে। প্রথমে আমার ওপর টরচার চালাল ওরা, আবিদ আর কেয়ার সামনে।' হাতটা নিজের অজান্তেই গালের লম্বা দাগের ওপর উঠে গেল। 'ওদের টরচার কি রকম, সে তো তুমি জানোই। লোকটা আসলে আমি তেমন সাহসী নই, তবু, মাত্র দুই কি তিনবার চিৎকার করাতে পেরেছিল আমাকে দিয়ে।'

সিগারেট ধরাল রানা।

'ওরা শুধু একটা কথাই জানতে চাইল, ফিরোজ কোথায়? কিভাবে যে মুখ বুজে ছিলাম, আজ আর তা মনে নেই। ঘণ্টা কয়েক পর ক্লান্ত হয়ে পড়ল ওরা। আরও টরচার চালাবে, সে অবস্থা আমার ছিল না। প্রায় লাশ হয়ে গিয়েছিলাম। এরপর কেয়াকে ধরল। জানতাম, ওর কাছ থেকে কিছুই আদায় করতে পারবে না। তবে, চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখল না। আশ্চর্যই বলতে হবে, কেয়ার মুখ থেকে একটা চিৎকার পর্যন্ত বের করতে পারেনি। ঘণ্টাখানেক পর হার মানল ওরা, তারপর আবার আমাকে নিয়ে পড়ল। প্রথমেই ভেঙে ফেলল আমার হাতটা।

এরপর আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। পরে যা ঘটেছে, কেয়ার মুখ থেকে শোনা।'

হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল শাহেদ, অস্থির ভাবে পায়চারি শুরু করল কার্পেটের ওপর। 'এই ব্যাপারটা আজও আমি ঠিক বুঝতে পারি না। কেন করল, আজও একটা বিস্ময় হয়ে রয়েছে সেটা আমার কাছে। ঠিক বুঝতে পারি না···আমি জ্ঞান হারাবার পর মুখ খোলে আবিদ। পাক সামরিক ইন্টেলিজেন্স অফিসাররা তাকে ছোঁয়নি পর্যন্ত, তার আগেই সব কথা ফাঁস করে দেয় সে।'

অবিশ্বাস্য ঘটনার স্মৃতি অস্থির করে তুলল শাহেদকে, দু'এক মুহূর্তের জন্যে তাকে উদভ্রান্ত, বিহ্বল দেখল রানা। চেহারা দেখে মনে হলো, অসুস্থ বোধ করছে। 'আমার গালের ক্ষতের ওপর লবণ ছিটিয়ে দিয়েছিল ওরা,' বোধ হয় সেই যন্ত্রণার কথা মনে পড়ে যাওয়াতেই চোখের কোণে টলমল করে উঠল পানি। 'রাইফেলের কুঁদো দিয়ে ভাঙা হাড়ের ওপর দমাদম মেরেছিল, হাতটা যাতে আপনা আপনি বগলের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যায়। আর কেয়াকে···ওর কথা আর কি বলব, বুঝতেই তো পারো কি করা হয় ওদের নিয়ে। কাজেই এরপর যখন জানলাম আবিদ সব ফাঁস করে দিয়েছে, দু'জনই উপলব্ধি করলাম, এত কষ্ট স্বীকার সব পানিতে গেল।'

জানালার সামনে থামল সে, নিচের রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকল। 'এরপর আমাদের তিনজনকে একই সেলে তালা দিয়ে রাখা হয়। ব্যথায় আধ-পাগলা হয়েছিলাম আমি, কেয়ারও রক্ত বন্ধ হয়নি। আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকল আবিদ। সম্পূর্ণ অক্ষত পাঞ্জাবী অফিসাররা তাকে ছোঁয়ওনি। রক্তে ভেসে যাচ্ছে সেলের মেঝে, কেয়ার নিজেরই রক্ত, সেই রক্তের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে কেয়া এগোতে চেষ্টা করল আবিদের দিকে।' ঘুরে দাঁড়িয়ে রানার চোখে তাকাল শাহেদ। 'সে-দৃশ্য জীবনে কখনও ভুলব না আমি। ফুঁপিয়ে কাঁদছিল কেয়া, রাগে দাঁত ঘষছিল,অভিশাপ দিচ্ছিল আবিদকে। কিন্তু এত দুর্বল, আবিদের কাছে পৌঁছুতে পারল না। আমার জীবনের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর রাত ছিল সেটা সারা রাত চেষ্টা করল কেয়া, ভোরের দিকে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল যেখানে বসেছিল আবিদ, সেখানেই বসে থাকল। আমরা কেউ তাকে ছুঁতে পারলাম না। মাঝরাতের দিকে একবার শুধু মুখ খুলেছিল সে। বলল, 'এছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। দিনের পর দিন অত্যাচার করত ওরা, কতক্ষণ সহ্য করতে? এক সময় না এক সময় মুখ খুলতেই হত। ফিরোজ ভাই বুঝবে।'

সবটা মন দিয়ে শুনল না রানা। মাথার এঞ্জিন অন্য কাজে ব্যস্ত। পঞ্চাশ হাজার টাকা! ইচ্ছে করলে আরও বেশি আদায় করতে পারে। হ্যাঁ, আরও কিছু বেশি আদায় করতে হবে। গভীর দৃষ্টিতে শাহেদের দিকে তাকাল ও। শুধু যদি এর সাথে কথা বলতে হয়, টাকাটা আদায় করা কঠিন হবে না।

'আবিদ। আবিদুর রহমান। এর সম্পর্কে সব কথা জানা দরকার তোমার।' টেবিলের কাছে ফিরে এসে গ্লাস দুটোয় আবার একটু একটু করে হুইস্কি ঢালল সে। হাত দুটো স্থির নয়, লক্ষ্য করল রানা। 'আমরা আটজন ছাত্র ছিলাম, কিন্তু আবিদ ছিল পাকিস্তান এয়ারফোর্সের পাইলট। পঁচিশে মার্চের পর আর সব বাঙালী

পাইলটের সাথে তাকেও গ্রেফতার করা হয়। জুলাই মাসে লাহোর জেল থেকে পালিয়ে সীমান্ত টপকে ইন্ডিয়ায় যাবার সময় আমাদের সাথে পরিচয়। আমাদের সংগঠন, আস্তানা ইত্যাদি দেখে বুঝতে পারে, সত্যি কিছু কাজের কাজ করছি আমরা। ইন্ডিয়ায় না গিয়ে থেকে যায় আমাদের সাথে। নভেম্বর মাস পর্যন্ত এক সাথে কাজ করি আমরা। একজন লোককে চেনার জন্যে সাড়ে চার মাস যথেষ্ট সময়, তাই না?'

'হুঁ,' বলল রানা।

'দলে যোগ দিয়েই আমাদের সবার প্রিয় হয়ে ওঠে আবিদ। তার চরিত্রে কোন রকম দুর্বলতা বা জটিলতা দেখিনি আমি। সুপুরুষ, সুদর্শন, বুদ্ধিমান—আদর্শ মানুষ বলতে যা বোঝায় আবিদ ছিল তাই। বয়স ছিল বাইশ থেকে চব্বিশ। ওর কথা শুনে মনে হত, ধনী পরিবারের ছেলে। ওর ওপর বিশ্বাস রাখতে আমরা কেউ কখনও দ্বিধা বোধ করতাম না। লাহোর এয়ারবেস থেকে যেভাবে পালিয়ে এসেছিল তা থেকে বোঝা যায়, সাহসের কোন অভাব ছিল না তার। পাঁচজন গার্ডকে খুন করে বারো ঘন্টা লুকিয়ে ছিল বেসের ভেতরই। সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের একটা ট্রাক নিয়ে বেরিয়ে আসে বাইরে। কয়েক ঘন্টা পর ট্রাক ড্রাইভারের লাশ পায় ওরা, বুঝতে পারে আবিদ বেরিয়ে গেছে বেস থেকে। গোটা লাহোর ঘেরাও দিয়ে তল্লাশী চালানো হয়েছিল। কিন্তু কর্ডন ভেদ করে সীমান্তে চলে আসতে কোন অসুবিধা হয়নি তার।'

ধীর পায়ে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল শাহেদ। আগের চেয়ে নিচু গলায় বলল, 'ফিরোজ ভাই বলত, আবিদ একটা রত্ন। না বুঝে কোন মন্তব্য করার মানুষ ছিল না ফিরোজ ভাই। উদ্যোগী হয়ে কাজ করার, বিপজ্জনক ঝুঁকি নেবার আশ্চর্য একটা ঝোঁক ছিল আবিদের। সবচেয়ে বিপজ্জনক কাজগুলোয় যেচে পড়ে যেতে চাইত সে, গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোয় ফিরোজ ভাইও তাকেই পাঠাত।'

'হ্যাঁ,' বলল রানা, 'এ ধরনের লোক সম্পর্কে জানা আছে আমার। কোণঠাসা না হওয়া পর্যন্ত ওদেরকে দুঃসাহসী, ভাঙবে তবু মচকাবে না, লোহার মত শক্ত ইত্যাদি অনেক কিছুই মনে হয়, কিন্তু একবার যদি কোণঠাসা হয়ে পড়ে, নেংটি ইঁদুরের মত আতঙ্ক...'

ঝট করে রানার দিকে ফিরল শাহেদ। কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলল, 'আবিদ সম্পর্কে কথাটা কিন্তু ঠিক খাটে না কম করেও দশ-বারো বার কোণঠাসা অবস্থায় পড়তে হয়েছিল তাকে, প্রতিবারই ফাইট করে বেরিয়ে এসেছিল সে,—ভয় তো দূরের কথা, চোখের পাপড়ি পর্যন্ত কাঁপেনি।' হঠাৎ কেমন যেন ক্লান্ত দেখাল শাহেদকে। মাথা নিচু করে খানিক চিন্তা করল সে, তারপর আবার বলল, 'ভয় পাবার ছেলে সে ছিল না। কিন্তু আল্লাই জানে সে রাতে কি ভর করেছিল ওর ঘাড়ে। ব্যাপারটা আজও আমি ঠিক বুঝতে পারি না। সেলে বসে সব কথা বলে দিল সে পাঞ্জাবীদের। ফিরোজ ভাই কোথায় আছে, তার সাথে কাকে কাকে পাওয়া যাবে, সব।'

'কে কে ছিল ফিরোজের সাথে?'

'সাজিয়া আর রেন্টু। জাফর, আকরাম আর মনসুর একটা কাজে বাইরে

ছিল। কিন্তু ওদের চেহারার বিশদ বর্ণনা দেয় আবিদ। এক কথায় গোটা দলটাকে ডুবিয়ে দেয় সে।'

'ওসব ঘটার পর দশ-এগারো বছর পেরিয়ে গেছে,' বলল রানা। 'অ্যাদ্দিন তোমরা কোথায় ছিলে?'

টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল শাহেদ। আরেকটু হুইস্কি নিল নিজের গ্লাসে। এক চুমুকে সেটুকু শেষ করে সরাসরি রানার চোখে তাকাল। 'সে-কথায় পরে আসছি।'

'তোমাদের ফিরোজ ভাই কি ধরা পড়েছিল?'

'হ্যাঁ। ফিরোজ ভাইকে বাঁচাতে গিয়ে মারা গেল রেন্টু আর সাজিয়া। কিন্তু ফিরোজ ভাইকে ওরা জ্যান্ত ধরল। খুন করার আগে তাকে ওরা দুই হপ্তা রেখেছিল নিজেদের হাতে।'

'তোমাদের কি হলো?'

রানার চোখে তাকিয়ে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল শাহেদ। 'জানতে চাইছিলে, অ্যাদ্দিন আমরা কোথায় ছিলাম, তাই না?' হাতের গ্লাসটা ঠক করে টেবিলে নামিয়ে রাখল সে। 'সেই থেকে ওদের হাতে বন্দী ছিলাম আমরা। আমরা মানে জাফর, আকরাম এবং মনসুরও। পাঞ্জাবীরা চেহারার বর্ণনা পাবার পর তিন দিনের মধ্যে ক্যান্টনমেন্টে ধরে আনে ওদেরকে। মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিন পর্যন্ত ক্যান্টনমেন্টে ছিলাম আমরা। তারপর আমাদেরকে লাহোর সেন্ট্রাল জেলে চালান দেয়া হয়। সেই থেকে ওখানেই ছিলাম, কোন বিচার-আচার ছাড়াই। হপ্তা কয়েক আগে জেল ভেঙে পালিয়ে আসি আমরা। বর্ডার টপকে ইন্ডিয়ায়, সেখান থেকে এসেছি বাংলাদেশে।'

'আবিদ?'

'আমরা লাহোর ক্যান্টনমেন্টে থাকতেই পালিয়ে যায় সে। কেয়ার ধারণা, এবং আমরাও ধারণাটাকে সমর্থন করি, আসলে পাঞ্জাবী সেনারা তাকে পালাবার সুযোগ করে দেয়।

'এখন তাহলে ওকে তোমরা খুন করতে চাও?'

'হ্যাঁ।'

'জেল ভেঙে আরও আগে কেন পালাওনি?' জানতে চাইল রানা। 'এতদিন অপেক্ষা করলে কেন?'

'কেয়ার জন্যে। টরচারের পর থেকে ওর শরীরটা এক দিনের জন্যেও সুস্থ যায়নি। ব্রেন ফিভার হয়েছিল। সে যে কি ভয়ঙ্কর অবস্থা, তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। এক রকম পাগল হয়ে গিয়েছিল ও। বেঁচে আছে শুধু একটা মাত্র আশা বুকে নিয়ে, একদিন না একদিন আবিদের সাথে দেখা হবে। জেলে বসে আমরা সবাই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আবিদকে ক্ষমা করব না।'

'জেল পলাতক আসামী তোমরা, এত টাকা পেলে কোথায়?'

গম্ভীর হয়ে গেল শাহেদের চেহারা। বলল, 'দেখো, ডিউক, তোমাকে সব কথা বলার দরকার নেই, উচিতও নয়, তবু বলছি এই জন্যে যে আমি জানি তুমি আমাদের সাথে বেঈমানী করবে না।' খানিক ইতস্তত করে জানতে চাইল সে,

'তোমার ওপর বিশ্বাস রেখে আমি ভুল করছি না তো?'

'আমাকে বিশ্বাস না করে তোমাদের উপায় নেই,' বলল রানা। 'যদি বুঝতে পারি সব কথা আমাকে বলছ না তা হলে তোমাদের কাজ ছোঁবই না আমি।'

'জেল থেকে বেরিয়ে পথ-খরচার জন্যে সীমান্ত এলাকার কয়েকটা দোকান থেকে কিছু টাকা ছিনিয়ে নিই আমরা,' বলল শাহেদ। 'তারপর ইন্ডিয়ায় এসে একটা ব্যাংক লুঠ করি। রিভলভার যোগাড় করেছিলাম পাকিস্তান বর্ডার এলাকা থেকেই।'

'কিন্তু এসবের মধ্যে আমাকে টেনে আনা কেন?' জানতে চাইল রানা। শরীরটায় ঢিল দিয়ে পা দুটো লম্বা করে দিল ও।

'ধারণাটা আসলে আমার। কেয়া আর আকরাম রাজি হয়নি। তার কারণও আছে। আকরামের ওয়াইফ ছিল সাজিয়া, আবিদকে তাই সে নিজের হাতে খুন করতে চায়। আর ফিরোজ ভাইকে ভালবাসত কেয়া, সে-ও তাই আবিদের সাথে বোঝাপড়াটা ব্যক্তিগত পর্যায়ে সারতে চায়। আমার ওসব কোন ব্যাপার নেই, তবে ওদের সাথে আমিও প্রতিজ্ঞা করেছি।'

'বাকি দু'জন?' জানতে চাইল রানা। 'জাফর আর মনসুর? তারা কোথায়?'

'মারা গেছে।' শান্ত দেখাল শাহেদকে। 'গত হপ্তায় ওদেরকে খুন করেছে আবিদ।'

ক্ষীণ একটু কৌতূহল দেখা গেল রানার চোখে। এ-ধরনের কিছু আশা করেনি ও। 'গত হপ্তায়? তার মানে, তুমি বলতে চাইছ, এখানে···এই ঢাকায়?'

'হ্যাঁ।' আবার কার্পেটের ওপর পায়চারি শুরু করল শাহেদ। 'আবিদকে আমরা ছোট করে দেখেছি। শক্ত জানতাম, জানতাম তার লক্ষ্য কখনও ব্যর্থ হয় না, গায়ে অসুরের জোর আছে, বাঘের মত ক্ষিপ্র, মাথাটা যেমন পরিষ্কার মনটা তেমনি নিষ্ঠুর। মানুষ শিকার করতে ওস্তাদ, তাও অজানা ছিল না। কিন্তু যত কিছুই হোক না কেন, গুণতিতে ওর চেয়ে চারজন বেশি আমরা, ভেবেছিলাম ওকে কাবু করা মোটেও কঠিন হবে না। কিন্তু কাজে নেমে দেখা গেল, সে একাই একশো।'

নতুন আরেকটা সিগারেট ধরাল রানা।

'এখন আমরা চিন্তায় পড়ে গেছি। সংখ্যায় এখন মাত্র তিনজন আমরা। মুশকিল হলো, তার খোঁজ বা ঠিকানা কিছুই জানি না। মনসুরের কাছে একটা ক্লু ছিল, সেটা ধরে ইনভেস্টিগেট করতে গেল সে। আর ফিরে আসেনি। রামপুরার কাছে একটা পুকুরে তার লাশ পাওয়া গেছে। পুলিসের উদ্ধৃতি দিয়ে খবরের কাগজগুলো লিখল, অজ্ঞাত পরিচয় যুবকের আত্মহত্যা। কিন্তু যে যাই বলুক, আমরা জানি এর পেছনে আবিদ আছে।'

'জাফর মারা গেল কিভাবে?'

'জাফরের হাতেও ক্লু ছিল। রেললাইনের ওপর পাওয়া গেল তাকে, ট্রেনের নিচে কাটা পড়েছে। নেহাতই একটা দুর্ঘটনা বলে চালিয়ে দিল পুলিস। জাফর খুন হবার পর কেয়াকে আমি বোঝাবার চেষ্টা করলাম। বাইরের সাহায্য ছাড়া কাজটা হবে না। আবিদ আমাদের চেনে। জানে, আমরা তার পেছনে লেগেছি। তাই পাল্টা আঘাত করছে সে। কাজেই এমন একজনকে তার পেছনে লাগাতে হবে

যাকে সে চেনে না। তোমার কথা লোক-মুখে শুনি আমরা। সত্যি-মিথ্যে জানার জন্যে কিছু সময় ব্যয় করি। বুঝতে পারি, কেউ যদি পারে, সে তুমি। ওকে খুঁজে বের করে আমাদেরকে খবর দেবার মত সময় যদি পাও, বাকি কাজটা আমরাই সারব। কিন্তু আমরা আবিদকে চিনি, তাই বলছি, তাকে খুঁজে পাবার পর তোমার দেরি করা উচিত হবে না। ওকে খুঁজে পেলে, আমাদেরকে খবর দিয়ে সেখানে নিয়ে যাওয়ার সময় দেবে না সে। তোমাকে যদি দেখে ফেলে, বা যদি জানতে পারে তুমি তাকে দেখে ফেলেছ, তাহলে আমাদেরকে আর খবর দেবার সুযোগ পাবে না তুমি—ওর হাতে খুন হয়ে যাবে। তাই, কাজটা তোমাকেই সেরে ফেলতে হবে। সেজন্যেই তোমাকে আমরা এক লাখ টাকা দিচ্ছি।'

'কিন্তু এটা একটা খুনের প্রস্তাব,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা। যদিও চেহারায় আগ্রহের ছাপ যথেষ্টই লক্ষ্য করা গেল। 'কথাটা ভেবে দেখেছ?'

'মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালদের বুকে গুলি করেছ তুমি, সেগুলো কি খুন ছিল?' শান্তভাবে জানতে চাইল শাহেদ।

'অবশ্যই ছিল,' বলল রানা। 'তবে পার্থক্য এইটুকু যে সেগুলো লিগালাইজ মার্ডার ছিল, এটা তা নয়। দালাল বা বিশ্বাসঘাতকদের ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে, জানো না? সেই সময়টা নেই এখন। এখন যদি কাউকে খুন করি আমি, আমাকে গ্রেপ্তার করা হবে, বিচার হবে, এবং সম্ভবত ফাঁসিও হয়ে যাবে।'

'তারমানে ব্যাপারটাকে আত্মহত্যা বা দুর্ঘটনা বলে দেখাতে হবে,' বলল শাহেদ। 'সেভাবেই আমাদের দু'জন সঙ্গীকে খুন করেছে সে।'

গ্লাসে একটু হুইস্কি ঢেলে ধীরে ধীরে দুটো চুমুক দিল রানা। দেখে মনে হলো, কি যেন গভীরভাবে চিন্তা করছে। আসলে তা নয়। চিন্তা করার আর কিছু নেই, কি করবে মনে মনে ঠিক করে ফেলেছে। 'ঝুঁকি আছে,' বলল ও। 'ব্যাপারটাকে আমার দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখতে হবে। বেলটা তোমাদের, আগুন থেকে বের করে আনতে বলছ আমাকে। এই লোকের সাথে আমার কোন শত্রুতা বা বিরোধ নেই। ওর মত বিশ্বাসঘাতক এ শহরে আরও অনেক আছে। যুদ্ধের সময় বা তার পরপরই একজন লোককে খুন করা এক কথা, আর এখন কাউকে খুন করা সম্পূর্ণ ভিন্ন আরেক কথা।'

টেবিল থেকে রানার প্যাকেট তুলে নিয়ে একটা সিগারেট ধরাল শাহেদ। কপালের ওপর চিন্তার রেখা ফুটল। 'প্যাঁচ কষে লাভ নেই,' শান্ত সুরে বলল সে। 'হয় তুমি কাজটা করবে, নয় করবে না। ইয়েস অর নো?'

'এক লাখ টাকায় করব না।'

তীক্ষ্ণ হলো শাহেদের দৃষ্টি। 'তার মানে কি…?'

'অবশ্যই,' দ্রুত বলল রানা। 'টাকার পরিমাণ আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারলে যে-কোন কাজে হাত দিতে পারি আমি। এক লাখ যথেষ্ট নয়। এটা একটা ব্যবসায়িক প্রস্তাব। তোমরা আমাকে নিজের প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিতে বলছ। লোকটা হয়তো আমার চেয়েও চালু, হয়তো কাছেই ঘেঁষতে পারব না। বাকি দু'জনের মত আমিও তার হাতে খুন হয়ে যেতে পারি। যদি সফলও হই, কোথাও হয়তো এমন একটা ভুল করে রাখব যার ফলে পুলিস ধরে ফাঁসিতে লটকে দেবে।

প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিচ্ছি, সেটার দাম এক লাখ টাকার বেশি বলে মনে করি আমি।'

'হ্যাঁ,' বলল শাহেদ। 'মানি।' চিন্তিত দেখাল তাকে। 'কিন্তু মুশকিল হলো, আমাদের হাতে বেশি টাকা নেই। ওদের সাথে কথা বলে দেখতে হবে। কিন্তু খুব বেশি হলে সোয়া লাখ, তার বেশি আশা কোরো না। সোয়া লাখ দিতেও জান বেরিয়ে যাবে আমাদের।'

দৃষ্টি দিয়ে শাহেদের চেহারাটা পরখ করল রানা। সরল, আন্তরিক চোখ। নিঃশ্বাসের পতনও স্বাভাবিক। মনে মনে একটু যেন হতাশই হলো রানা। টাকাই নেই, থাকলে আরও কিছু বাগিয়ে নিতে পারত। শাহেদ লোকটা বড় বেশি সরল। মিথ্যে কথা বলছে না।

খানিক ইতস্তত করে বলল ও, 'ঠিক আছে। দেড় লাখেই করব। ভেবেছিলাম চেষ্টা করলে লাখ দুই আদায় করতে পারব...'

হেসে উঠল শাহেদ। 'তা তুমি পারতে। কিন্তু থাকতে হবে তো। তবে, দেড় লাখ পাচ্ছ, এখুনি সেটা ধরে নিয়ো না। ওরা কি বলে শুনি আগে। হয়তো এত টাকা দিতে চাইবে না। আসলে ওই দেড় লাখের মতই আমাদের মোট সম্বল।'

'যাও, ওদের সাথে কথা বলো,' এই প্রথম একটু কঠিন শোনাল রানার গলা। 'অর্ধেক নগদ, এখুনি—বাকিটা কাজ শেষ হলে। দেখো ওরা কি বলে।'

নঈম ঘরে ঢুকল। একটা ইজি চেয়ারে গা ছেড়ে দিয়ে বসে রয়েছে রানা, ওর দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করতে লাগল সে। দেঁতো হাসি দেখা গেল রানার মুখে। কেয়া আর আকরামের সাথে কথা বলবে শাহেদ, তাই নঈমকে এ-ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছে।

'হাবার মত দাঁড়িয়ে না থেকে ওখানটায় চুপ করে বসে থাকো,' একটা চেয়ার দেখিয়ে বলল রানা। 'ওরা আমাকে তোমার ওপর নজর রাখতে বলেছে।'

'আমাকে নিয়ে কি করবে ওরা?' খুব ভয় পেয়েছে নঈম, বোধ হয় সেটা চাপা দেবার জন্যেই চেহারায় রাগের ভাব ফুটিয়ে জানতে চাইল। কিন্তু ভাবটা বেশিক্ষণ টিকল না। রানা চুপ করে আছে দেখে আরও কয়েক পা সামনে চলে এল সে। গলাটা বাড়িয়ে দিল লম্বা করে। ফিসফিস করে জানতে চাইল, 'ওদের মতলব ভাল নয়! আপনাকে সব বলেছে, তাই না? আপনি ওদের সাথে হাত মিলিয়েছেন!'

সিগারেটে কষে একটা টান দিল রানা। ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে তাকাল নঈমের দিকে। 'হাত মিলিয়েছি কি পা মিলিয়েছি তা জেনে তোমার কোন লাভ নেই,' বলল ও। 'আর তোমাকে নিয়ে কি করবে না করবে তা জেনে আমারও কোন লাভ নেই। ব্ল্যাকমেইলারদের আমি দু'চোখে দেখতে পারি না।'

'হ্যাঁ,' দ্রুত বলল নঈম। 'ওটাই আমার ভুল হয়ে গেছে। ওই মেয়েটা...ওকেই আমার সাংঘাতিক ভয়। সব করতে পারে ও। মাথায় গোলমাল আছে...' শরীরটা শিউরে উঠছিল, সেটাকে দমন করল সে।

'মাথায় গোলমাল আছে? আমি তা মনে করি না। বলতে পারো, ডেঞ্জারাস।'

হাতের মুঠো ঘন ঘন খুলতে আর বন্ধ করতে শুরু করল নঈম। 'চার দিন ধরে এখানে আছে ওরা। যেখানেই যাই আমি, ওদের একজন আমার সাথে থাকে। একটুও বিশ্বাস করে না।' দ্রুত, চাপা স্বরে কথা বলতে গিয়ে একটুতেই হাঁপিয়ে

উঠল সে। 'আমার কোন প্রাইভেসী নেই। ওদের সামনে বসে পায়খানা করতে হয়।' চোখে আতঙ্ক ফুটে উঠল। 'আমাকে যদি মেরে ফেলে ওরা?'

হাসল রানা। 'পকেট মারতে যাবার মজাটা এখন বোঝো!'

চোখ পিট পিট করে তাকিয়ে থাকল নঈম। 'ওই শাহেদ লোকটা বলল বুঝি?'

মুখের সামনে হাত দিয়ে মাছি তাড়াবার একটা ভঙ্গি করল রানা। 'মেলা ফ্যাচফ্যাচ কোরো না তো!'

অজুহাত দেবার সুরে শুরু করল নঈম, 'খোদার কসম বলছি, ডিউক ভাই...' কিন্তু রানার চেহারায় কঠিন একটা ভাব ফুটে উঠতে দেখে থতমত খেয়ে গেল সে, হাত কচলাতে শুরু করে আবার বলল, 'খুব অভাবে পড়ে গিয়েছিলাম, তা না হলে কারও পকেটে হাত ঢোকানো আমার স্বভাব নয়।' রানা ভাবল, লোকটার গাটস্ আছে! চোখে চোখ রেখে কিরে কেটে দিব্যি মিথ্যে কথা বলতে পারে। 'তাছাড়া, ওদের বরং ভাগ্য যে আমার কাছে ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গেছে। কাগজগুলো আর কারও হাতে পড়লে সোজা পুলিসকে জানিয়ে দিত সব। চোদ্দ শিকের ভেতর আটকা পড়ত সবগুলো। কিন্তু আমি তা না করে মাত্র পাঁচশো টাকা চেয়েছিলাম। এখন আপনিই বলুন...'

'ওদেরকে না ঘাঁটালেই ভাল করতে,' বলল রানা। নঈম ওকে বিরক্ত করে তুলছে। 'আমার কাছে কাকুতি-মিনতি করে লাভ নেই কোন। সাহায্য করতে পারব না। তোমাকে মারধর করলে আমার কি?'

করুণ চোখে তাকিয়ে থাকল নঈম। রানা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে দেখে বিড়বিড় করে আপন মনে কি যেন বকল কিছুক্ষণ, তারপর কার্পেটের ওপর পায়চারি শুরু করল। হাত দুটো অস্থির, কখনও চুলে আঙুল চালাচ্ছে, কখনও গাল ঘষছে। ভয়ঙ্কর একটা আশঙ্কা গত দু'দিন থেকে অস্থির করে রেখেছে তাকে। 'আচ্ছা, আপনি কি মনে করেন ওরা আমাকে...?' আশঙ্কাটা ভাষায় প্রকাশ করতে সাহস পেল না সে। অসহায় দৃষ্টিতে বার বার তাকাল রানার দিকে। হঠাৎ পায়চারি থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। 'সহ্যের একটা সীমা আছে!' গলার আওয়াজ শুনে মনে হলো কেঁদে ফেলবে। 'বলেও না আমাকে নিয়ে কি করবে!' আবার পায়চারি শুরু হলো। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল। 'হাজার বার বলেছি, আমি কোন ক্ষতি করব না। কিন্তু আমাকে ওরা বিশ্বাস করতে পারছে না। কোরান শরীফ ছুঁয়ে কসম খেতে চেয়েছি, কান দেয় না!'

'আছে?' জানতে চাইল রানা।

'কিনে নিয়ে আসুক, আমি টাকা দেব,' পায়চারি থামিয়ে বলল নঈম। 'আপনি যদি বলেন ওদেরকে, ওরা হয়তো আপনার কথা শুনবে...'

মুখের সামনে হাত এনে হাই তুলল রানা। 'বকবকানি থামাও দেখি। গ্লাসে একটু হুইস্কি ঢাল আমার জন্যে। তোমার, নাকি ওদের টাকায় কেনা?'

'আমি একটা বানচোত...' মাথার চুল টানতে শুরু করল নঈম। 'ওদের পকেটে হাত গলিয়ে নিজের পায়ে কুড়াল মেরেছি! আড়াল থেকে শুনেছি, ওই লোকটাকে, মানে আবিদকে, ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে চায় ওরা। কি ভয়ঙ্কর! কোন ভয় নেই, ভাবনা নেই, দয়া নেই!' রানার দিকে ফিরে ঢোক গিলল। 'ঠিক

বলেছেন, ডেঞ্জারাস! আমাকে যদি কাঁচা চিবিয়ে খেয়ে ফেলে মেয়েটা, আশ্চর্য হবার কিছু নেই। শুধু তাকিয়ে থাকে আমার দিকে, যেন কতটা মাংস হবে আন্দাজ করতে চায়! এমন শক্ত মেয়েছেলে জীবনে দেখিনি। আর ওই যে আকরামটা··· সে-ও শুধু শুধু আমার দিকে তাকিয়ে থাকে—মনে হয় আমাকে নিয়ে কিছু একটা প্ল্যান আঁটছে। আচ্ছা, আমাকে খুন করতে ওদের বাধাটা কোথায়? আবিদকে যদি করে, আমাকে বাদ দেবে কেন? আমাকে নিয়ে আর কি করার কথা ভাবতে পারে ওরা?' দর দর করে ঘামছে নঈম। 'চার চারটে রাত ঘুমাতে পারিনি! এভাবে চলতে পারে না। খুন যদি করে, দেরি করছে কেন···?'

ইজি চেয়ার থেকে উঠল রানা। দুটো গ্লাসে হুইস্কি ঢালল, একটা নিয়ে ফিরে এল আবার ইজি চেয়ারে। 'জেগে জেগে দুঃস্বপ্ন দেখছ তুমি। দু'ঢোক পেটে পড়লে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

গ্লাসটা ছোঁ দিয়ে তুলে নিয়ে এক ঢোকে এক আউন্স হুইস্কি গলায় ঢালল নঈম। চোখ-মুখ বিকৃত হয়ে উঠল তার। 'সত্যিই কি ওরা আমাকে মেরে ফেলবে?' পকেট থেকে নোংরা একটা রুমাল বের করে হাতের ঘাম মুছল সে। 'আকরামটা···ওকেই আমার সবচেয়ে বেশি ভয়। মেয়েটা হুকুম দেবে, আর ওই লোকটা আমাকে মেরে ফেলবে!'

'এমন বোকা তো দেখিনি!' চটে উঠল রানা। 'চুপ করে বসো। ওসব কিছু ঘটবে না।'

টেবিলের ওপর গ্লাসটা রেখে দিল নঈম। হাতটা কাঁপছে বলে কাঠের সাথে ঠক ঠক আওয়াজ করল কাঁচটা। চোখ বেয়ে পানি গড়াতে শুরু করল। 'আমার ভয় করছে। দশ বছর আগে আমার হাত দেখে একজন বলেছিল, আমি নাকি খুন হতে পারি। ডিউক ভাই, আপনি ইচ্ছে করলে আমাকে বাঁচাতে পারেন···'

কেয়াকে সাথে নিয়ে ঘরে ঢুকল শাহেদ। লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেল নঈম, চিবুকটা ঝুলে পড়ল, দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে হাঁপাতে শুরু করল ঘন ঘন।

'ও-ঘরে গিয়ে আকরামের সাথে বসো,' শান্ত সুরে বলল শাহেদ। 'বারবার দৌড় খাটাচ্ছি, কিন্তু সেজন্যে তুমিই দায়ী, তাই না?'

'না!' আচমকা বুক টান করে দাঁড়াল নঈম। 'যথেষ্ট সহ্য করেছি, আর নয়! তোমরা সবাই বেরিয়ে যাও আমার ফ্ল্যাট থেকে। এক্ষুণি! তা না হলে···'

'তা না হলে?' অতি কোমল সুরে জানতে চাইল কেয়া।

'আমি চিৎকার করব! লোক ডাকব।'

'এসো,' ঘরে ঢুকে আঙুল বাঁকা করে কাছে ডাকল আকরাম নঈমকে। তাকে দেখেই কুঁকড়ে গেল নঈম। কোন দিকে না তাকিয়ে সুড়সুড় করে এগোল সে। দরজা পেরিয়ে চলে গেল পাশের কামরায়। রানার চোখে একবার তাকিয়ে কি যেন দেখল আকরাম, তারপর নিঃশব্দে অনুসরণ করল নঈমকে। ভেতরে ঢুকে বন্ধ করে দিল দরজাটা।

'ওর ধারণা, তোমরা নাকি ওকে মেরে ফেলবে,' হালকা সুরে বলল রানা। 'আজগুবি সব মার্ডার কেস পড়ে মাথাটা পচে গেছে!'

'যা চেয়েছ তাই দেব তোমাকে,' রানার কথার ওপর কোন মন্তব্য না করে বলল কেয়া।

মনে মনে একটু অবাক এবং সেই সাথে নিরাশ হলো রানা। এত সহজে রাজি হয়ে গেল? কথার যুদ্ধ শুরু করার কোন সুযোগই দিল না! 'অর্ধেক এখুনি, বাকিটা কাজ শেষ হলে।'

'হ্যাঁ।'

'অর্ধেক, মানে পঁচাত্তর হাজার টাকা।'

'হ্যাঁ,' বলল কেয়া। 'কিন্তু ইন্ডিয়ান কারেন্সি দেব আমরা—সাড়ে সাঁইত্রিশ হাজার টাকা—না, রূপী। ভাঙিয়ে নিলে ওটাই বাংলাদেশী পঁচাত্তর হাজারে বা কিছু বেশিতে দাঁড়াবে।'

'ইন্ডিয়ান কারেন্সি?' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রানা। 'উঁহু। অত রূপী ভাঙাতে যাওয়া রিস্কি ব্যাপার। সেক্ষেত্রে পুরো চল্লিশ হাজার দিতে হবে।'

শাহেদের দিকে তাকাল কেয়া। ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল শাহেদ। রানার দিকে ফিরে ঠাণ্ডা সুরে বলল কেয়া, 'ঠিক আছে। আমরা জানতাম, চল্লিশই চাইবে তুমি।'

কোথাও নিশ্চয়ই একটা বড় রকমের ঘাপলা আছে। কিন্তু কি বা কোথায়, ধরতে পারল না রানা। হঠাৎ করেই একটা সন্দেহ ঢুকে পড়ল মনে। শাহেদ আন্তরিক বা সরল হতে পারে, কিন্তু বাকি দু'জন সরলও নয় নরমও নয়। গ্লাসে আরও খানিকটা হুইস্কি ঢেলে নিয়ে কাঠের একটা চেয়ারে বসল ও। চেহারায় ক্ষীণ একটু দ্বিধার ভাব ফুটে উঠল।

বুকে হাত বেঁধে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে কেয়া। নির্বিকার চেহারা। জানালার কাছে একা দাঁড়িয়ে আছে শাহেদ, ঠিক এই মুহূর্তে নিঃসঙ্গ, আরেক জগতের মানুষ বলে মনে হলো তাকে। কেয়া আর রানা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে, কিন্তু শাহেদ যেন সে ব্যাপারে সচেতন নয়।

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'কি করতে হবে বলো। আবিদের একটা ফটোগ্রাফ দরকার আমার। কিংবা চেহারায় নিখুঁত বর্ণনা পেলেও চলবে। কোথায় তাকে পাওয়া যেতে পারে সে-সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা?'

'ফটো নেই। চেহারার বর্ণনা লিখে রেখেছি।' জানালার দিকে পিছন ফিরল শাহেদ। 'তাকে খুঁজে বের করা কঠিন হবে। মাত্র দুটো ক্লু ছিল আমাদের হাতে, দুটোই ভাল। ওগুলো ব্যবহার করে জাফর আর মনসুর আবিদের সন্ধান বের করে ফেলেছিল। তা না হলে খুন হত না ওরা। তুমিও ও-দুটো ধরে এগোতে পারো। তবে খুব সাবধান!'

না তাকিয়েও বুঝল রানা, ওর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কেয়া। অস্বস্তিবোধটা বেড়ে গেল আরও। বলল, 'ক্লু দুটো শোনা যাক।'

'দলের ভেতর ছিল বটে, কিন্তু নিজের সম্পর্কে কাউকে বিশেষ কিছু জানতে দেয়নি সে। মাত্র দুটো কথা মনে ছিল আমাদের। তার চাচী আম্মার ঠিকানা বলে রেখেছিল, যুদ্ধে মারা গেলে আমরা যাতে খবরটা পৌঁছে দিতে পারি। আমরা তার এক বান্ধবীর কথাও জানি। চাচীমা থাকে বাসাবোয়। ঠিকানাটা তোমার জন্যে

কাগজে টুকে রেখেছি। তাঁর সাথে দেখা করতে যায় জাফর। পরদিন বাসাবো রেললাইনের ওপর লাশ পাওয়া যায়। হতে পারে, চাচীমার বাড়িতে জাফর যখন পৌঁছায় ওখানে তখন আবিদ ছিল।'

আড়চোখে তাকাতেই দেখল রানা, ওর ওপর থেকে চোখ সরায়নি মেয়েটা। অস্বস্তি দূর করার জন্যে আবার একটা সিগারেট ধরাল ও।

'আবিদের বান্ধবীর নাম শামিমা। একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির শো-রুমে সেলস গার্লের চাকরি করে। শো-রুমের ঠিকানা কাগজে টোকা আছে। তার সাথে দেখা করতে যায় মনসুর। পরদিন রামপুরার একটা পুকুরে ওর লাশ পাওয়া যায়। ঠিক জানি না, শামিমা হয়তো রামপুরার ওদিকেই থাকে। ব্যস, আর কোন ক্লু নেই। এই দুটো ধরেই এগোতে হবে তোমাকে।'

'ঠিক আছে, দু'জায়গাতেই ঢুঁ মারব,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল রানা। 'তোমরা বোধ হয় এখানেই থাকছ আপাতত, তাই না? যোগাযোগ করার দরকার হলে…'

'ঠিক নেই,' বলল শাহেদ। 'এখানে আমরা থাকতেও পারি, নাও পারি। নির্ভর করে…' চট করে কেয়ার দিকে তাকাল একবার। 'কিন্তু তুমি কোথায় থাকো তা আমরা জানি।' মুচকি একটু হাসল সে। 'আমাদেরকে হারিয়ে ফেলবে, সে ভয় নেই তোমার—আমরাই সেটা ঘটতে দেব না।'

হাসির সাথে মিশে হালকা শোনাল ঠিক, তবু হুমকি বটে।

মৃদু শব্দে হেসে উঠল রানা। 'চল্লিশ হাজার রূপী নিয়ে পালিয়ে যাব, তা ভেব না। আমার পুরো আশি হাজারই দরকার।' উঠে দাঁড়াল ও। 'আমি বরং দেরি না করে কাল থেকেই কাজে লেগে পড়ি। মনে তো হচ্ছে বেশ মজা পাব।' উৎসাহ দেখাবার চেষ্টাটা তেমন সফল হলো না, নিজের কানেই কেমন যেন বেসুরো শোনাল গলার আওয়াজ। 'এ-ধরনের কাজে আমি এক্সপার্ট।' পকেটে হাত ভরে মাউজারটা বের করল ও। পিস্তল দেখেই আড়ষ্ট হয়ে গেল কেয়া আর শাহেদ। কিন্তু রানাকে সেটা টেবিলে রেখে দিতে দেখে ঢিল পড়ল তাদের পেশীতে। 'আকরামের লাগবে এটা, তাই না? থাক। আমার কাছেও আছে একটা।' কেয়া বা শাহেদ কেউই কিছু বলল না। 'হ্যাঁ, এবার চেহারার বর্ণনা আর ঠিকানা দুটো দাও।'

পকেট থেকে একটা এনভেলাপ বের করে রানার হাতে ধরিয়ে দিল শাহেদ। 'সব আছে এতে।'

'সব? রূপীও?' আঙুল দিয়ে টিপে এনভেলাপের ভেতরটা অনুভব করার চেষ্টা করল ও। 'কই, না!' মুখ তুলে তাকাল। 'কি কথা হয়েছে মনে নেই? এখুনি অর্ধেক, বাকিটা কাজ…'

টেবিলের নিচ থেকে একটা ব্রীফকেস বের করল কেয়া। 'তুমি একটা আই.ও.ইউ. সই করবে না?'

'কি বললে?' বলল রানা। ভাবল, শুনতে বোধ হয় ভুল হয়েছে।

'আই.ও.ইউ.,' ধীরে ধীরে, স্পষ্ট স্বরে উচ্চারণ করল কেয়া। 'বাংলায় বলে, ঋণপত্র। সই করতে আপত্তি নেই তো?'

'আপত্তি কিসের!' কেয়ার বোকামি টের পেয়ে মনে মনে হাসল রানা। ওরা

বেআইনীভাবে বাংলাদেশে ঢুকেছে, পাসপোর্ট নেই। কোন চুক্তি করেই বা লাভ কি ওদের? আইনের সাহায্য তো চাইতেই পারবে না!

এক টুকরো কাগজ আর কলম দিল শাহেদ রানাকে।

'কিন্তু টাকা···রূপী কোথায়?' গম্ভীর সুরে জানতে চাইল রানা। 'টেবিলে দেখতে পাচ্ছি না কেন? তোমাদেরকে অবিশ্বাস করি, ব্যাপারটা তা নয়। কিন্তু এটা একটা ব্যবসা, তাই না? সব নিয়ম মাফিক হওয়া চাই।'

ব্রীফকেস খুলে ইন্ডিয়ান কারেন্সির তিনটে বান্ডিল টেবিলের ওপর রাখল কেয়া। টেবিলের কিনারা ধরল সে, আঙুলগুলো মাউজারের কাছাকাছি। একটা চেয়ার টেনে বসল রানা। বলল, 'আমার যদি চিট করার ইচ্ছে থাকত, মাউজারটা ফেরত দিতাম না।'

'টাকা গোনো!' এমন তীক্ষ্ণ শোনাল কেয়ার গলা, শাহেদ এবং রানা দু'জনেই প্রায় চমকে উঠে তাকাল তার দিকে।

ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ব্যাপারটা কি? রাগ করবার কি ঘটল?' কেয়ার দু'চোখে ঘৃণার ভাব লক্ষ্য করে মনে মনে অবাক হয়ে গেছে ও। 'আমি করতে চাইনি, তোমরাই আমাকে রাজি করালে। কাজটা করাতে হলে টাকা দিতে হবে না? এখন দিতে খারাপ লাগছে কেন? আমি কি তোমাদের কাছ থেকে জোর করে কিছু আদায় করছি?'

'গোনো,' চাপা গলায় আবার বলল কেয়া। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। কিছু বলল না। দুটো একশো রূপীর বান্ডিল, একটা পাঁচশো রূপীর। গুনতে বেশিক্ষণ লাগল না। 'ঠিকই আছে,' বলল ও। কলমটা তুলে নিয়ে কাগজের ওপর খস খস করে সই করল—ডিউক। কলমটা বন্ধ করে ধরিয়ে দিল শাহেদের হাতে। মুখে হাসি টেনে বলল, 'এবার আমি কাজে হাত দিতে পারি।' রূপীর বান্ডিলগুলো ব্রীফকেসে ভরল, বন্ধ করল সেটা। বগলে আটকে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। 'কাল রাতে হোটেল জনপদে আমাদের দেখা হতে পারে না? কদ্দূর এগোলাম জানতে পারবে।'

'তাই হবে,' বলল শাহেদ। উত্তেজনায় টান টান হয়ে আছে মুখের রেখাগুলো। 'তুমি কিন্তু বেশি সময় নিতে পারবে না। টাকাটা আমাদের কাছে অনেক কিছু। কুইক সার্ভিস চাই আমরা।'

'অদ্ভুত ব্যাপার হলো, টাকাটা আমার কাছেও অনেক কিছু,' মুচকি হাসিটা চাপতে পারল না রানা।

শান্ত কিন্তু হুমকির সুরে মনে করিয়ে দিল শাহেদ, 'আমরা কিন্তু তোমাকে বিশ্বাস করেছি।'

'তা ঠিক,' বলল রানা, তারপর কেয়ার দিকে ফিরে সেই সাথে জুড়ে দিল, 'কিন্তু আমার আই. ও. ইউ. তো তোমাদের কাছে থাকলই!'

একটা কথাও বলল না কেয়া, শুধু তাকিয়ে থাকল রানার দিকে। বড় বড় চোখ দুটো চকচক করছে। শক্ত, কঠিন হয়ে থাকল মুখের চেহারা।

'ঠিক আছে, আসি তাহলে,' বলে দরজার দিকে ফিরল রানা।

দু'জনের কেউই কিছু বলল না। দরজার কাছে পৌঁছে পিছন দিকে তাকাল

রানা। আই.ও.ইউ.-টা শাহেদের হাতে। টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে কেয়া, হাতটা মাউজারের কাছে। ঘরের ভেতর পরিবেশটা উত্তেজনায় টান টান হয়ে আছে। কিন্তু ভয় বা উদ্বেগ, কোনটাই পাত্তা দিল না রানা। টাকা তো এসে গেছে হাতে। গোটা ব্যাপারটা এত সহজে ঘটে গেল, গলা ছেড়ে হেসে উঠতে ইচ্ছে করল ওর। এই রকম বিনা পরিশ্রমে এত টাকা এক সাথে চিট করেনি ডিউক। হ্যাঁ, আকরাম রয়েছে, কিন্তু সেটা তেমন কোন দুশ্চিন্তার ব্যাপার নয়। তাছাড়া, এ-ধরনের ঝুঁকি নিতে পছন্দ করে ও। ওরা যখন জানবে কাজটা করার কোন ইচ্ছে তার নেই, স্বভাবতই হুমকি আসবে। কিন্তু হুমকিতে ভয় পাবার বান্দা ডিউক নয়। নিজেকে কিভাবে রক্ষা করতে হয় জানা আছে তার। তাছাড়া, ওদের দৌড় ওই হুমকি দেয়া পর্যন্তই। তবু ওরা যদি বেশি বাড়াবাড়ি করে, আলি হোসেন খানকে ওদের কথা বলে দিলেই সব ল্যাঠা চুকে যাবে। পুলিসকে কিছু বলার মত পেলে আর কিছু চায় না লোকটা।

হলরুমে বেরিয়ে এসে আরেকবার পিছন দিকে তাকাল রানা। 'আবার দেখা হবে,' বলে দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল ও। তারপর হন হন করে বাইরের বেরুবার দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় শার্টের আস্তিন দিয়ে কপালের ঘাম মুছল রানা। এখনও পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে না ব্যাপারটা। পঁচাত্তর হাজার টাকা! এমনি এমনি পেয়ে গেল। এমন বোকাও আছে দুনিয়ায়! রুবির চেহারাটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। ঠোঁটটা কাটা নয়, সেরে গেছে, সেলাইয়ের দাগ পর্যন্ত নেই। উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল রানার মুখ।

নিচে নেমে এল রানা। পাহারাদার লোকটা সেই থেকে বসে আছে। বোধ হয় নতুন লোক বলেই কিংবা অন্য যে-কোন কারণেই হোক, খুঁটিয়ে দেখল রানাকে। চোখাচোখি হতে ঠোঁট গোল করে শিস দিল রানা।

মুখ ফিরিয়ে নিল গার্ড। চেহারাটা গম্ভীর করে তুলে বোঝাতে চাইল, এ-ধরনের ফাজলামি সে পছন্দ করে না।

চার

একই জায়গায় বেশি দিন থাকা উচিত নয় ডিউকের, তাই কিছু দিন পরপরই ঠিকানা বদল করে রানা। আজকাল মালিবাগে এক সার দোকানের ওপর একটা তিন কামরার ফ্ল্যাটে থাকে ও। ভাড়া একটু বেশি দিতে হয়, কিন্তু অনেকগুলো সুবিধেও আছে। ফার্নিচার দিয়ে সাজানোই ছিল, কিনতে হয়নি কিছু। নিচের দোকান থেকে লোকজনের আওয়াজ আসে, কিন্তু বারান্দাটা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বলে বাইরে বা নিচে থেকে ওর ফ্ল্যাটের ভেতর কারও নজর পড়ে না। পায়ের পাতার ওপর দাঁড়ালে বারান্দা থেকে রাস্তার উল্টো দিকের একটা ড্রাগ স্টোরের সাইনবোর্ডটা ছাড়া আর কিছু দেখতে পাওয়া যায় না। আধবুড়ি একটা মেয়েলোক রোজ দু'বেলা

এসে ঘর-দোর পরিষ্কার করে দিয়ে যায়। খাওয়া-দাওয়া বাইরেই সারে রানা।

আর সব দিনের চেয়ে আজ একটু তাড়াতাড়ি ফ্ল্যাটে ফিরল ও। নঈমের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা এয়ারপোর্টে চলে গিয়েছিল। বেআইনী টাকার ব্যবসা করে এক লোক, ভারতীয় রূপীর বিনিময়ে বাংলাদেশী টাকা বদলে নিয়েছে তার কাছে থেকে। ওখান থেকে গেছে বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে, নিজের ব্যাংকে। প্রায় আশি হাজার টাকা জমা দিচ্ছে দেখে ম্যানেজার ভারি অবাক হয়েছে, কিন্তু সাহস করে জানতে চায়নি হঠাৎ করে এত টাকা কোথায় পেল ও। ওখান থেকে ম্যান্ডারিনে এসে লাঞ্চ সেরেছে। টেলিফোনে যোগাযোগ করেছে প্লাস্টিক সার্জেনের সাথে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট রক্ষা করেছে রিকেল চারটেয়।

'যত টাকাই লাগুক, রুবির ঠোঁট যেন জোড়া লাগে,' সার্জেনকে বলেছে ও।

মৌখিক আশ্বাস দিতে কার্পণ্য করেননি সার্জেন, কিন্তু নিশ্চিত হয়ে কিছু বলার আগে রুবিকে দেখতে চেয়েছেন। তারিখ এবং সময় ঠিক করে চেক লিখে দিয়েছে রানা। তারপর একটা রেস্তোরাঁ থেকে ফোন করেছে রুবিকে। ডাক্তারের সাথে যা যা কথা হয়েছে সব বলেছে তাকে। কিন্তু কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে রুবি কিছু বলতে শুরু করার আগেই রিসিভার রেখে দিয়েছে ও।

দু'জন লোককে কথা দেয়া ছিল। কাজ দেবে ওরা। হাতে মোটা টাকা এসে পড়ায় এখন আর দেখা করার তেমন গরজ নেই রানার। কিন্তু হাতে আরও কিছু টাকা আসতে পারে, সময়টাও কাটবে ভেবে যথাসময় যথাস্থানে পৌঁছুল ও। প্রথম লোকটার সাথে দরে বনল না। অন্য সময় হলে এর চেয়ে কম টাকায় কাজটা করে দিত রানা। পাঁচ হাজার টাকার প্রস্তাবটা পায়ে ঠেলল ডিউক, লোকটা রীতিমত অবাকই হলো। দ্বিতীয় লোকটাকেও নিরাশ করল রানা। তারটা আরও মোটা টাকার প্রস্তাব। কিন্তু কাজটা নোংরা লাগল রানার, তাই অস্বাভাবিক বেশি টাকা চাইল। একটা মেয়েকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিতে হবে, মেয়েটার বাড়িতে ডিউকের অবাধ যাতায়াত আছে বলে ওর জন্যে এটা কোন সমস্যাই নয় মেয়েটা ঘুমাবে, এই সুযোগে তার ঘরে ঢুকে কিছু একটা করবে লোকটা হয়তো মেয়েটাকে বিবস্ত্র করে তার ফটো নেবে। ব্ল্যাকমেইল করাটাই উদ্দেশ্য। হয়তো তা নয়, রেপ করার ইচ্ছে। পঞ্চাশ হাজার চাইল রানা রেগেমেগে চলে গেল লোকটা।

সন্ধের পর রেস্তোরাঁ আর বারে আড্ডা দিয়ে সময় কাটাল রানা। ফ্ল্যাটে ফিরল ন'টায়। বাইরে খেয়ে নিয়েছে, ভেতরে ঢুকে সটান শুয়ে পড়ল বিছানায় চোখে ঘুম নেই, মাথার ভেতর চিন্তা। এক কথায় আশি হাজার টাকা দিয়ে দিল, এর মধ্যে জটিল কোন গোলমাল নেই তো? আই.ও.ইউ. সই করিয়ে নেবার মানে কি? আসলেই কি ওরা বোকা? মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগল। কিন্তু অনেক চিন্তা করেও কোন দিক থেকে বিপদের কোন সম্ভাবনা দেখল না। নিজেকে এই বলে বোঝাল, বিপদ যদি আসেই, সামলে নেবে সে। আশি হাজার টাকার সাথে খানিকটা ঝুঁকি যে থাকবেই এ তো জানা কথা। এরপর মনটা হালকা হয়ে গেল ওর।

সিলিঙের দিকে তাকিয়ে একটা সিগারেট ধরাল ও। নঈমের ফ্ল্যাটে এই মুহূর্তে কি করছে কেয়া চৌধুরী? ঠিক হয়েছে কাল রাতে তার সাথে হোটেল জনপদে

দেখা হবে ওর, কিন্তু কাল রাত আসতে এখনও অনেক দেরি। এখুনি যদি একবার দেখতে পেত কেয়াকে···আরে! এসব কি চিন্তা করছে ও?

কিন্তু পরমুহূর্তে আবার কেয়ার চেহারা ভেসে উঠল চোখের সামনে। খুব যে সুন্দরী তা হয়তো নয়, কিন্তু মেয়েটার মধ্যে আশ্চর্য একটা আকর্ষণ আছে। আচরণে, ভাব-ভঙ্গিতে ইস্পাতের মত একটা কাঠিন্য থাকলেও, রানার বিশ্বাস, কঠিন আবরণের ভেতর কোমল একটা মন না থেকেই পারে না। আবার নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিল, বলা যায় না, কঠিন আবরণের ভেতর মনটা হয়তো আরও বেশি শক্ত, স্নেহ-ভালবাসা, প্রেম-প্রীতির হয়তো কোন ঠাঁই-ই নেই সেখানে।···আচ্ছা, কেয়া চৌধুরীকে নিয়ে এত মাথাব্যথা কেন তার—দেখা হলে যাকে বলবে, দুঃখিত, তোমাদের কাজটা আমি করে দিতে পারছি না!

কি হবে প্রতিক্রিয়াটা? মনে মনে কল্পনা করার চেষ্টা করল রানা। বড় বড় চোখ দুটো ঘৃণায় জ্বলজ্বল করবে। নাকের ফুটো ছোট বড় হবে ঘন ঘন। ফর্সা মুখটা লাল হয়ে উঠবে। অনেকক্ষণ কোন কথাই বলতে পারবে না সে। আর শাহেদ? তাকে অপ্রস্তুত দেখাবে, হয়তো হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে ওর দিকে। কিন্তু আকরামের প্রতিক্রিয়া হবে অন্য রকম। রানার কথা শেষ হওয়া মাত্র মাউজারের বাঁটে চলে যাবে তার হাত।

মুচকি হাসল রানা। ওদেরকে বলবে সে, যাও, পারলে আমার নামে থানায় কেস করো গিয়ে। আই.ও.ইউ. সই করিয়ে নিয়েছ, চেষ্টা করে দেখো টাকাটা আদায় করতে পারো কিনা। রাগে ফুঁসবে তিনজনই, কিন্তু ওই পর্যন্তই। ওর বিরুদ্ধে কিছুই করার নেই ওদের।

এনভেলাপের কথা মনে পড়ে গেল। পকেট থেকে বের করে খুলল সেটা। ভেতরে কয়েক শীট কাগজ। টাইপ করা। ভাঁজ খুলে পড়তে শুরু করল ও।

'আবিদুর রহমান।

জন্ম. তেসরা জানুয়ারি, উনিশশো উনপঞ্চাশ।

বর্ণনা: উচ্চতা—ছয় ফিট এক ইঞ্চি। ওজন একশো বিরাশি পাউন্ড। চুল—কালো, কোঁকড়ানো গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যামলা। অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য—লাহোর এয়ারবেস থেকে পালাবার সময় গলায় গুলি লাগে, সেই থেকে কণ্ঠস্বর ফ্যাঁসফেঁসে, বিকৃত হয়ে গেছে। কথা বললে মনে হয় ফিসফিস করছে গলা চড়াতে পারে না, চিৎকার বেরোয় না। কিন্তু চর্চা করে স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলা রপ্ত করে নিয়েছে।

আচরণগত বৈশিষ্ট্য—খুব রেগে গেলে মুঠো করা ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতের তালুতে ঘুসি মারে। খুব খুশি হলে হাতের সাথে হাত চাপড়ায়, ঘষে। তর্জনী আর বুড়ো আঙুলে সিগারেট ধরে। বুড়ো আঙুলের নখে বারুদ ঘষে দিয়াশলাই জ্বালে। খুব কম হাসে। শব্দ করে হাসতে দেখা যায়নি। চারকোনা মুখ।'

পরের পাতাগুলোয় চোখ বুলাল রানা। গুরুত্বপূর্ণ কিছু দেখল না। তিন নম্বর পাতায় আবার আটকে গেল চোখ। 'আত্মীয়-স্বজন: একমাত্র আত্মীয়ার কথা জানা গেছে, মিসেস তোফাজ্জল হোসেন, চাচীমা। আবিদের মা মারা যাবার পর এই চাচীমাই তাকে মানুষ করেন। আবিদ বাপের সাথে ঝগড়া করে বাড়ি ছাড়ে, ভর্তি হয় পাকিস্তান এয়ারফোর্সে। মস্ত বড়লোকের ছেলে ছিল ও, বাবা মারা যাওয়ার পর

অনেক সম্পত্তির মালিক হয়েছিল।'

মস্ত একটা হাই তুলল রানা। কোন রকম আগ্রহ বা উৎসাহ বোধ করছে না ও। কাগজগুলো দলা পাকিয়ে ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে ফেলে দিল। বিছানা থেকে নেমে কাপড় খুলল, তারপর আবার শুয়ে চোখ বুজল। প্রায় সাথে সাথে ঘুমিয়ে পড়ল ও।

কলিংবেলের মৃদু টুং টাং আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল রানার। কাঁচা ঘুম, খুলতে ইচ্ছে করল না চোখ। আন্দাজ করল, খুব বেশি হলে আধঘন্টা ঘুমিয়েছে ও। তারমানে দশটা বাজে। ডিউক বা তার পরিচিত জগতের জন্যে মোটেও বেশি রাত নয়। যে-কেউ আসতে পারে। বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করল না, ভাবল, আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখা যাক। লোকটা চলে গেলেই ভাল। খুব জরুরী কোন কাজ না থাকলে পাঁচবার বেল টিপে ফেরত যাবে।

আবার বাজল টুং টাং। কিছুক্ষণ বিরতি। তারপর আবার। এবার বোতামটা একটানা অনেকক্ষণ চেপে রাখল। নাহ্, এড়ানো গেল না! রাজ্যের অসন্তোষ নিয়ে বিছানা ছাড়ল রানা। স্লিপিং গাউনটা জড়িয়ে নিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এল হলরুমে, সেখান থেকে দরজা খুলে সিঁড়িতে। ধাপ বেয়ে নিচে নামল না, কর্কশ গলায় জানতে চাইল, 'কে?'

জবাব দিল না কেউ। কিন্তু নিচের দরজায় নক হলো। ভুরু জোড়া একটু কুঁচকে উঠল রানার। ধাপ টপকে নামতে শুরু করল ও। নিচে নেমে এসে কবাটের গায়ের একটা ফুটোয় চোখ রেখে বাইরে তাকাতেই কেয়াকে দেখতে পেল। কেন যেন, অকারণেই দুরু দুরু করে উঠল বুক। এক সেকেন্ড ইতস্তত করল ও। এত রাতে কি মনে করে? মনে হচ্ছে একা···আসলে কি তাই? নিজের অজান্তেই কঠিন হয়ে উঠল রানার চেহারা। দেয়াল হাতড়ে আলো জ্বালল। ছিটকিনি নামিয়ে খুলে দিল দরজা।

চাঁদের আলোয় দাঁড়িয়ে রয়েছে কেয়া। পরনে গাঢ় নীল রঙের একটা ম্যাক্সি।

'এসো।' একপাশে সরে পথ ছেড়ে দিল রানা। 'তুমি একা?'

'হ্যাঁ,' বলল কেয়া। রানাকে পাশ কাটিয়ে প্যাসেজে চলে এল সে।

দরজা বন্ধ করতে একটু বেশি সময় নিল রানা। বাইরে আলো-আঁধারিতে আকরাম বা শাহেদ দাঁড়িয়ে আছে কিনা বুঝতে চাইল ও। দেখল না কাউকে।

'বললাম তো, আমি একা,' রানার পিছন থেকে শান্ত সুরে বলল কেয়া।

মুহূর্তের জন্যে শক্ত হয়ে উঠল রানার শরীর। দরজা বন্ধ করে ঘুরল ও। 'সোজা ওপরে।'

সিঁড়ির ধাপ টপকে উঠতে শুরু করল কেয়া। পিঠটা খাড়া, পা ফেলার ভঙ্গিটা দৃঢ়। তার সুগঠিত নিতম্বের দোলা লক্ষ্য করে নিজের অজান্তেই একটা ঢোক গিলল রানা। সিটিং রুমে ঢুকল কেয়া। পিছু পিছু ভেতরে ঢুকল রানা।

'এত রাতে কি মনে করে?' জুলফির নিচেটা আঙুল দিয়ে ঘষতে ঘষতে জানতে চাইল রানা। 'শুয়ে পড়েছিলাম। কাল রাতে খুব কম ঘুমিয়েছি।'

মুখ ফিরিয়ে নিল কেয়া। কথা না বলে ঘরের চারদিকে চোখ বুলাল। তীক্ষ্ণ

নজর, খুঁটিয়ে দেখল সব। পুরানো সোফা এখানে সেখানে ডেবে গেছে, জানালার পর্দাগুলো মলিন, দেয়ালে ডিসটেম্পারের রঙ কোথাও উজ্জ্বল, কোথাও ফ্যাকাসে হয়ে আছে, সুতো বেরিয়ে আছে কার্পেটের। টেবিল ক্লথটাও পরিষ্কার নয়।

আলমিরা খুলে কেরু কোম্পানির এক বোতল জিন বের করল রানা। 'শাহেদ বলছিল তুমি নাকি টেনশন কমাবার জন্যে ওদেরকে মদ ধরার পরামর্শ দিয়েছ। চলবে নাকি?' হ্যাঁ বা না কিছুই বলল না কেয়া। সিটিং রুম থেকে বেরিয়ে কিচেনে ঢুকল রানা। আসলে কেয়ার চুপ করে থাকাটা সহ্য করতে পারছে না বলে পালিয়ে এল। দুটো গ্লাস নিল হাতে, কিন্তু সাথে সাথে কিচেন থেকে বেরুল না। অস্বস্তিটুকু কাটতে আরও কয়েক মুহূর্ত লাগল। সিটিং রুমে ফিরে দেখল, একটা জানালার দিকে পিছন ফিরে এখনও দাঁড়িয়ে আছে কেয়া। চেহারায় শান্ত কিন্তু সতর্ক ভাব। চোখের দৃষ্টি দেখে রানার মনে হলো, সব দেখতে চায়, কিছু বাদ দিতে রাজি নয়। গ্লাসে জিন ঢেলে তাতে ফ্রিজ খুলে ঠাণ্ডা পানি মেশাল রানা। কেয়ার গ্লাসটা রাখল টেবিলের কিনারায়।

'দাঁড়িয়ে কেন, বসো,' সিগারেট ধরাবার ফাঁকে বলল রানা। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে নিজের গ্লাসটা তুলে চুমুক দিল। 'বলো, আর কি করতে পারি তোমার জন্যে?'

নড়ল না কেয়া। যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে থাকল। সেই থেকে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। ওর জন্যে একটা গ্লাস রয়েছে টেবিলের কিনারায়, যেন জানেই না। হঠাৎ করে জানতে চাইল সে, 'কথা দিয়ে কথা না রাখা তোমার একটা স্বভাব, তাই না?'

এই রকম সরাসরি আক্রমণ আশা করেনি রানা। মুহূর্তের জন্যে অপ্রস্তুত দেখাল ওকে, কিন্তু তারপরই মুচকি হাসি ফুটল ঠোঁটে। 'আমার সম্পর্কে কিছুই দেখছি জানতে বাকি রাখোনি তোমরা!' সোফায় বসে পা দুটো লম্বা করে দিল ও। 'হ্যাঁ, তা বলতে পারো। সব কথা রাখি না আমি।'

'কাজ করে দিতে রাজি হও, টাকা নাও অ্যাডভান্স, কিন্তু কাজটা করে দাও না,' বলল কেয়া। 'টাকা কামাবার এর চেয়ে সহজ রাস্তা আর কি হতে পারে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'সহজ তো বটেই। কখনও কখনও বড় বেশি সহজ,' হালকা সুরে বলল ও। কিন্তু কেয়াকে সম্পূর্ণ শান্ত স্বাভাবিক দেখে মনে মনে আশ্চর্যই হলো ও। আশা করেছিল, উত্তরটা শুনে তেড়ে উঠবে মেয়েটা। রাগে বোমার মত বিস্ফোরিত হবে। কেউ রেগে গেলে তাকে সামলানো ওর পক্ষে সহজ।

'এবং যারা একবার তোমার খপ্পরে পড়ে, লোকসান না দিয়ে উপায় থাকে না তাদের, তাই না?' প্রশ্নের সাথে ক্ষীণ একটু হাসি দেখা গেল কেয়ার ঠোঁটে। 'অ্যাডভান্স নেয়া টাকা ফেরত দাও না তুমি।'

'দেবার প্রয়োজন দেখি না,' বলল রানা। 'কাজগুলো বেআইনী, কাজেই আমার নামে কেস করতে পারে না কেউ। এই যেমন তোমাদের ব্যাপারটা। আমাকে দিয়ে আই.ও.ইউ. সই করিয়ে নিয়েছ।' মুচকি হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। 'তোমাদের কাজটা আমি যদি করে না দিই, তোমরা বোধ হয় কেস করার কথা

তেবে রেখেছ।'

কথা না বলে হাত বাড়িয়ে টেবিলের কিনারা থেকে জিনের গ্লাসটা তুলে নিল কেয়া। চুমুক দেবার জন্যে মুখের কাছে তুলল সেটা। গ্লাসের কিনারায় দেখা গেল চোখ দুটো, তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

লাফ দিয়ে সরে গা বাঁচানোর জন্যে তৈরি হয়ে গেল রানা। মনে হলো, জিনটুকু ওর দিকে ছুঁড়ে দেবে কেয়া। কিন্তু না। গ্লাসের কিনারা ঠোঁটে ঠেকিয়ে এক চুমুকে অর্ধেক খালি করে ফেলল সে। দু'পা পিছিয়ে একটা সোফায় বসল। 'আমাদের সাথে পাসপোর্ট নেই, অবৈধভাবে বাংলাদেশে ঢুকেছি, এসব তুমি নঈমের কাছ থেকে জেনেছ, তাই না?'

'হ্যাঁ। সেজন্যেই তোমরা যখন আই.ও.ইউ. সই করিয়ে নিতে চাইলে, অবাক না হয়ে পারিনি।'

'আবিদকে খুঁজে বের করার ইচ্ছে তোমার আসলে নেই, তাই না?'

'অবশ্যই নেই!' বলল রানা। 'আমি কি তোমাদের মত পাগল হয়েছি? ওকে যদি একান্তই খুন করতে চাও, যাও, নিজেরা করোগে যাও। তোমরা অযোগ্য, শুধু সেজন্যে তোমাদের হয়ে চিনি না এমন একজন লোককে আমার খুন করতে হবে, তা কেমন করে হয়?'

'অথচ টাকা তুমি ঠিকই নিয়েছ!'

'দিলে সব সময়ই নিই,' টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেট খুলে কেয়ার দিকে বাড়িয়ে দিল রানা। 'টেনশন দমন করার জন্যে স্মোকিংও ভাল।'

রানা ধারণা করেছিল কঠিন ভাষায় প্রত্যাখ্যান করবে কেয়া, কিন্তু তা না করে হাত বাড়িয়ে একটা সিগারেট বের করে নিল সে। দিয়াশলাই জ্বেলে সেটা ধরিয়ে দিল রানা। লক্ষ্য করল, মেয়েটার হাত একটু কাঁপল না।

'বোকার মত অসম্ভব সব কাজ নিয়ে আমার কাছে আসা উচিত নয় কারও,' হালকা সুরে বলল রানা। 'আমাকে ঘাঁটাতে না এলেই সবার জন্যে মঙ্গল।'

সোফায় হেলান দিল কেয়া। অলস ভঙ্গিতে পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে আরাম করে বসল। শরীরে কোথাও টান টান হয়ে নেই পেশী। চেহারাটায় রাগ বা উত্তেজনার ছাপ নেই। ভাবসাব দেখে মনে মনে বিস্ময় এবং অস্বস্তি বোধ করল রানা। ধীরে ধীরে বলল, 'তুমি খুব শক্ত ধাতুতে গড়া। আশি হাজার টাকা কম নয়, অথচ এমন সহজ ভাবে নিচ্ছ ব্যাপারটাকে...'

পরিচয় হবার পর এই প্রথম মিষ্টি করে হাসল কেয়া। 'আমাকে তুমি বোকা ধরে নিয়েছ, তাই না?'

'না, ঠিক তা নয়,' মৃদু শব্দে হাসল রানা। 'তোমাকে আমার বরং সাধারণ বলে মনে হয়েছে।'

'আই.ও.ইউ. সই করিয়ে নিয়েছি বলে?'

'এ-কথা তো ঠিক যে পুলিসকে ওটা দেখিয়ে আমার কাছ থেকে টাকাটা উদ্ধার করবে তার কোন উপায় নেই?'

'হ্যাঁ, তা নেই। সই করাবার আগে থেকেই জানতাম। তোমাকে দিয়ে আমি ওটা সই করিয়ে নিয়েছি অন্য কারণে।'

সতর্ক, সন্দিহান হয়ে উঠল রানা। তবে কি এদেরকে বুঝতে ভুল করেছে ও? প্রথম থেকেই মনটা খুঁতখুঁত করছিল, বড় সহজে হাতে চলে এল টাকাটা। কোথাও কি তাহলে প্যাঁচ রয়ে গেছে? দূর ছাই, খামোকা ভয় পাবার কোন মানে হয় না। কি-ই বা করতে পারে ওরা? টাকাগুলো তো ব্যাংকে, ওর নামে জমা হয়ে গেছে। ওতে হাত দেবে তার কোন উপায় নেই।

'অন্য কারণ?' জানতে চাইল রানা। 'কি সেটা?'

শেষ চুমুক দিয়ে গ্লাসটা রানার দিকে বাড়িয়ে দিল কেয়া। বলল, 'টেনশন কমাবার জন্যে জিন খাচ্ছি, তা মনে কোরো না। বলতে পারো ফুর্তি করছি।'

গ্লাসটা নিয়ে তাতে আরও খানিকটা জিন আর পানি ভরল রানা। অনুভব করল, পাঁজরে বাড়ি খেতে শুরু করেছে হৃৎপিণ্ড। হাতের তালু একটু একটু ঘামছে। ওর হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে আরেকটা ছোট্ট চুমুক দিল কেয়া।

তারপর বলল, 'আমি আসলে তোমাকে বোঝাতে এসেছি। প্লীজ, ডিউক, আবিদকে খুঁজে দাও!'

চোখ জোড়া ছোট ছোট করে কেয়ার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর জানতে চাইল রানা। 'তোমার অনুরোধে কাজ করব, এ-কথা ভাবলে কেন?'

'করবে না?' রানার দিকে ঝুঁকে এল কেয়া। 'কেন করবে না? আবিদ বিশ্বাসঘাতক ছিল। শুধু আমাদের সাথে নয়, দেশের সাথে বেঈমানী করেছে। তার বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই। আমি জানি, বিশ্বাসঘাতকদের ঘৃণা করো তুমি।'

'দেশের সাথে যারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে দেশ তাদের ওপর প্রতিশোধও নিয়েছে,' বলল রানা। 'সেই দেশই আবার তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছে। এখন তাদের গায়ে হাত দেয়ার মানে নিজের হাতে আইন তুলে নেয়া। তাতে আমি রাজি নই।'

'ফিরোজকে যদি চিনতে, এ-কথা বলতে পারতে না তুমি,' ফিসফিস করে বলল কেয়া। হাত দুটো শক্ত মুঠো হয়ে গেল তার। 'ফিরোজ ছিল বাংলাদেশের গর্ব, কিন্তু তার কথা দেশবাসী জানার সুযোগ পায়নি। দালালি করতে গিয়ে খুন হয়ে অনেক লোক শহীদ মুক্তিযোদ্ধা হয়ে গেল, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে মারা গিয়ে ন্যায় বিচারের সুযোগটাও পাবে না ফিরোজ ভাই, কিভাবে সেটা তুমি মেনে নিতে পারো, একজন মুক্তিযোদ্ধা হয়ে?'

'ফিরোজ কি ছিল আমার জানা নেই,' বলল রানা 'তাকে আমি চিনতাম না। কিন্তু জানি, বাংলাদেশের গর্ব এই রকম অনেক ফিরোজ বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়ে মারা গেছে, দেশের লোক তাদের কথা জানার সুযোগ পায়নি। যদি বদলা নিতে চাই, যতদিন বাঁচব রোজ একটা করে বেঈমানকে খুন করতে হয়। তা কি সম্ভব? শুধু ফিরোজকে তুমি ভালবাসতে বলে...'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল কেয়া। গ্লাস থেকে ছলকে পড়ল জিন। চোখে যেন আগুন জ্বলে উঠল। রানার ওপর ঝুঁকে পড়ল সে, চাপা উত্তেজিত স্বরে জানতে চাইল, 'আবিদকে খুঁজে দেবে, নাকি দেবে না?'

'পাগল!' হেসে উঠে বলল রানা। সমস্ত অস্বস্তি, উদ্বেগ কাটিয়ে উঠেছে ও।

কেউ রেগে গেলে তার সাথে বোঝাপড়া করা ওর জন্যে পানির মত সহজ। 'আগুন থেকে পারলে নিজেদের বেল নিজেরাই বের করো।'

'ভেবে দেখো, ডিউক!' চিৎকার করে উঠল কেয়া। 'ভেবে দেখো।' উন্নত বুক দ্রুত ওঠা-নামা করতে শুরু করল। খড়িমাটির মত সাদা হয়ে গেছে মুখ। কিন্তু সেখানে কোন রাগ বা উত্তেজনার ছাপ নেই। রানা বুঝল, রাগ চেপে রাখার জন্যে নিজের সাথে প্রাণপণ লড়ছে মেয়েটা।

'আসলেই তুমি বোকা,' এমন ভঙ্গি করল রানা, যেন বিরক্ত হয়েছে, কিন্তু কথাটা বলল হাসতে হাসতে। 'একজনের প্রাণ কেড়ে নেয়া···সে তো আশি কোটি টাকার কাজ। অত টাকা তোমাদের নেই, কাজেই আমাকে দিয়ে কাজটা করাবার আশা তোমরা ছেড়ে দিলেই ভাল করবে। তোমাদের টাকা নিয়েছি, ঠিক আছে, পারলে আদায় করে নাও। আই.ও.ইউ. সই করিয়ে নিয়েছ, কিন্তু ওটা তোমরা কাজে লাগাতে পারছ না। তোমাদের দলে ফেরোশাস আকরাম আছে, তার কাছে পিস্তলও আছে, কিন্তু আমার সাথে লাগতে এলে বুঝবে ওর মত দশজনকে আমি একাই সামলাতে পারি। রাগ দেখিয়ে বা হুমকি দিয়ে কোন লাভ নেই। তোমাদের একজনকেও আমি কেয়ার করি না।'

হঠাৎ ঘুরে গেল কেয়া, রানার দিকে আধ ফেরা অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকল। তার মুখ দেখতে পেল না রানা। ঝাড়া দশ সেকেন্ড এই ভঙ্গিতে স্থির হয়ে থাকল কেয়া, তারপর ধীরে ধীরে বসে পড়ল সোফায়। তাকে সম্পূর্ণ শান্ত এবং স্বাভাবিক দেখাল আবার। রানা কল্পনা করার চেষ্টা করল, কি আসছে এবার?

'তুমি যে এই রকম করবে সে আমি জানতাম,' বলল কেয়া। 'কিন্তু শাহেদ বলল, সে তোমাকে বিশ্বাস করে।'

'লোকটা খুব সরল টাইপের,' বলল রানা। চোখে সতর্ক দৃষ্টি। কেয়াকে খুঁটিয়ে দেখে তার মনের কথা পড়তে চাইছে। উপলব্ধি করল, কেয়ার রাগের চেয়ে শান্ত ভাবটা অনেক বেশি ভীতিকর, বিপজ্জনক। 'ও নিজে যেমন, আর সবাইকেও তাই মনে করে। এটা মহা বোকামি।'

'হ্যাঁ,' সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকাল কেয়া। 'মহা বোকামি।' রানার ওপর থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে ঘরের দেয়ালে ঝোলানো ক্যালেন্ডারের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকল। 'কিন্তু আমাদের আলোচনা শাহেদকে নিয়ে নয়। তোমাকে আর আবিদকে নিয়ে। আসলে···' রানার দিকে তাকাল কেয়া, ক্ষীণ একটু হাসি ফুটল ঠোঁটে। '···আসলে তোমার কোন উপায় নেই—তাকে খুঁজে বের করতেই হবে। এড়িয়ে যাবে, তা সম্ভব নয়। চাও বা না চাও, আমার কথা শুনতে হবে তোমাকে।'

হা হা করে হেসে উঠল রানা। কেয়ার কথা শুনে মজা লাগছে ওর। 'সাবাস! তোমার নিজের ওপর এত বিশ্বাস, দেখে হিংসে হয়।'

আবার ক্যালেন্ডারের ছবির দিকে তাকাল কেয়া। 'আমরা কিন্তু তোমাকে হুমকি দিচ্ছি না। শুধু বলছি, আবিদকে খুঁজে বের করো। তুমি যে সত্যি তাকে খুঁজে বের করবে, এ-ব্যাপারে আমাদের মনে কোন সন্দেহ নেই।'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রানা। তারপর মৃদু হেসে বলল, 'তোমাদের ধারণা ভুল।'

রানার দিকে তাকাল কেয়া। নাটকীয় ভাবে একটু চুপ করে থেকে মৃদু, শান্ত কণ্ঠে বলল, 'নঈম মারা গেছে।'

পাঁচ

'ওরা আমাকে মেরে ফেলবে!' নঈমের কথাটা মনে পড়ে গেল রানার।

নঈম মারা গেছে শুনে হতভম্ব হয়ে পড়ল ও, অনেকক্ষণ কোন কথাই বলতে পারল না। শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা একটা স্পর্শ উঠে এল। আবার সেই চিন্তাটা জাগল মাথায়—এদেরকে বুঝতে ভুল করেছে ও, নাকি মিথ্যে বলছে কেয়া?

টেবিলের ওপর থেকে প্যাকেট তুলে নিয়ে আবার একটা সিগারেট ধরাল কেয়া। 'বুঝতেই পারছ, টেনশন কমাবার জন্যে সিগারেট খাচ্ছি না। বলতে পারো, ফুর্তি লাগছে, তাই ধরালাম।'

'নঈম মরে গেছে কি বেঁচে আছে তাতে আমার কি?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইল রানা। 'নঈম আমার কেউ নয়। তার ব্যাপারে আমার কিছু আসে যায় না।'

'কথাটা কি বুদ্ধিমানের মত হলো?' প্রশ্ন করল কেয়া। 'একটু চিন্তা করো। জীবিত নঈমের ব্যাপারে তোমার হয়তো কিছু আসে যায় না, কিন্তু মরা নঈমের ব্যাপারে অনেক কিছু আসে যায়। নিজেই বুঝে নাও।'

'কি বলতে চাও তুমি?' সামনের দিকে ঝুঁকে কঠিন সুরে জানতে চাইল রানা।

'তুমি চলে আসার পাঁচ মিনিট পর গুলি খেয়ে মারা গেছে নঈম,' বলল কেয়া। চেহারায় কোন ভাবান্তর নেই। 'বিপদটা দেখতে পাচ্ছ না? খোঁজো, পেয়ে যাবে।'

আচমকা উপলব্ধি করল রানা, তিনজনের এই দলটা ফাঁদে ফেলেছে তাকে। কিন্তু তবু ধরতে পারল না কোথায় কি প্যাঁচের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে সে। শুধু মেয়েটার ঠাণ্ডা আচরণ, চোখের দৃষ্টিতে বিজয়ের উল্লাস ওকে বুঝিয়ে দিল ওর ওপর টেক্কা দিয়েছে ওরা।

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ও, বলল, 'আমি কোন বিপদ দেখতে পাচ্ছি না।'

'তুমি দেখতে না পেলেও ওরা কিন্তু আসবে।'

'কারা আসবে?'

'কেন, পুলিস!'

বিদ্যুৎ চমকের মত হঠাৎ সব পরিষ্কার বুঝতে পারল রানা। বুঝতে পারল কিভাবে ফাঁসানো হয়েছে ওকে। সাথে সাথে প্রচণ্ড রাগ হলো ওর। পরমুহূর্তে অসহায় বোধ করল। মাউজারে ওর হাতের ছাপ আছে। মনে পড়ল, আকরাম দস্তানা পরে ছিল। খুনের মোটিভ কি? এই প্রশ্নের উত্তর দেবে সই করা আই.ও.ইউ.-টা। ফ্ল্যাট বাড়ি থেকে ওকে বেরিয়ে আসতে দেখেছে গার্ড। লোকটা ওর চেহারা মনে করতে পারবে অনায়াসে। অনেক দিন থেকে ওকে ধরার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরছে পুলিস, মস্ত একটা সুযোগ পেয়ে যাবে তারা। এভিডেন্সগুলো

খুঁটিয়ে পরীক্ষা করবে না।

'মিথ্যে কথা।' চাপা গলায় বলল রানা। 'নঈমকে গুলি করবে সে সাহস তোমাদের নেই।'

শান্ত দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল কেয়া। কোন উত্তরই করল না।

'এর সাথে যদি আমাকে জড়াও, আমিও তোমাদেরকে ফাঁসিয়ে দেব,' সাবধান করে দেয়ার সুরে বলল রানা।

'তা পারবে বলে মনে করি না।' শান্ত দেখাল কেয়াকে। হাতের মৃদু একটা ঝাপটা দিয়ে মুখের সামনে চলে আসা চুল সরিয়ে দিল সে। 'আমরা যে নঈমের ফ্ল্যাটে ছিলাম, কেউ তা জানে না। কেউ যাতে আমাদের দেখতে না পায়, সেজন্যে আগে থেকেই সাবধান ছিলাম আমরা। এখন গা ঢাকা দেব সবাই। নঈমের সাথে আমাদের জড়াবে, তার কোন উপায় আমরা রাখিনি।'

হাত দিয়ে চোয়াল ঘষতে লাগল রানা। কেয়ার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজের গ্লাসে আরেকটু জিন ঢালল। পানি না মিশিয়ে এক চুমুকে শেষ করল সেটা। দ্রুত কাজ করছে মাথা। নানা দিক থেকে উল্টেপাল্টে দেখার চেষ্টা করল সমস্যাটাকে। এই ফাঁদ থেকে বেরুবার কোন উপায় পাওয়া যায় কিনা।

'যা বললে তারপর এখান থেকে তোমাকে আমি চলে যেতে দেব, নিশ্চয়ই এটা তুমি আশা করো না? পুলিসকে ডেকে পাঠাই, সব কথা খুলে বলি, তারপর তাদের হাতে তোমাকে তুলে দিই, কেমন হবে সেটা? এদিকটা বোধ হয় ভেবে দেখোনি?'

'সেটা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে?' ঠোঁট টেপা হাসিটা বিচ্ছিরি লাগল কেয়ার মুখে। 'এর চেয়ে ভাল কোন উপায় বের করতে হবে তোমাকে। পুলিসকে আমার বিরুদ্ধে কিছু বললেই পুলিস সেটা বিশ্বাস করবে, তা মনে কোরো না। তোমার রেকর্ড খারাপ, ওরা বরং আমার কথাই বিশ্বাস করবে।'

যুক্তির কথা বলছে কেয়া। কোণঠাসা ইঁদুরের মত মনে মনে ছটফট করতে লাগল রানা। বুদ্ধি কিছুটা ঘোলা হয়ে গেছে, সেজন্যে নিজেকে তিরস্কার করল ও। জিনের গ্লাসে চুমুক দিয়ে চিন্তিত ভাবে তাকিয়ে থাকল টেবিলের ওপর। এক দিক দিয়ে বলতে গেলে, এই বিপর্যয় অনিবার্য ছিল। এই খেলায় সব সময় জিতবে তুমি, এটা আশা করা যায় না। অনেক আগে থেকেই জানতে, আগে হোক পরে হোক, কোথাও একটা ভুল হবেই। ফেঁসে যাবেই। এই ফাঁদ থেকে বেরুবার সবচেয়ে ভাল রাস্তা, পরাজয় স্বীকার করে নেয়া। তারপর, ওরা কখন অসতর্ক অবস্থায় থাকে তার জন্যে অপেক্ষা করা।

'ঠিক আছে,' বলে জোর করে হাসল রানা। 'বুঝতে পারছি, তোমরা আমার ওপর টেক্কা মেরেছ। বেশ, তোমাদের টাকা আমি ফিরিয়ে দেব। সেটাই তো চাইছ, তাই না?'

'না। টাকা ফেরত চাই না। পেমেন্ট যখন অ্যাকসেপ্ট করেছ, আবিদকে তোমার খুঁজে দিতে হবে।'

'জাহান্নামে যাক আবিদ!' রাগে ফেটে পড়ল রানা। 'পাগলের সাথে নাচার চেয়ে আরও জরুরী কাজ আছে আমার। তাকে তোমরা নিজেরা খুঁজে বের করো।

টাকা আমি কালই তোমাদেরকে ফেরত দেব।'

'আবিদকে খুঁজে বের করবে তুমি, তা না হলে আই.ও.ইউ. আর মাউজারটা পুলিসের কাছে পাঠিয়ে দেব আমরা। ভেবে দেখো, কোনটা চাও?'

রাগ আর ঘৃণায় লাল হয়ে উঠল রানার চেহারা। 'ফাঁদে আমাকে ফেলতে পেরেছ ঠিক, কিন্তু বেশি খুঁচিয়ো না। ভাগ্য কাউকে সারাক্ষণ ফেভার করে না।'

'এর মধ্যে ভাগ্য কোথায় দেখলে তুমি?' অবাক হয়ে জানতে চাইল কেয়া। 'তোমার মনের শয়তানী আগেই অনুমান করতে পেরেছিলাম আমরা, কাজেই সাবধানের মার নেই মনে করে কি ব্যবস্থা নেয়া হবে ঠিক করে রেখেছিলাম। আমাদের কথা মত কাজ করা ছাড়া তোমার কোন বিকল্প নেই। সেটা বুঝতে পারার মধ্যেই রয়েছে তোমার মঙ্গল।'

পরিষ্কার বুঝল রানা, ওর আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে পরিস্থিতি। নঈমকে যদি ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে পারে ওরা, সেই খুনের সাথে ওকে জড়াতে একটুও বাধবে না ওদের।

'হুম,' গম্ভীরভাবে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'বুঝতে পারছি, তোমাদের কথাতেই নাচতে হবে আমাকে।'

'নাচাতে পারব সে-কথা জেনেই তোমার মত লোককে টাকা দিয়েছি আমরা।'

'কিন্তু নঈমকে টাকাও দাওনি, সে তোমাদের তেমন কোন ক্ষতিও করেনি, তাকে খুন করলে কেন?'

'ক্ষতি করেনি, তবে ছেড়ে দিলে করত,' বলল কেয়া। 'আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে দরকার হলে আরও খুন করব আমরা। টার্গেট আমাদের একটাই, আবিদকে শেষ করা, এতে কেউ যদি বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তার ওপর আমাদের কোন রকম দয়া-মায়া থাকবে না।' একটু থেমে আবার বলল সে, 'নঈমকে আমরা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কিন্তু তুমি যদি আমাদের টাকা মেরে দেবার প্ল্যান না করতে, ওকে আমরা খুন করতাম না। শেষ পর্যন্ত ওকে আমরা ছেড়েই দিতাম। কিন্তু কাজটা তুমি যাতে করতে বাধ্য হও সেজন্যে তাকে মারতেই হলো।'

হঠাৎ একটা সন্দেহ জাগল রানার মনে। কেয়া ধাপ্পা দিচ্ছে না তো? নঈম মারা গেছে, ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না ও। কোন অপরাধ করেনি লোকটা, তবু আরেকজনকে বাগে আনার জন্যে কেউ তাকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে পারে? আচ্ছা, নঈমকে ওরা কোথাও লুকিয়ে রাখেনি তো? নঈম যদি সত্যি খুন না হয়ে থাকে?

শান্ত, মৃদু সুরে বলল কেয়া, 'আবিদকে বের করো, ডিউক। তোমার কাছে ক্লু আছে। তার চেহারার বর্ণনা জানো। তোমার কাজে আমরা নাক গলাব না। যেভাবে ভাল মনে করো, এগোও। আমরা শুধু তোমার কাছ থেকে আবিদকে চাই। তিন হপ্তা সময় দেয়া হচ্ছে তোমাকে।'

'তারপর?'

'তিন হপ্তা পেরিয়ে যাবার পরও তুমি যদি আবিদকে ধরতে না পারো, তাহলে

আমরা বুঝব তাকে তুমি খোঁজোইনি। বুঝব, বেঈমানী করেছ তুমি। সব রকম সাবধানতা অবলম্বন করেছি আমরা। মাউজার আর আই.ও.ইউ.-টা এমন একজনের কাছে জমা রাখা হয়েছে, আমাদের তিনজনের কারও কাছ থেকে হপ্তায় একবার খবর না পেলে সে ওগুলো পুলিসের কাছে পাঠিয়ে দেবে,' সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল কেয়া। কালো সিল্কের মত চুল কাঁধ দুটো ঢেকে দিল। মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল সে। সিরিয়াস দেখাল তাকে, কিন্তু শান্ত। চেহারায় উদ্বেগ বা ভীতির কোন চিহ্ন নেই।

'শাহেদ আসেনি কেন,' জানতে চাইল রানা। 'কিংবা আকরাম?'

হাতটা এমন ভাবে ঝাপটা দিল কেয়া যেন এ-ধরনের প্রশ্ন করা সময়ের অপচয় ছাড়া কিছু নয়। বলল, 'নঈমের ব্যাপারটা শাহেদ জানে না। আর আকরাম···ও বড় বদরাগী, একটুতেই মাথায় রক্ত চড়ে যায়। তাছাড়া, নিজের কাজ নিজে করতেই পছন্দ করি আমি।'

'শাহেদ তাহলে জানে না কিছু? খুন-খারাবিকে সাংঘাতিক ভয় তার,তাই না?'

'হতে পারে। কিছু এসে যায় না।' রানার পাশ ঘেঁষে দরজার দিকে এগোল কেয়া। দরজার কাছে পৌঁছে ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার বলল, 'আর কিছু বলার নেই তোমাকে। আমরা, তোমার সাথে যোগাযোগ রাখব। মনে রেখো, তিন হপ্তা সময়। আবিদকে ছোট করে দেখো না। ডেঞ্জারাস লোক সে।'

'নিচে নেমে প্যাসেজের আলো জ্বালি আমি, তারপর বেরিয়ে যেয়ো,' বলল রানা। শরীরটা পাথরের মত শক্ত হয়ে আছে। পাশ কাটিয়ে যাবার সময় ওর নিঃশ্বাসের ভারী আওয়াজ পেল কেয়া।

তরতর করে সিঁড়ির ধাপ টপকে প্যাসেজে নেমে এল রানা। আলো জ্বালল। দরজার ফুটোয় চোখ রেখে বাইরে উঠানটা দেখে নিল। পায়ের আওয়াজে পিছন ফিরল ও। ওর পাশে এসে দাঁড়াল কেয়া। দরজা খুলে অন্ধকার বাইরে ভাল করে তাকাল রানা। সেদিকে তাকিয়ে থেকেই মৃদু কণ্ঠে বলল কেয়া, 'আমাদের কথা আমরা রাখব। আবিদকে খুঁজে বের করো, বাকি পঁচাত্তর হাজার পেয়ে যাবে।'

চেষ্টা করেও রাগটা আর চাপতে পারল না রানা, মুখ থেকে বিস্ফোরণের মত বেরিয়ে এল কথাগুলো, 'যদি মনে করে থাকো ডিউককে মুঠোয় ভরে ফেলেছ, তাহলে মস্ত ভুল করবে তোমরা। আমিও এর শেষ দেখে ছাড়ব। যারা আমাকে ব্ল্যাকমেইল করতে চায় তাদের জন্যে আমি একটা অভিশাপ! খুব শিগগিরই সেটা টের পাবে তোমরা।'

সাথে সাথে বারুদের মত জ্বলে উঠল কেয়া। অনেক আগে থেকেই অনুভব করে এসেছে রানা, মেয়েটার শান্ত, স্বাভাবিক হাব-ভাব আসলে একটা মুখোশ বই কিছু নয়। কিন্তু তার এই বন্য উন্মত্ততা আশা করেনি ও।

রানা থামতেই বিদ্যুৎ খেলে গেল কেয়ার শরীরে। লাফ দিয়ে সরে গেল সে। কনুই ভাঁজ হয়ে হাত দুটো শরীরের সামনে সাপের মত ফণা তুলল। ঘন কালো চুলে ঢাকা পড়ে গেল মুখের বেশির ভাগটা। সরে গিয়ে বালবের ঠিক নিচে দাঁড়িয়েছে সে। আলোটা খাড়া ভাবে নেমে আসায় মুখটা হাড় সর্বস্ব দেখাল। চুলের ভেতর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে।

'আর তুমি টের পাবে, আমাকে যে চিট করতে চায় তার জন্যে আমিও একটা অভিশাপ!' কর্কশ, হিসহিসে গলায় বলল কেয়া। ছুটে এসে ধাঁই করে ভাঁজ করা হাঁটু দিয়ে রানার তলপেটে মারল সে। চোখের পলকে ঘটে গেল ঘটনাটা, সাবধান হবার সময়ই পেল না রানা। 'আবিদকে আমি চাই!' পায়ের পাতার ওপর দাঁড়িয়ে একটা হাত উঁচু করে দিল সে, রানা সরে যাবার আগেই ধরে ফেলল ওর চুলের গোছা। কষে একটা ঝাঁকি দিয়ে বলল, 'তাকে তুমি আমার কাছে নিয়ে আসছ। তোমার মত সন্তাদরের মাস্তানকে আমার চেনা আছে। তোমার মত রংবাজরা শক্তের ভক্ত, নরমের যম। কতটা শক্ত আমি, আস্তে আস্তে টের পাবে। ঠাণ্ডা মাথায় নঈমকে খুন করা হয়েছে, এটা তো কিছুই না! আরও অনেক কিছু অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে।'

মাথাটা ঝাঁকিয়ে চুলের গোছাটাকে কেয়ার মুঠো থেকে ছাড়িয়ে নিল রানা।

'ভাল চাও তো খুঁজে বের করো আবিদকে!' স্থান-কাল-পাত্র সমস্ত ভুলে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল কেয়া। 'তা না হলে তুমি যাতে ফাঁসিতে ঝোলো তার ব্যবস্থা করব আমি।' পিছিয়ে যেতে শুরু করল সে।

হতভম্ব চেহারা নিয়ে কেয়ার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। আর কোন মেয়ের মধ্যে এই রকম রণ-রঙ্গিণী, উন্মাদিনী মূর্তি দেখেনি ও।

'খুঁজে আনো আবিদকে!' বোমার মত বিস্ফোরিত হলো কেয়া। স্যাঁৎ করে পিছিয়ে গেল সে, সাথে সাথে মিশে গেল বাইরের অন্ধকারে। কিছুক্ষণ তার পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল রানা। দ্রুত মিলিয়ে গেল দূরে। খোলা দরজার সামনে আরও কিছুক্ষণ বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকল রানা। একটু পর একটা বেবী ট্যাক্সির আওয়াজ পেল ও। স্টার্ট নিয়ে চলে গেল সেটা।

কোমরে বেল্ট পরল রানা। চোখ দুটো ঠাণ্ডা, মুখের চেহারা থমথমে। সবচেয়ে আগে জানতে হবে ওকে, নঈম মারা গেছে কিনা। নঈম যদি খুন হয়ে থাকে তাহলে কেয়াকে ছোট করে দেখা চলে না। তখন বুঝতে হবে, ওকে মিছে হুমকি দেয়নি সে। আবিদকে খুঁজে পেতে ও যদি ব্যর্থ হয়, পুলিসকে সব জানিয়ে দেবে। প্রথম থেকেই সন্দেহ ছিল ওর মনে, কেয়া মেয়েটা বিপজ্জনক। কিন্তু এখন ও বুঝতে পারছে, কেয়া সুস্থ নয়। বদ্ধ একটা পাগল!

টেবিল থেকে কয়েকটা জিনিস পকেটে ভরে ঘর থেকে বেরিয়ে এল ও। ঘরের আলো জ্বালাই থাকল, কেউ যদি ফ্ল্যাটের ওপর নজর রেখে থাকে, জানুক ভেতরেই আছে ও। নিচে নেমে দরজা খুলে বাইরে তাকাল। অন্ধকারে ভাল দেখা যায় না। বুঝল, ওকেও কেউ দেখতে পাবে না। ভারী একটা মেঘের ভেলা আকাশের অর্ধেক ঘিরে রেখেছে, ঢাকা পড়ে আছে চাঁদ। বোধ হয় বৃষ্টি হবে। বেরিয়ে এসে দরজাটা বন্ধ করল নিঃশব্দে। ধীর পায়ে এগোল খোলা উঠান ধরে।

উঠান থেকে সরু একটা গলিতে বেরিয়ে এল রানা। গলির মুখেই পাওয়া গেল রিকশা।

পনেরো মিনিটের মধ্যে নঈমের ফ্ল্যাটে পৌঁছে গেল রানা। তার আগে ভাল করে দেখে নিয়েছে, কেউ অনুসরণ করে আসেনি ওকে। অনেক রাত হয়েছে,

রাস্তায় লোকজন নেই। গেটের ভেতর একটা টুলে বসে, দেয়ালে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে আছে গার্ড। চারদিক ভাল করে দেখে নিয়ে গেট টপকাল রানা। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে থামল নঈমের ফ্ল্যাটের সামনে। সাথে করে পেন্সিল টর্চ নিয়ে এসেছে, সেটা জ্বেলে তালাটা পরীক্ষা করল ও। হাতে জাদু আছে ওর, যে-কোন তালা খুলতে পারে। এটাকে দেখে কোন সমস্যা বলেই মনে হলো না। এক টুকরো সেলুলয়েড তালার ফুটোয় ঢুকিয়ে কয়েক সেকেন্ড ঘোরাতেই খুলে গেল সেটা। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল ও। ভেতরে অন্ধকার আর ফুলের সুবাস। হল ঘরে ঢুকেই আরও একটা গন্ধ ঢুকল নাকে। গান পাউডার।

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকল ও। কোন আওয়াজ পেল না। ধীর পায়ে সিটিং রুমে ঢুকল। ঘরের চারদিকে পেন্সিল টর্চের আলো ফেলল। কেউ নেই। জানালা দরজার পর্দা ফেলা রয়েছে, এবং জানালার নিচে কার্পেটের খানিকটা অংশ ঝরা পাপড়িতে ঢাকা পড়ে আছে। বিড়ালের মত সাবধানে এগোল কোণের একটা দরজার দিকে। হাতল ঘুরিয়ে কবাট খুলল, আলো ফেলল ভেতরে। টর্চের খুদে আলোয় একটা বিছানা, একটা আর্মচেয়ার, একটা ড্রেসিং টেবিল, একটা ওয়ার্ডরোব দেখা গেল। মেঝের দিকে আলো ফেলল রানা। বিছানার পায়ের কাছে কার্পেটের ওপর পড়ে রয়েছে লোকটা। নঈম।

গুটি গুটি এগিয়ে নঈমের মাথার কাছে থামল রানা। ঝুঁকে ভাল করে তাকাল তার দিকে। খুব কাছ থেকে মাথায় গুলি খেয়েছে নঈম। কপালের ঠিক মাঝখানে মাউজারের বুলেট নিখুঁত একটা ফুটো তৈরি করেছে। সম্ভবত আকরামই গুলি করেছে তাকে। যে-ই করুক, আগে থেকে নঈমকে কিছু বুঝতে দেয়া হয়নি। তার চেহারায় ভয় বা আতঙ্কের কোন ছাপই নেই। শক্ত কাঠ একটা ভঙ্গি এসে গেছে লাশের, সেটা বাদ দিলে মনে হবে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাচ্ছে নঈম।

ঘুরে দাঁড়াল রানা। তাড়াতাড়ি কেটে পড়তে হবে। জীবনে অনেক মৃত্যু দেখেছে ও, কিন্তু নঈমের মৃত্যু মস্ত একটা ধাক্কা দিল ওকে। কিছুই করেনি, অথচ খুন হয়ে গেল! নিজেকেও কম দায়ী বলে মনে হলো না। নঈম ওকে বারবার বোঝাতে চেয়েছিল, ওকে মেরে ফেলা হবে। তার কথায় কান দেয়নি ও। ভাবল, কতক্ষণ এভাবে পড়ে থাকবে এখানে লাশটা? তদন্ত শুরু করতে কতটা সময় নেবে পুলিস? গার্ড লোকটা কি সত্যিই মনে করতে পারবে ওর চেহারা? লাশটা যত দেরি করে আবিষ্কার হয় ততই ভাল। ওর চেহারা সম্পর্কে গার্ডের স্মৃতি ঝাপসা হয়ে আসার একটা সম্ভাবনা থাকবে। আরেকটা ব্যাপার···আজ আবার এখানে আসা উচিত হয়নি তার। কেউ যদি দেখে ফেলে···

আচমকা টর্চটা নিভিয়ে দিয়ে স্থির পাথর হয়ে গেল রানা। দম আটকে রেখে কিছু শোনার চেষ্টা করল। মনে হলো খুট্ করে একটা আওয়াজ হয়েছে কোথাও। কেউ কি দরজা খুলল? নাকি কল্পনা করছে ও? অনেক, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল ও। কিন্তু আর কোন আওয়াজ পেল না। তবু খুঁতখুঁতে ভাবটা দূর হলো না। পাশের কামরায় কেউ আছে নাকি? অন্ধকারে টেবিল বা ওয়ার্ডরোবের সাথে ঠোকর খেয়েছে?

একটু একটু করে, নিঃশব্দ পায়ে এগোল রানা। থামল। শুনল। আবার

এগোল। আবার থামল। এগোতে যাবে, এই সময় আবার একটা শব্দ হলো। খুট করে নয়, খস খস করে। কান পেতে না থাকলে শুনতেই পেত না।

গভীর, গাঢ় অন্ধকার। এক ইঞ্চি দূরের জিনিসও দেখতে পেল না ও। দরজাটা সামনেই, আন্দাজ করে হাত দুটো বাড়িয়ে দিল। কিন্তু কিছুর সাথে ঠেকল না আঙুল। কিছুক্ষণ অন্ধকার হাতড়াল, তারপর বিদ্যুৎ চমকের মত আবিষ্কার করল, ভেতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিল ও, কিন্তু এখন সেটা খোলা হা হা করছে।

এখন আর কোন সন্দেহ নেই যে পাশের কামরায় কেউ আছে। এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে সামনে বাড়ল ও, হাতের টর্চটা রেডি, মনে করলেই বোতাম টিপে আলো জ্বালতে পারবে। শরীরটা শক্ত কাঠ হয়ে আছে। কোন আওয়াজ করছে না ও।

এই সময় অন্ধকার থেকে কে একজন বলল, 'কে, শাহেদ?'

কোত্থেকে যে আওয়াজটা এল, বুঝতে পারল না রানা। অন্ধকার নিশ্ছিদ্র বলেই বোধ হয়, দিক নির্ণয় করতে পারল না ও। মনে হলো, কোন অশরীরী আত্মা ফ্যাঁসফেঁসে গলায় প্রশ্নটা করল। কেমন যেন ভয় ভয় করল রানার। ছমছম করে উঠল গা।

'কে কথা বলে?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইল রানা। প্রশ্নটা করেই ভাঁজ করা হাঁটু কার্পেটে গেড়ে নিচু করে ফেলল শরীরটাকে—ঠিক সচেতন ভাবে নয়, আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তিই কাজটা করাল ওকে দিয়ে।

চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল আলো। বিস্ফোরণের কান ফাটানো আওয়াজ। কেঁপে উঠল দরজা-জানালা। বুলেটটা রানার গালের চামড়া ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল, তাতেই পিছন দিকে প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেল ও। গরম লোহা দিয়ে কেউ যেন ছ্যাঁকা দিয়েছে মুখে। মেঝেতে পড়ে যাবার আগে গান ফ্ল্যাশের আলোয় নিমেষের জন্যে মূর্তিটাকে দেখতে পেয়েছে ও। মেঝেতে পড়ে আরও একটা বুলেটের ধাক্কা খাবার আশঙ্কা করছে, এই সময় দড়াম করে দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ পেল। সিঁড়ি থেকে দ্রুত, কিন্তু হালকা পায়ের শব্দ ভেসে এল। ছুটে পালিয়ে গেল মূর্তিটা।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল রানা। হাতটা উঠে গেল মুখে। আঙুলের ফাঁক গলে বেরিয়ে এল উষ্ণ রক্ত। গলাটা ফ্যাঁসফেঁসে। অন্ধকারেও তার লক্ষ্য ব্যর্থ হয়নি। বুঝতে অসুবিধা হলো না, খানিক আগে ওকে লক্ষ্য করে গুলি করেছে আর কেউ নয়—স্বয়ং আবিদুর রহমান।

ছয়

চেহারার কোন বর্ণনা নেই, কিন্তু শামিমা আখতারকে দেখেই চিনল রানা। গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির শো-রুমে তিনটে কাউন্টার, তিনজন মহিলা কাজ করছে, তাদের মধ্যে দু'জনের শামিমা হবার কোন সম্ভাবনাই নেই। এরা শুধু বয়স্কা নয়, আকার-আকৃতিতেও বেঢপ, আবিদুর রহমানের গার্লফ্রেন্ড হবার মত নয়।

দু'পাঁচজন খদ্দের আছে দোকানে, তারা নিজেরাই জামা-কাপড় বাছাই করছে, বয়স্কাদের কাছ থেকে কোন রকম সাহায্য পাচ্ছে না। তারা কাউন্টারের ওদিকের টুলে বসে বেশির ভাগ সময় ঝিমুচ্ছে, মাঝে মধ্যে দয়া করে চোখ মেলে তাকালেও দৃষ্টিতে উৎসাহ বা উদ্যমের বড় অভাব। জীবন এদের কাছে নিরানন্দ, বেঁচে থাকা কষ্টভোগ। কিন্তু শামিমা আখতারের মধ্যে ঝিমুনি বা ক্লান্তির চিহ্ন মাত্র নেই। সদ্য ব্যাংক থেকে ছাড়া কড়কড়ে একশো টাকার নোটের মত তরতাজা স্মার্ট সে, ছাগল-ছানার মত প্রাণ-চাঞ্চল্যে ভরপুর। পুরুষ খদ্দেররা সবাই তারই সামনে ভিড় করে আছে।

দেখতে যে খুব সুন্দর শামিমা, তা নয়। কিন্তু নিজেকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্যে চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখেনি সে। ভুরু চেঁছে ফেলে দিয়েছে, তার জায়গায় পেন্সিল দিয়ে এঁকে নিয়েছে সরু, ধনুকের মত রেখা। কাজল দিয়ে সাজিয়েছে চোখ। নাকের পাশে কৃত্রিম তিল। মুখে রুজের হালকা ছোঁয়া। ঠোঁটে মুখের রঙের সাথে মেলানো লিপস্টিক। ইদানীং নাকফুল পরার খুব চল্ হয়েছে ঢাকায়, শামিমাও নতুন ফ্যাশনটাকে অনাদর করেনি। বলাই বাহুল্য, কেটে-ছেঁটে ববড করে নিয়েছে চুল, কাঁধের ওপর থোকা থোকা ফুলের মত শোভা বাড়াচ্ছে। গলাটা সরু, কিন্তু বুকের ছাতির গঠনটা ভারী। হাত-কাটা, ভি-কাট ব্লাউজ; একটু সামনে ঝুঁকলে দুই পাহাড়ের মাঝে অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায় গিরিখাদ। ব্লাউজের কাপড়টা খুবই পাতলা, ব্রা-র সেলাই পর্যন্ত স্পষ্ট পড়া যায়। খুব স্বাভাবিক ভাবেই শিফন শাড়ির আঁচল বার বার বুক থেকে পিছলে যাচ্ছে।

কাউন্টারের সামনে থেকে খদ্দেররা বিদায় না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা। ক্যাশ বাক্স বন্ধ করে মাথা ঝাঁকিয়ে, হাত তুলে চুল ঠিক করল শামিমা, তারপর সরাসরি তাকাল রানার দিকে। শো-রুমের ভেতর ঢুকে, দরজার পাশের দেয়ালে কাঁধ ঠেকিয়ে এই সুযোগের অপেক্ষাতেই দাঁড়িয়ে ছিল রানা। রানার দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গি, সুদর্শন সপ্রতিভ চেহারা লক্ষ করে তাজা ফুলের মত এক রাশ হাসি ফুটে উঠল শামিমার মুখে। এগিয়ে এসে কাউন্টারের সামনে দাঁড়াল রানা।

'বলুন, আপনার জন্যে কি করতে পারি?' গৎ, কিন্তু মৃদু মাথা ঝাঁকিয়ে বলার ভঙ্গিতে সেক্স-সেক্স ভাবটা দারুণ ফুটল।

আন্দাজ করল রানা ত্রিশ থেকে বত্রিশের মধ্যে বয়স হবে মেয়েটার। কাছ থেকে দেখে জানা গেল, এ-মেয়ের চোখ মুখ কথা বলে, এর স্মৃতির ঝুড়িতে বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা ঠাসা।

শাড়ি দিয়ে ঢাকা হলেও শামিমার নাভি দেখা যায়, রানার মুগ্ধ, প্রশংসামাখা দৃষ্টি মুখ থেকে নামতে নামতে সেখানে গিয়ে ঠেকল, তারপর আবার উঠে এল মুখে। দেখল, মাত্র তিন সেকেন্ডেই শামিমার হাসিটা আরও উজ্জ্বল, আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। প্রশংসা যদি মৌনও হয়, মেয়েরা সেটা ঠিকই বোঝে।

ভুবন ভোলানো হাসি হাসল রানা। বলল, 'এটা তো রিটেল সেলের কাউন্টার, তাই না? আমার ডজন দুয়েক শার্ট দরকার।'

শামিমার হাসিটা ম্লান হলো না, কিন্তু চোখের দৃষ্টি অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠল।

রানার সুন্দর ছাঁটের স্যুট, সোনার চেন লাগানো ওমেগা রিস্টওয়াচ থেকে শুরু করে বিদেশে তৈরি জুতা, কিছুই তার দৃষ্টি এড়াল না।

'আপনার নিজের জন্যে?'

'না। বন্ধুকে প্রেজেন্ট করব।'

'সাইজ?'

'আমার চেয়ে দুই সাইজ ছোট।'

মিষ্টি মধুর একটু হাসল শামিমা। 'স্বাভাবিক।'

'কেন, তা আপনার মনে হলো কেন?' রানার চোখে অবাক ভাব।

সবজান্তা হাসি হাসল শামিমা। তারপর বলল, 'অ্যাভারেজ নরমালের চেয়ে আপনার মাপ দুই সাইজ বড় হবে, সেটা আমি আগেই আন্দাজ করেছি। কালার, কোয়ালিটি, কি কি ধরনের কাপড়—মানে, ডিটেলস বলুন।' একটা প্যাড আর পেন্সিল টেনে নিল শামিমা। দু'জন খদ্দের এগিয়ে আসছিল, হাত ইশারায় তাদেরকে আরেকটা কাউন্টার দেখিয়ে দিল সে।

ডিটেলস বলতে এক মিনিট সময় নিল রানা। তারপর জানতে চাইল, 'আমার সাইজ আছে তো? গোটা ছয়েক দিন।'

'দুঃখিত,' বলল শামিমা। 'এখানে নেই, ফ্যাক্টরিতে খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে...'

'কাল তাহলে আসব একবার? কখন, বলুন?'

'কষ্ট করে আসবেন আবার? তারচেয়ে টেলিফোন করে জেনে নেবেন।'

'কষ্ট কিসের?' ঠোঁটে মৃদু হাসি নিয়ে শামিমার চোখ থেকে নাভি, নাভি থেকে আবার চোখে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে এল রানা। 'তাজা ফুলের সান্নিধ্যে আসতে ভালই লাগবে।'

কিছুটা অপ্রস্তুত ভাব নিয়ে রানার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল শামিমা। 'তাজা ফুল...?' চারদিকে তাকাল সে। 'আপনার কথা ঠিক ধরতে পারলাম না!'

'তাহলে আরও সহজ করে বলি,' এক মুখ হাসি নিয়ে বলল রানা। 'আপনার কাছে আসতে কষ্ট নয়, ভাল লাগবে আমার।'

'ওমা! আপনি তো সাংঘাতিক! কবিতা-টবিতা লেখেন নাকি?'

হাত-জোড় করে ক্ষমা-প্রার্থনার ভঙ্গি করল রানা। 'ওসবের ধারে কাছেও নেই আমি। ব্যবসা করি, তাও লোহা-লক্কড়ের। ডুবে যাওয়া জাহাজ কিনি, সেগুলো ভেঙে মন দরে লোহা বেচি।'

'তাহলে তো আপনি লক্ষপতি মানুষ,' উৎসাহের সাথে মন্তব্য করল শামিমা।

লক্ষ করল রানা, হঠাৎ চকচকে হয়ে উঠেছে মেয়েটার চোখ, ওর গালের কাটা দাগটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। টোপ গেলানো খুব একটা কঠিন হবে না, আন্দাজ করল ও। বলল, 'আপনি আবার কিছু মনে করলেন না তো? প্রায়ই বিদেশে যেতে হয়, তাই বিদেশী আদব-কায়দাগুলো অনেকটা রপ্ত হয়ে গেছে। সুন্দরী মেয়ের সাথে পরিচয় হলে তাকে কথাটা বলা বিদেশে কোন অন্যায় নয়। ওখানে তো পথে ঘাটে মেয়েদের সাথে ছেলেদের বন্ধুত্ব হয়ে যায়। মাত্র পরিচয়, অথচ লাঞ্চ বা ডিনার খেতে যেতে মেয়েরা আপত্তি করে না। আমাদের এখানেও এসব শুরু হবে,

তবে হয়তো আরও কিছু সময়ের দরকার। কিন্তু আমার এখনকার সমস্যা হলো…' ইতস্তত একটা ভাব নিয়ে চুপ করে থাকল রানা। লক্ষ করল, অপর দুই কাউন্টারের বয়স্কা মহিলা দু'জন ওদের দিকে পিছন ফিরে বসেছে।

'হ্যাঁ, বলুন, থেমে গেলেন কেন?'

'না, থাক!' হেসে ফেলে বলল রানা। 'আপনার হাতে চড়-চাপড় খাবার কোন ইচ্ছে আমার নেই।'

'ছি, ছি—সেকি! এসব আপনি কি বলছেন! আপনি আমার খদ্দের, আর খদ্দের হলো লক্ষ্মী—আপনাকে আমি অপমান করতে পারি? বলুন কি আপনার সমস্যা?'

পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করল রানা। 'কত?'

প্যাডের কাগজটায় দ্রুত চোখ বুলিয়ে টাকার একটা অঙ্ক বলল শামিমা। তারপর অভিযোগ আর অভিমানের সুরে জানাল, 'আপনি আমার মনে কৌতূহল জাগিয়ে দিলেন, অথচ সেটা মেটালেন না।'

পাওনা মিটিয়ে দিল রানা। 'সত্যি জানতে চান সমস্যাটা কি?'

'প্লীজ।' মিষ্টি আবেদনের সুরে বলল শামিমা।

'আপনি সুন্দর, কিন্তু সেটা বলা উচিত হবে কি? কিছুক্ষণের জন্যে হলেও আপনার সঙ্গ পেতে চাই, কিন্তু সেটা চাওয়া উচিত হবে কি?'

ম্লান, তারপর গম্ভীর হয়ে উঠল শামিমার চেহারা। অভিনয় করছে, পরিষ্কার বুঝল রানা।

বলল, 'আমি কিন্তু বলতে চাইনি, আপনিই জোর করে বলিয়েছেন। ঠিক আছে, ভুলে যান—মাফ করে দিন। এরকম ভুল আর কখনও হবে না। শার্টগুলো দিন, তাড়াতাড়ি কেটে পড়ি।'

ফিক করে হেসে ফেলল শামিমা, ঠিক যেমনটি আশা করেছিল রানা। বলল, 'না, আমি কিছু মনে করিনি। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক, তাই না? আপনাকে আমি চিনি না…'

'ঠিক। আমি চোর হতে পারি, বাটপার হতে পারি·

'না—না, প্লীজ, মাইন্ড করবেন না!' আবার হেসে উঠল শামিমা।

'আসলে…'

'বুঝেছি!' চেহারায় হতাশার ভাব এনে বলল রানা। 'আসলে আমাকে সঙ্গ দেয়া আপনার পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ আপনার স্বামী…'

'না!' দ্রুত মাথা ঝাঁকাল শামিমা। প্রায় আতঙ্কিত দেখাল তাকে। 'বিয়েই হয়নি আমার…'

'ও। তাহলে নিশ্চয়ই বয়-ফ্রেন্ড আছে?'

'না, তাও নয়। তেমন কেউ নেই।'

'তাহলে?'

অপ্রতিভ একটা ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল শামিমা। তারপর ধীরে ধীরে জানতে চাইল, 'সঙ্গ চান মানে কি?'

'আমি সায়েম চৌধুরী,' প্রথম যে নামটা মনে এল আওড়াল রানা। 'আপনি?'

'শামিমা আখতার।'

'আজ সন্ধেয় আপনার সময় হলে আমরা ভাল কোন রেস্তোরাঁয় ডিনার খেতে পারি। তার আগে ইচ্ছে করলে আমরা বেলী রোডে গিয়ে কোন নাটক দেখতে পারি। মন যদি চায়, এবং যদি মূড থাকে, আরও খানিকটা সময় কোন বারে বসে কাটানো যেতে পারে। ড্রিংকের অভ্যেস না থাকলে আপনি বাধা দেবেন, তাহলে বারে ঢুকব না আমরা।' শামিমা এরই মধ্যে একবার ঢোক গিলেছে। অ্যাডভেঞ্চারের লোভে চকচক করছে চোখ। বলে চলল রানা, 'এক ফাঁকে আমরা হয়তো কিছু শপিঙ করব।'

'শপিঙ?'

'মেয়ে যদি সুন্দরী হয়, সে যদি সঙ্গ দেয়, তাহলে অবশ্যই তাকে ভাল কিছু প্রেজেন্ট করা উচিত।' অসহায় ভঙ্গি করে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'কিন্তু এসব কথা তোমাকে বলে লাভ কি! আমি অচেনা লোক, আমার সাথে কিভাবে বেরুতে পারো তুমি?'

'অচেনা আর রইলেন কোথায়!' কৃত্রিম রাগের সাথে বলল শামিমা। 'বাপরে-রে-বাপ! কি চালাক লোক আপনি! ঠিক গলিয়ে ফেলেছেন আমাকে!'

'হোয়াট,' চাপা গলায় বলল রানা। 'তার মানে...?'

'স্যাভয় বারে, রাত আটটায়—হলো তো? খুশি এখন?'

'মাইগড! কি ভাগ্য আমার!' বারের নাম জানে, ভাবল রানা, তারমানে বোধ হয় আসা-যাওয়া আছে। 'ঠিক আছে, সাতটায় তাহলে আমরা মহিলা সমিতিতে মীট করি?'

শার্টের প্যাকেট বেবী ট্যাক্সিতে তুলে নিজের ফ্ল্যাটে ফিরছে রানা। এত তাড়াতাড়ি, এত সহজে রাজি করাতে পারবে শামিমাকে, ভাবতে পারেনি ও। ভাগ্যই বটে! পরমুহূর্তে ভাবনা জাগল মনে—কিন্তু কার মত ভাগ্য? মনসুরের মত নয় তো? তার মত ওরও লাশ পাওয়া যাবে না তো রামপুরার সেই একই পুকুরে?

কে জানে, মনসুরও হয়তো কথার জাদু দিয়ে পটিয়েছিল শামিমাকে। শামিমা হয়তো ওর সাথে যেমন অভিনয় করল, মনসুরের সাথেও সেই রকমই অভিনয় করেছিল। তাই যদি হয়ে থাকে, শামিমাকে নিয়ে বাইরে বেরুলেও কোন লাভ হবে না ওর।

কিন্তু ঠেকে শিখতে পছন্দ করে রানা। রামপুরার পুকুরে ওর শেষ গতি হবে না, এটুকু অন্তত নিশ্চিত ভাবে জানে ও।

'সুইট ডার্লিং,' কচি খুকীর মত আদুরে সুরে বলল শামিমা, 'কত্তো ভাল তুমি! প্লীজ, আমার বাড়িতে তোমাকে যেতেই হবে! আজকের এই আনন্দ আমি এখুনি শেষ হতে দিতে চাই না!'

'আমিও। তা এত করে যখন বলছ, চলো। কোথায় থাকো তুমি?' শামিমা টলে উঠল দেখে দ্রুত তার একটা হাত ধরে ফেলল ও।

স্যাভয় বার থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সির জন্যে রাস্তার ধারে দাঁড়াল ওরা। রাত হয়েছে, প্রায় এগারোটা। স্ট্যান্ডে বেবী বা ট্যাক্সি কিছুই নেই।

রানার গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়াল শামিমা। নিজেও বুঝতে পারছে, হেলান না

দিলে পড়ে যেতে পারে সে। 'রামপুরায় থাকি, কিন্তু রিকশায় যাব না। একটা ট্যাক্সি বা বেবী পেলে···আচ্ছা, সায়েম, আমি কি খুব বেশি খেয়েছি?' কনুই দিয়ে রানার পাঁজরে মৃদু একটা খোঁচা দিল, মিষ্টি গুঞ্জনের মত শোনাল হাসিটা। 'ফর গডস সেক, মিছে কথা বললে ইঁদুর কামড়াবে তোমাকে, আমি কি মাতাল হয়ে গেছি?'

'একটু,' গম্ভীর সুরে বলল রানা। মনে মনে বলল, একটু নয়, পুরোপুরি মাতাল হওয়ার কথা তোমার। একের পর এক কত যে ককটেল টেনেছ, তার হিসেব নেই। পুরো একটা শ্যাম্পেনের বোতল, তারপর তিনটে ডবল ব্র্যান্ডি। 'আমার নিজের অবস্থাও বিশেষ সুবিধের নয়।'

রানার কাঁধে মাথা রাখল শামিমা। 'ভাগ্যিস বেরিয়েছিলাম তোমার সাথে! তা না হলে তুমি যে এত ভাল, জানাই হত না!' রানার হাতে চাপ দিল সে। 'তোমার মত মানুষ খুব কম দেখেছি, ডার্লিং, একেই বলে দরাজ দিল। ফুর্তিই যখন করবে, হিসেব কিসের? কিপটে লোক আমি দু'চোখে দেখতে পারি না। এত নীচ হয় ওরা!'

নির্জন রাস্তা। দূরের বাঁকে একজোড়া হেডলাইট দেখা গেল। বোধ হয় ট্যাক্সি। হাত তুলে নাড়ল রানা। ওয়ান-ওয়ে রাস্তা, এদিকের রাস্তায় আসতে চাইলে অনেকটা ঘুরে আসতে হবে ড্রাইভারকে। আজ সন্ধের পর থেকে যা যা ঘটেছে, সব স্মরণ করল রানা।

রানার জন্যে আজ বিশেষভাবে সেজে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে শামিমা। ঠিক সাতটায় বেলী রোডে দেখা হয় ওদের। নাটক দেখেছে ঘণ্টাখানেক। তারপর ট্যাক্সি নিয়ে একটা রেস্তোরাঁয় চলে এসেছে, ডিনার সেরে সেখান থেকে একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের কসমেটিক কাউন্টার হয়ে পৌঁচেছে রাত আটটায় স্যাভয় বারে। যা আন্দাজ করেছিল রানা, তাই—বারের ম্যানেজার থেকে শুরু করে বয়-বেয়ারা সবাই চেনে শামিমাকে। নিয়মিত আসা যাওয়া থাকলে যা হয়। বসে যারা পানাহার করছিল তারাও অনেকে শামিমাকে চেনে। 'কেমন আছ?' 'ভাল তো?' এধরনের প্রশ্ন চারদিক থেকে আসতে শুনেছে রানা। কিন্তু কাউকেই প্রশ্রয় দেয়নি শামিমা। ভদ্রতা রক্ষার জন্যে যতটুকু না করলে নয় তার বেশি এগোয়নি সে। রানাকে খুশি করাই ছিল তার একমাত্র লক্ষ্য। আজ স্যাভয় বারে সবচেয়ে ভাল পোশাক পরা, সবচেয়ে সেক্সি মেয়ে বলতে ওই একজনই—শামিমা। রানার ভাগ্য দেখে রীতিমত ঈর্ষা হচ্ছিল পুরুষগুলোর। কিন্তু রানার মনের অবস্থা জানতে পারলে তাজ্জব হয়ে যেত ওরা। রাজ্যের বিরক্তি কাহিল, ক্লান্ত করে তুলেছিল ওকে। শামিমার আনন্দ-উচ্ছ্বাসের সাথে লোক-দেখানো তাল মেলাতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠছিল ও। সারাক্ষণ বক বক করেছে শামিমা, ওকে শুধু হাসিমুখে হুঁ-হ্যাঁ করে সায় দিতে হয়েছে, তাতেই দম ফুরিয়ে যাবার দশা।

শাস্তি এখানেই শেষ নয়। এখন আবার ওর সাথে ওর বাড়িতে যেতে হবে। সেখানে পৌঁছে কৌশলে আবিদ সম্পর্কে কথা আদায় করতে হবে। হয়তো সমস্তই বৃথা, আবিদ সম্পর্কে হয়তো মুখই খুলবে না শামিমা। তবু, চেষ্টা করে দেখতে হবে। এই মুহূর্তে এতই বিরক্তিবোধ করছে ও, তথ্য না পেলেও কিছু যেন যায় আসে না। এখন শুধু একটাই প্রার্থনা ওর, মেয়েটা যেন ওকে নিয়ে শুতে না চায়।

'বাড়িতে চলো, ওখানে আরও মজা হবে,' রানার মনের কথা যেন ধরতে পেরেই বলল শামিমা। 'অযথা টাকা খরচ হয়ে গেল, সেটা তোমার মনেই হবে না। কি, খুশি লাগছে, ডার্লিং?'

'ভীষণ,' বেসুরো গলায় বলল রানা।

পাশে এসে দাঁড়াল ট্যাক্সি। হাত বাড়িয়ে পিছনের দরজা খুলে সেদিকে একটু ঠেলে দিল রানা শামিমাকে। 'ওঠো।'

ট্যাক্সিতে উঠে সীটের পিছনে গা এলিয়ে দিল শামিমা। তার কাছ থেকে জেনে নিয়ে রামপুরার একটা ঠিকানা বলল রানা ড্রাইভারকে।

'ট্যাক্সি চড়তে ভাল লাগে আমার,' একটা ঝাঁকি খেয়ে ছুটতে শুরু করল ট্যাক্সি, রানার গায়ের ওপর ঢলে পড়ে বিড় বিড় করে বলল শামিমা। 'তোমার একটা হাত আমার কাঁধের ওপর দিয়ে এপাশে আনো, ডার্লিং। তোমার ছোঁয়ায় কেমন যেন দারুণ উত্তেজনা আছে।'

শক্ত হয়ে গেল রানার শরীর। কিন্তু সাথে সাথে নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিল, ওর মন জয় করতে হবে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও শামিমার কথা মত তার কাঁধের ওপর দিয়ে একটা হাত নিয়ে গিয়ে ঝুলিয়ে রাখল ওপাশে।

'ডার্লিং,' ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল শামিমা। 'সুইট ডার্লিং।' চোখ বুজল। 'ধরে থাকো আমাকে। হ্যাঁ, এই তো আমার ঘুম পাচ্ছে।'

'তাহলে ঘুমাও। পালাব না আমি।'

'না-না!' সীটের ওপর হঠাৎ ঘুরে বসে রানার বুকে বুক ঠেকাল, দু'হাতে গলা জড়িয়ে ধরে টেনে আনল নিজের ঠোঁটের কাছে। দু'জোড়া ঠোঁট পরস্পরের সাথে সেঁটে যেতেই পাগল হয়ে রানার বুকে বুক ঘষতে শুরু করল শামিমা। টিপে পিষে ফেলতে চাইল ওকে।

চোখ বুজে, দম আটকে অত্যাচারটা সহ্য করল রানা। মেয়েটা আবার সীটের ওপর ঢলে পড়তেই বাঁচল হাঁফ ছেড়ে। বাঁ হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ঠোঁট মুছল।

কয়েকমুহূর্ত পর পরম স্বস্তির সাথে আবিষ্কার করল রানা, ওর কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে শামিমা। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে মনসুরের কথা ভাবল ও। সে-ও কি শামিমাকে ট্যাক্সি করে রামপুরায় নিয়ে গিয়েছিল? শামিমা কি তাকেও সুইট ডার্লিং বলে ডেকেছিল আদুরে গলায়? টেনে কাছে এনে ঠোঁটে চুমু খেয়েছিল?

মনসুর বোধ হয় শামিমার বাড়ি থেকে বেরুবার পর খুন হয়। একটা হাত দিয়ে শোল্ডার হোলস্টারে গোঁজা পয়েন্ট থ্রী-এইট অটোমেটিকটা অনুভব করল রানা। কত বড় ওস্তাদ তুমি, আমিও দেখে নেব, আবিদ! আমাকে মনসুর বা জাফর মনে করলে ভুল করবে তুমি।

রামপুরার শেষ সীমানায় এসে মেঠো একটা চওড়া পথে পড়ল ট্যাক্সি। এ দিকটা না শহর না গ্রাম। বাড়িগুলো দূরে দূরে, রাস্তায় আলো খুব কম। গাড়ি ঝাঁকি খেতে শুরু করায় ঘুম ভেঙে গেল শামিমার। চোখ পিট পিট করে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সে।

'পাশের গলিতে, ড্রাইভার। দুটো বাড়ির পর, ডান দিকে।' ড্রাইভার বাঁক নিয়ে ট্যাক্সি দাঁড় করাল, এবার রানাকে উদ্দেশ্য করে নিচু গলায় বলল শামিমা,

'শেষ ব্র্যান্ডিটা আমার জন্যে বেশি হয়ে গেছে, বুঝলে, ডার্লিং।' জলতরঙ্গের মত হাসল একটু। 'কিন্তু মাতাল হয়ে গেছি তা কিন্তু না!'

ট্যাক্সি থেকে নামতে শামিমাকে সাহায্য করল রানা। ড্রাইভারের পাওনা মিটিয়ে দেবার সময় রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করল চাঁদের আলো পড়া বিশাল একটা আয়নার ওপর। মস্ত একটা পুকুর ওটা। শামিমার বাড়ি থেকে খুব বেশি হলে শ'দুয়েক গজ দূরে। সারি সারি নারকেল গাছ ঘিরে রেখেছে পুকুরটাকে। মন্ত্রমুগ্ধের মত সেদিকে তাকিয়ে থাকল ও। মনের ভেতর মাথা কুটতে শুরু করল একটা প্রশ্ন—এই পুকুরেই কি মনসুরের লাশ পাওয়া গিয়েছিল? শামিমাকে জিজ্ঞেস করার প্রচণ্ড একটা ইচ্ছে জাগল।

'চলো,' ট্যাক্সি বাঁক নিয়ে চলে যেতে শুরু করেছে, রানার একটা হাত ধরে মৃদু ঝাঁকি দিল শামিমা, 'ভেতরে চলো। আরেকটু খেতে পারব আমি। আপত্তি কোরো না, প্লীজ। কিচ্ছু হবে না আমার, তুমি দেখো!'

তারমানে বাড়িতেও আয়োজন আছে! কোন মন্তব্য না করে শামিমার পিছু পিছু গেটের সামনে এসে দাঁড়াল রানা। চাবি বের করে গেটের তালা খুলল শামিমা। ছোট্ট একটা উঠান পেরিয়ে বারান্দা, তারপর ঘরের দরজা। সেটাও খুলল। চাবির গোছাটা বার দুই হাত ফস্কে পড়ে গেল, দু'বারই কুড়িয়ে দিতে হলো রানাকে।

'এখানে তুমি একা থাকো?' শামিমার পিছু পিছু অন্ধকার একটা হল ঘরে ঢুকল রানা।

'হ্যাঁ, একা,' বলে হেসে উঠল শামিমা। 'কেন, তোমার অবাক লাগছে?'

'একা একটা মেয়ে··· বিপদ হতে পারে না?'

'আসলে মাঝখানে দেয়াল তুলে দিয়ে ওপাশে ভাড়া বসিয়েছি,' বলল শামিমা। 'চিৎকার করলেই শুনতে পাবে ওরা।' বোতাম টিপে একটা শেড পরানো টেবিল ল্যাম্প জ্বালাল সে। 'এসো, আমার আর তর সইছে না।'

শামিমাকে অনসুরণ করে আরেকটা ঘরে ঢুকল রানা। প্রথম দর্শনেই ঘরটাকে প্রেমকুঞ্জ বলে মনে হলো। বড় একটা ডিভান রাজত্ব করছে এখানে। দরজার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে মেহগনি কাঠের মস্ত আলমিরা। সোজা সেটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল শামিমা। কবাট খুলে ভেতর থেকে কেরু অ্যান্ড কোম্পানির একটা আধ-খালি ইমপেরিয়াল হুইস্কির বোতল বের করল। দুটো গ্লাসও নিল। মেঝেতে কার্পেট আছে, কিন্তু পুরানো, প্রায় বাতিল হয়ে গেছে। আলোটা আসছে সিলিঙের আড়াল থেকে। টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল শামিমা। একটু একটু টলছে।

'মনে কোরো না বাড়ির আর সব ঘরও এভাবে সাজানো।'

গ্লাসে হুইস্কি ঢালল শামিমা। 'এটা আমার স্পেশাল কামরা।'

'কি রকম?'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল শামিমা। চোখ-মুখ হাসছে। 'এর আমি নাম দিয়েছি অপারেটিং থিয়েটার।' বলেই খিলখিল করে হেসে ফেলল সে। আলমিরার পাশেই রেফ্রিজারেটর, সেটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ভেতর থেকে বরফ বের করে ফিরে এল টেবিলের সামনে। 'আমাকে তুমি খারাপ মেয়ে ভাবছ। ভাব! আমি তো নষ্টাই!'

'আরে, এসব কি আবোল তাবোল…'

'ভুলে যাও!' এগিয়ে এসে রানার হাতে একটা গ্লাস ধরিয়ে দিল শামিমা। 'তুমি ওই ডিভানে আরাম করে বসো, আমি ওপর থেকে কাপড় বদলে আসি।'

শামিমা চলে যেতেও বসল না রানা। কামরায় এমন কিছু নেই যা ওকে কৌতূহলী করে তুলতে পারে। একটু পরই একটা উৎকট সমস্যা দেখা দেবে, সেটা উদ্বিগ্ন করে তুলল ওকে। নিচে নেমেই ওকে নিয়ে ওই ডিভানে শুতে চাইবে শামিমা। পায়চারি শুরু করল ও। বিরক্তিতে কুঁচকে আছে ভুরু।

দোতলা থেকে শামিমার হাঁটা চলার আওয়াজ আসছে। খোলা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল রানা। হল ঘরের ওদিকে আরেকটা দরজা। সেটা পেরিয়ে মাঝারি একটা ঘরে ঢুকল। মেঝেতে কার্পেট নেই, ধুলো জমে আছে। ফার্নিচার বলতে প্রায় কিছুই নেই। একটা ছাড়া বাড়ির সব ঘরই বোধ হয় এই রকম খালি আর নোংরা।

নিচে এসে ডিভানে বসে থাকতে দেখল ওকে শামিমা। শাড়ি বদলে আরেকটা শিফন পরে এসেছে সে। টকটকে লাল। বিপদ সঙ্কেত! কথাটা মনে হতেই হাসি পেল রানার।

ধপ্ করে ডিভানে, রানার পাশে বসে পড়ল শামিমা। 'বিশ্বাসই হয় না মাত্র আজই তোমার সাথে পরিচয় হয়েছে। তুমি যেন আমার কত দিনের চেনা। অ্যাই, চৌধুরী, এমন আনাড়ীর মত করছ কেন? বার বার আমিই বুঝি ঠোঁট বাড়াব?' বলেই খিল খিল করে হেসে উঠল সে।

হুইস্কির গ্লাসে মৃদু চুমুক দিল রানা। 'খাবে না?' টেবিলে রাখা শামিমার গ্লাসের দিকে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল ও।

'যদি কষ্ট করে নিয়ে এসে দাও।'

নিয়ে এল রানা। গ্লাসটা নিয়ে তিন চুমুকেই সবটুকু নিঃশেষ করে ফেলল শামিমা। তার হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে টেবিলের কাছে চলে এল রানা। হুইস্কি ভরল, তারপর আবার ধরিয়ে দিল শামিমার হাতে।

'উঁহু, আর না!' রানার গায়ের ওপর ঢলে পড়ল শামিমা। গ্লাসটা নিয়ে ডিভানের নিচে রেখে দিল রানা।

'আচ্ছা,' হঠাৎ জানতে চাইল রানা, 'নিজের বাড়ি, এমন সাজানো ঘর, এসব দেখে মনে হয় তোমার টাকার কোন অভাব নেই, তাহলে সেলসগার্লের চাকরি করো কেন?'

'যা দেখছ এটা খোলস, ভেতরে ফাঁপা,' বলল শামিমা। 'চাকরি করি বেঁচে থাকার জন্যে।'

'তোমার শাড়ি, কসমেটিকস, ড্রিংক—চাকরির বেতনে এত সব হয়?'

'কি করে! কিন্তু সব ব্যাপারে নাক গলিয়ো না তো! তবে, আমি নির্ঝঞ্ঝাট, স্বাধীন থাকতে পছন্দ করি।' রানার কাঁধে হাত রেখে ওকে নিজের দিকে টানল শামিমা। 'কাছে এসো। একেবারে গায়ের কাছে।'

রানা ঠিক করল, আর সময় নষ্ট করবে না। আবিদ সম্পর্কে জানতে এসেছে ও। এখনই চেষ্টা করবে জানার।

'এই নাও, তুমি একটা সিগারেট ধরালে খুব মানাবে।' প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে শামিমার দিকে বাড়িয়ে দিল ও। মাথা নেড়ে আপত্তি জানাতে যাচ্ছিল শামিমা, তারপর অচ্ছিসত্ত্বেও নিল সেটা। পকেট থেকে বিদেশী দিয়াশলাই বের করল রানা। শামিমার মুখের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে বুড়ো আঙুলের নখে ঘষে একটা কাঠি জ্বালল। কায়দাটা শামিমার পরিচিত, ওকে ক্ষীণ একটু চমকে উঠতে দেখে বুঝতে পারল রানা। ঝট করে মুখ তুলেছে শামিমা।

'মজার ব্যাপার, তাই না?' শামিমার সিগারেট ধরিয়ে দেবার ফাঁকে বলল রানা। 'মুক্তিযুদ্ধের সময় লাহোরে ছিলাম, ওখানে একজন বাঙালী যুবকের সাথে পরিচয় হয় আমার, কায়দাটা সেই আমাকে শিখিয়েছিল।'

'ও।' মৃদু কণ্ঠে বলল শামিমা। রানার কাঁধ থেকে হাতটা ধীরে ধীরে নামিয়ে নিল সে।

'এক কথা থেকে হাজার কথা মনে পড়ে যায়,' সিগারেটের আগুনে চোখ রেখে বলল রানা। 'যার কথা বলছিলাম, পাকিস্তান এয়ারফোর্সে পাইলট ছিল সে। লাহোর এয়ারবেস থেকে পালিয়ে আসার পর তার সাথে পরিচয় হয় আমার।'

'যুদ্ধের কথা তুলো না,' তাড়াতাড়ি বলল শামিমা। 'তারচেয়ে নিজেদের কথা বলি এসো।'

'ছেলেটা খুব সুন্দর ছিল দেখতে,' বলে চলল রানা, শামিমার কথা যেন শুনতেই পায়নি। 'প্রায়ই তার কথা মনে পড়ে। ভাবি, কোথায় আছে জানলে হত। তার গলায় বুলেট লেগেছিল, কথা বলত ফ্যাসফ্যাসে স্বরে। একবার মস্ত একটা উপকার করেছিল আমার। বলতে পারো, আমি তার কাছে ঋণী। তাকে যদি পেতাম তাহলে ঋণটা শোধ করা যেত।'

চোখ বন্ধ করল শামিমা। মেক-আপের নিচে রক্ত শূন্য, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তার চেহারা। রানা বুঝল, ধরা না দেবার জন্যে নিজের সাথে প্রাণপণ লড়াই করছে মেয়েটা।

'সবচেয়ে মজার কথাটা কি জানো?' বলে চলল রানা। 'আমাকে একবার বলেছিল, সে নাকি একটা মেয়েকে ভালবাসে। সাজানো একটা ঘর আছে, সেই ঘরে মেয়েটার সাথে দেখা হয়। মনে পড়ে, মেহগনি কাঠের আলমিরা, রেফ্রিজারেটর আর ডিভানের কথা বলেছিল সে।' একটু থামল রানা। লক্ষ করল, শক্ত কাঠ হয়ে উঠছে শামিমার শরীর। তারপর জানতে চাইল, 'তুমি চেনো না কি তাকে? তার নাম আবিদুর রহমান।'

সাত

গাড়ির শব্দ। কাছেই কোথাও থামল সেটা। প্রথমে একটা পুরুষ কণ্ঠের আওয়াজ তারপর একটা মেয়েলি গলার হাসি। দরজা বন্ধ হবার শব্দ। খক্ খক্ করে কেশে উঠল এঞ্জিন। চলে গেল গাড়িটা। নিস্তব্ধতা জাঁকিয়ে বসল আবার।

নিস্তব্ধতা ভাঙল শামিমা। ফিসফিস করে বলল সে, 'ও, তুমিও তাহলে ওদের একজন!' শিরদাঁড়া খাড়া করে ডিভানের ওপর বসে আছে সে। হাত দিয়ে চেপে ধরে আছে ডিভানের কিনারা, সাদা হয়ে গেছে নখগুলো। 'আমি একটা বোকা! আগেই সন্দেহ করা উচিত ছিল।' হঠাৎ প্রায় লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। রানার দিকে ঝুঁকে ঘন ঘন হাঁপাল কয়েক সেকেন্ড। চিৎকার করে বলল, 'এসবের মধ্যে নেই আমি! আমাকে জড়াতে পারবে না!'

'এখনও বাকি আছ জড়াতে?' কঠিন একটু হাসি দেখা গেল রানার ঠোঁটে। 'মনসুরকে খুন করল কে?'

হাতটা স্যাঁৎ করে মুখে উঠে গেল, আঙুলের গিঁট কামড়ে ধরে প্রায় বেরিয়ে-আসা চিৎকারটাকে থামাল শামিমা। 'শুনতে চাই না! কিচ্ছু শুনতে চাই না! তুমি যাও! আবিদ আমার কেউ নয়। আমি কিছু জানি না!'

'জানি না বললে চলবে কেন?' শামিমা পিছিয়ে যাচ্ছে দেখে খপ্ করে তার একটা হাত ধরে ফেলল রানা। 'তোমার কাছেই তো এসেছিল মনসুর।'

হাতটা ছাড়াবার জন্যে ধস্তাধস্তি শুরু করল শামিমা, পারল না দেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলল। 'ছাড়ো, ছেড়ে দাও আমাকে! কে বলল মনসুর খুন হয়েছে? ওটা আত্মহত্যা। কাগজে তাই লিখেছে, দেখোনি? এর আমি কিছুই জানি না!'

শামিমার হাতটা ঝাঁকি দিল রানা। 'মনসুর আত্মহত্যা করেনি। তার জন্যে এখানে অপেক্ষা করছিল আবিদ, সে-ই তাকে খুন করেছে। তোমার তো সবই জানার কথা।'

আবার নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করল শামিমা। 'বাজে কথা, এখানে ছিল না আবিদ। হপ্তা কয়েকের মধ্যে একবারও আসেনি সে। বোকা লোকটা নিজেই মরেছে।'

শামিমার হাত ছেড়ে দিল রানা। 'আবিদ যে খুন করেছে, তার প্রমাণ আছে আমার হাতে। তাকে আমার দরকার। বলছ কিছু জানো না, তাই যদি হয় তাহলে বলো কোথায় পাব তাকে?'

'মনসুরও জানতে চেয়েছিল, তার পরিণতি কি হয়েছে দেখো!' দুই হাতের তালু পরস্পরের সাথে চেপে চেপে ঘষতে শুরু করল শামিমা। 'আবিদ খুন করেছে জানলে কিভাবে?'

'কোথায় সে?' কঠিন সুরে জানতে চাইল রানা।

ঘন ঘন হাঁপাতে লাগল শামিমা। দম নিয়ে বলল, 'জানি না!' দিশেহারা দেখাল তাকে। 'জানলেও বলতাম না! তুমি যাও! আমাকে এর সাথে জড়িয়ো না!'

'মুখ না খুলে তোমার উপায় নেই,' বলল রানা। 'হয় আমার কাছে, নয়তো পুলিসের কাছে।'

পুলিসের কথা শুনে নেতিয়ে পড়ল শামিমা। ভাঁজ হয়ে গেল হাঁটু, রানার সামনে পায়ের পাতার ওপর বসে পড়ল। 'খোদার দোহাই লাগে, আমাকে এসবের সাথে জড়িয়ো না! আমি এর কিছুই জানি না!' রানার একটা কব্জি চেপে ধরল সে। মাংসের ভেতর ডেবে গেল নখ। অপর হাতটা দিয়ে নিজের কপাল চাপড়াল। 'খোদা, আমার কপালে এই ছিল! কি কুক্ষণেই ভালবেসেছিলাম ওকে! ভেবেছিলাম

আমাকে বিয়ে করবে…' রানার কব্জি ছেড়ে দিয়ে দু'হাতে মুখ ঢাকল সে। 'আশায় বুক বেঁধে বছরের পর বছর ওর জন্যে আমি অপেক্ষা করেছি। আমার সব, স-ব দিয়েছি ওকে। কিন্তু বিয়ের কথা মুখেও আনেনি ও।' বাঁধ ভাঙা জোয়ারের মত শব্দগুলো বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে। 'আমাকে একবার জিজ্ঞেসও করল না, বাড়িটা কিনে এই ঘরটাকে সাজাল। বলল, এখন থেকে এখানেই তুমি থাকবে। ভালবাসতাম, তাই প্রত্যাখ্যান বা অপমান করতে পারিনি। আসলে আমাকে ওর দরকার ছিল শুধু দেহের ক্ষুধা মেটাবার জন্যে। ভাল ও আমাকে কোন দিনই বাসেনি। ছয় ছয়টা বছর আমাকে চিবিয়ে খেয়েছে ও। এইভাবেই চলবে, যতদিন না ওর একঘেয়ে লাগে। ভুলেও কখনও একটা পয়সা দেয় না আমাকে। কিছু বন্ধু আছে আমার, তা না হলে না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হত…'

হাত নেড়ে বিরক্তি প্রকাশ করল রানা। 'তোমার এতসব প্যাচাল আমি শুনতে চাই না। আবিদকে চাই আমার, বলো কোথায় তাকে পাওয়া যাবে?'

ছিটকে সরে গেল শামিমা। 'মনসুরও তাই জানতে চেয়েছিল। তুমিই বলছ, সে নাকি খুন হয়েছে। তুমি চাও তোমাকেও আমি মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিই?' বিদ্যুৎগতিতে হাত তুলে জানালা দিয়ে বাইরে দেখল সে। 'ওখানে পাওয়া গেছে তার লাশ—একটা পুকুরে। উঁকি দিয়ে সব দেখেছি আমি। পুলিস এল, অ্যাম্বুলেন্স এল, স্ট্রেচার নামানো হলো। লাশ তুলে চাদর দিয়ে ঢেকে গাড়িতে তোলা হলো। চেহারা দেখলাম না, কিন্তু বুঝলাম কার লাশ। ধারণা করলাম, লোকটা আত্মহত্যা করেছে। ঝামেলা হবে মনে করে দুশ্চিন্তায় আধ-মরা হয়ে গিয়েছিলাম।' গলার আওয়াজ আরও চড়াল সে। 'আবিদকে ঘাঁটিয়ো না। সে একটা অভিশাপ। নিজের ভাল চাইলে তার নাম মুখেও এনো না।'

'এত কথা শুনতে চাই না,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল রানা। 'তার ঠিকানা, জানা থাকলে বলো।'

'তোমরা একটা গ্যাং তার পেছনে লেগেছ, তাই না?' এগিয়ে এসে রানার একটা কব্জি চেপে ধরল শামিমা। 'তোমাদের দলে একটা মেয়েও আছে, আমি জানি। একজন আছে নীল শার্ট পরে।'

'কিভাবে জানলে?'

'পুকুরটা দেখার জন্যে এসেছিল ওরা,' বলল শামিমা। 'জানালা দিয়ে দেখেছি আমি। তুমিও ওদের একজন, তাই না? আবিদ…' খানিক ইতস্তত করার পর জানতে চাইল সে, 'কি করেছে সে?'

'বলো কোথায় তাকে পাওয়া যাবে?'

কিন্তু সুবিধে করতে পারল না রানা। প্রশ্নের কোন উত্তর দেয় না শামিমা, শুধু আবোল তাবোল, আজেবাজে বকে।

'শো-রুমে তোমাকে দেখে ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারিনি তুমি ওদেরই একজন। নরম নরম কথা বললে, চালাকি করে বুঝিয়ে দিলে তোমার অনেক টাকা আছে—গলে গেল মনটা। আমার জীবনটা কি রকম নোংরা, সে আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না। আবিদ আর কিছু দিক বা না দিক, কঠিন একটা ব্যারাম অবশ্যই দিয়েছে আমাকে। যাকে বলে গরীবের ঘোড়া রোগ। ভাল কাপড় না হলে

পরতে পারি না, দামী রেস্তোরাঁর খাবার ছাড়া মুখে রোচে না, বিদেশী সেন্ট ছাড়া বাইরে বেরুতে পারি না, মদ না খেলে রাতে ঘুমাতে পারি না। কিন্তু এসবের জন্যে বিস্তর টাকা লাগে।' একটু থেমে উদভ্রান্তের মত ঘরের চারদিকে তাকাল সে, তারপর রানার চোখে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে এসে বলল, 'কিন্তু আবিদের সাথে পরিচয় হবার আগে আমি এই রকম ছিলাম না।' হাতের ভেতর রানার আঙুলগুলো নাড়াচাড়া করতে শুরু করল সে, গা ঘিন ঘিন করে উঠল রানার। 'বললে বিশ্বাস করবে না, তোমার মত মাস কয়েকের মধ্যে একজনও জোটেনি কপালে। বেশির ভাগই বুড়ো-হাবড়া...'

হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে ডিভান থেকে উঠে পড়ল রানা, টেবিলের দিকে এগোল। বোতল থেকে নিজের গ্লাসে খানিকটা হুইস্কি ঢালল ও। মাত্র একটা চুমুক দিয়ে গ্লাসটা রেখে দিল, গম্ভীর মুখে পায়চারি শুরু করল।

এখনও সেই পায়ের পাতার ওপর বসে আছে শামিমা, কিন্তু চেহারায় একটু আগের ম্রিয়মান, দুঃস্থ ভাবটা নেই। চোখ কুঁচকে রানাকে লক্ষ করছে সে।

হঠাৎ সন্দেহ হলো রানার, স্রেফ টাকা আদায় করার জন্যে অভিনয় করছে না তো শামিমা? কথাটা আরও আগে কেন মনে হয়নি ভেবে নিজের ওপর রেগে উঠল ও। পায়চারি থামিয়ে বলল, 'আবিদ কোথায় আছে বললে আমি তোমাকে পাঁচশো টাকা দেব।' বলে পকেট থেকে মানি ব্যাগটা বের করল।

'জানলে তো!' রানার হাতের দিকে চোখ রেখে বলল শামিমা। মানি ব্যাগ থেকে পাঁচশো টাকার একটা নোট বের করে তার দিকে বাড়িয়ে ধরল রানা। 'ওর সম্পর্কে খুব কমই জানি আমি। মাঝে মধ্যে ফোন করে। কোথায় থাকে বলতে পারব না।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। ধৈর্য হারিয়ে ফেলছে ও। মেয়েটা ওকে অসুস্থ করে তুলছে। টাকাটার দিকে এমন লোভ চকচকে চোখে তাকিয়ে আছে, গা ঘিন ঘিন করে উঠল ওর। 'বেশ। না জানলে আর কি করা!' নোটটা মানি ব্যাগে ভরে রাখতে গেল ও। কিন্তু হঠাৎ উঠে দাঁড়াল শামিমা, দ্রুত এগিয়ে এল রানার দিকে।

'টাকা আমার দরকার নেই, এমন ভান আমি করব না,' রানার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে ধীরে ধীরে বলল শামিমা। 'আসলে কাল থেকে আমাকে না খেয়ে থাকতে হবে, ঘরে কিছুই কেনা নেই, হাতও একদম খালি...'

বাধা দিয়ে বলল রানা, 'এমনি দেব না, রোজগার করে নিতে হবে। আবিদ তোমাকে চিঠি লিখেছিল কখনও?'

খানিক ইতস্তত করে বলল শামিমা, 'হ্যাঁ। পরিচয় হবার পর প্রথম দিকে। তারপর আর লেখেনি।'

'চিঠিতে কোন ঠিকানা ছিল না?'

'না।'

'পোস্টমার্ক কি ছিল?'

চিন্তা করল শামিমা। তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'মনে নেই।'

'নিশ্চয়ই মনে আছে। কোন চিঠিতে প্রেরকের ঠিকানা না থাকলে সবাই পোস্টমার্ক লক্ষ করে। তুমিও লক্ষ করেছ। তোমার জন্যে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ

ইনফরমেশন, ভুলে যেতে পারো না। বলো, পোস্টমার্ক কি ছিল?'

নিচু গলায় বলল শামিমা, 'খুলনা।'

'কেন গিয়েছিল ওখানে, ছুটিতে?'

'জানি না।'

'টাকাটা পেতে হলে আরও ভাল জবাব দিতে হবে,' শর্ত দিল রানা।

'সত্যি দেবে কিনা বুঝব কিভাবে?' পাঁচশো টাকার নোটের দিকে চোখ রেখে একটা ঢোক গিলল শামিমা।

মানি ব্যাগ থেকে একশো টাকার দুটো নোট বের করে ছুঁড়ে দিল রানা। কাঙালের ব্যস্ততা নিয়ে সাথে সাথে কুড়িয়ে নিল শামিমা।

'আমার প্রশ্নের উত্তর দিলে বাকিটা পাবে,' বলল রানা।

নোট দুটো দলা পাকিয়ে মুঠোর ভেতর লুকিয়ে ফেলল শামিমা। মুখের চেহারা করুণ করে তুলে বলল, 'হাত একেবারে খালি, তা নাহলে নিতাম না...'

'অজুহাত দেখাবার দরকার নেই,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'আবিদ কখনও বলেছিল, খুলনায় থাকি?'

আবার ইতস্তত করতে দেখা গেল শামিমাকে, তারপর অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল, 'ওদিকেই বোধ হয় কোথাও থাকে ও। একবার শুধু বলেছিল একটা চর না কি ছোট দ্বীপ আছে ওদের, সেখানে নাকি একটা বাড়িও আছে।'

'কতদিন আগের কথা?'

'পরিচয়ের প্রথম দিকে। ধরো, দশ-এগারো বছর আগে। কে জানে, হয়তো মিথ্যে কথা বলেছিল আমাকে। ওই একবারই, আর কখনও প্রসঙ্গটা তোলেনি।'

যাক, ভাবল রানা, তবু একটা তথ্য পাওয়া গেল। খুলনার কাছে পিঠে একটা চর বা দ্বীপ। খুঁজে বের করতে খুব বোধ হয় বেগ পেতে হবে না।

জানতে চাইল, 'জায়গাটা ঠিক কোথায় সে-সম্পর্কে তোমার কোন ধারণা নেই?'

'না।'

কিছু চিন্তা করল রানা, তারপর জানতে চাইল, 'তোমার কাছে এখানে প্রায়ই আসত সে?'

'মন চাইলে আসত,' মুখের চেহারা কঠিন করে তুলে বলল শামিমা। 'কখনও হপ্তায় দু'বার, আবার কখনও দু'মাসে একবার।'

'তুমি বলছ শেষবার তার সাথে তোমার দেখা হয়েছে হপ্তা কয়েক আগে?'

'হ্যাঁ।'

'তারিখটা মনে নেই?'

মাথা নাড়ল শামিমা। 'ছয় কি সাত হপ্তা আগে। ঠিক মনে নেই।'

মাথার চুলে আঙুল চালাল রানা। আসলে কিছুই জানা যাচ্ছে না, উপলব্ধি করতে পারল। রাগ হচ্ছে নিজেরই ওপর। জিজ্ঞেস করল, 'বন্ধু-বান্ধবের গল্প করেনি তোমার কাছে? কারও নাম বলেনি?'

'উঁহু। নিজের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কখনও কিছু বলেনি সে।'

চোখে সন্দেহ নিয়ে শামিমার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। পাঁচশো টাকার

বিনিময়ে যথেষ্ট তথ্য পাচ্ছে না ও। শামিমা যা বলছে তাও সত্যি কিনা সন্দেহ। আবিদের একটা চর বা দ্বীপ আছে শুধু এই কথাটা জানার জন্যে পুরো একটা সন্ধে আর হাজার খানেক টাকা খরচ করা যায় না।

'আর কোন তথ্য দিতে পারো না তুমি? তার কোন আত্মীয়-স্বজন নেই?'

'একটা বোনের কথা শুনেছিলাম।'

নতুন একটা তথ্য! মনে মনে উৎসাহ বোধ করল রানা। 'কে বলেছিল? কার কাছ থেকে শুনেছ?'

পলকের জন্যে ইতস্তত করে বলল শামিমা, 'আবিদের খোঁজ চেয়ে একটা মেয়ে ফোন করেছিল আমাকে।'

রানার মনে হলো, মিথ্যে কথা বলছে শামিমা। 'কি? এখানে ফোন করেছিল? বোনেরা কি ভাইয়ের রক্ষিতাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করে…?'

'আমি রক্ষিতা?' সাপের মত ফোঁস করে উঠল শামিমা।

'তুমি কি, সেটা পরে চিন্তা-ভাবনা করে ঠিক করে নিয়ো,' বলল রানা। 'আমরা আবিদের বোনের কথা আলোচনা করছি। কবে ফোন করেছিল?'

'সে অনেক দিন আগের কথা। আবিদের সাথে তখন ঝগড়া চলছে আমার।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা, তারপর জানতে চাইল, 'যোগাযোগের জন্যে কোন ঠিকানা বা ফোন নাম্বার দিয়েছিল সে?'

'হ্যাঁ, ভুলে গিয়েছিলাম। দিয়েছিল।'

'ঠিকানা, নাকি ফোন নাম্বার।'

'নাম্বার।'

'মনে আছে?'

বুঝতে পেরেছে শামিমা, ওটা নিয়ে দর কষাকষি চলতে পারে। 'বলছিলাম কি,…' চেহারাটা করুণ করে তুলে শুরু করল সে, '…পাঁচশো টাকায় কিছুই হবে না আমার। বাজারে অনেক দেনা হয়ে আছে। তুমি আমাকে আর কিছু টাকা দিতে পারো না? আমার দুর্দশার কথা তুমি যদি জানতে…'

'নাম্বারটা বলো,' আবার জিজ্ঞেস করল রানা।

শামিমার চেহারা গম্ভীর, কঠিন হয়ে উঠল। 'মনে নেই।'

'ঠিক আছে,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল রানা। 'ওই দুশো টাকা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকো তাহলে।' টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেট তুলে নিয়ে পকেটে ভরল ও। 'বিরক্ত লাগছে আমার। দেখি অন্য কোথাও থেকে কিছু জানা যায় কিনা।'

'তুমি আর সবার থেকে কিছু আলাদা নও। হাত থেকে টাকা গলে না!' মুখ ভারী করে বলল শামিমা। 'ঠিক আছে, আটশো দিলে নাম্বারটা বলব আমি।'

'ছশো।'

'প্লীজ…'

'ছশো।'

রানার কঠিন মুখের দিকে নির্বাক তাকিয়ে থাকল শামিমা। বুঝতে চেষ্টা করল, সত্যি আরও কিছু আদায় করা যাবে কিনা। রানা দরজার দিকে পা বাড়াল দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠল সে। 'ঠিক আছে। একটু দাঁড়াও। একটা নোটবুকে টোকা আছে

নাম্বারটা, দেখি খুঁজে পাই কি না।'

কামরা থেকে বেরিয়ে গেছে শামিমা এক মিনিটও হয়নি, এই সময় তার আর্তনাদ শুনতে পেল রানা। নিস্তব্ধ বাড়িটা সেই আতঙ্কিত চিৎকারে কেঁপে উঠল। গায়ের রোম খাড়া হয়ে গেল রানার। সংবিৎ ফিরে পেয়ে দরজার কাছে পৌঁছুতে কয়েক সেকেন্ড দেরি করে ফেলল ও। দরজা খোলা শেষ করতে পারেনি তখনও, ধপাস করে ভারী কিছু পতনের আওয়াজ হলো। পাথর হয়ে গেল রানা, দরজার নবটা ধরে দাঁড়িয়ে থাকল। বুকের ভেতর ধড়াস ধড়াস করছে হৃৎপিণ্ড। পরমুহূর্তে প্রচণ্ড এক ঝাঁকি দিয়ে দরজার কবাট খুলে ফেলল ও।

সিঁড়ির নিচে পড়ে আছে শামিমা। একটা পা ছাড়া শরীরটাকে একটা স্তূপের মত দেখাল। মাথাটা বিদঘুটে ভঙ্গিতে বেঁকে আছে পিছন দিকে। লম্বা, নগ্ন একটা পা ধাপের ওপর উঠে গেছে, অভিযোগের ভঙ্গিতে অন্ধকার সিঁড়ির মাথার দিকটা নির্দেশ করছে পায়ের আঙুলগুলো।

আট

ঝম ঝম বৃষ্টি মাথায় করে ফ্ল্যাটের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে রানা। একটা হাত পকেটের ভেতর ভরে চাবি খুঁজছে। উঠানের ওপর দিয়ে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে এল রেনকোট পরা একটা মূর্তি। রাবার সোলের জুতো পায়ে। কোন আওয়াজ পায়নি রানা। বোধ হয় ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ই সতর্ক করে দিল ওকে। ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও, অপর হাতটা জামার ভেতর স্যাঁৎ করে ঢুকে গেল। পিস্তলটা প্রায় বেরিয়ে এসেছে, এই সময় আঁতকে উঠল মূর্তি, তাড়াতাড়ি বলল, 'আ-আমি, আমি শাহেদ!'

'আ-আমি, আমি শাহেদ!' শাহেদের গলা অনুকরণ করে ভেঙচাল রানা। সাংঘাতিক রেগে গেছে ও। 'চোরের মত কি করছ এখানে?'

'সে-সেই সন্ধে থেকে তো-তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি আমি,' কাছে এসে তোতলাতে শুরু করল শাহেদ। গলাটা কাঁপা কাঁপা। কি যেন একটা উত্তেজনায় ছটফট করছে সে। 'তো-তোমার সাথে জরুরী আ-আলাপ আছে আমার।'

'কি সৌভাগ্য আমার, শুনে একেবারে কৃতার্থ হয়ে গেলাম!' দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল রানা, একপাশে সরে পথ করে দিয়ে বলল, 'এসো।'

সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল ওরা। সিটিং রুমে ঢুকল। 'কি এমন জরুরী আলাপ শুনি?' ভিজে শার্ট খুলতে শুরু করে জানতে চাইল রানা।

উজ্জ্বল আলোয় দেখা গেল, শাহেদের মুখ ঝুলে পড়েছে। ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে তাকে। ভিজে রেনকোট থেকে কার্পেটের ওপর পানি পড়ছে। 'ওরা ন-নঈমকে খু-খুন করেছে!'

চোখে ফাঁকা দৃষ্টি নিয়ে শাহেদের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। ওর মনে হলো, নঈম মারা যাবার পর এত কিছু ঘটেছে যে ওই বাসি খবরটার আর কোন গুরুত্ব

নেই। 'এতক্ষণে জানলে তুমি?'

'তু-তুমি জানো তাহলে!' অবাক সুরে জানতে চাইল শাহেদ। 'কিন্তু কাগজে তো খবরটা নেই।'

'রেনকোটটা খুলে এক কোণে রাখো,' ঝাঁঝের সাথে বলল রানা। 'আমার কার্পেটের বারোটা বাজাচ্ছ তুমি!' শাহেদ রেনকোটের বোতাম খুলতে শুরু করল। 'না,' আগের চেয়ে শান্ত গলায় বলল রানা, 'কাগজে বেরোয়নি খবরটা। কাল রাতে এখানে এসে কেয়া আমাকে বলে গেছে। আমি যদি আবিদকে খুঁজে বের না করে দিই, আই.ও.ইউ.আর মাউজারটা পুলিসের কাছে পাঠিয়ে দেবে। মাউজারে আমার হাতের ছাপ আছে, আর আই.ও.ইউ. দেখে মোটিভটা কি বুঝতে পারবে পুলিস। কেয়া বুঝি বিশ্বাস করে না তোমাকে? তা না হলে এসব কথা তোমাকে বলেনি কেন?'

দুর্বল, অসুস্থ দেখাল শাহেদকে। রেনকোট খুলে ঘরের এক কোণে ছুঁড়ে দিল সে। ফিসফিস করে বলল, 'এটা···এটা একটা খু-খুন!'

'তাতে কি?' বলল রানা। 'কি হয়েছে তোমার বলো তো? আবিদকে মেরে ফেলার প্ল্যান করেছ তোমরা, সেটা খুন নয়? দুটোর মধ্যে ফারাক কোথায়?'

হঠাৎ ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল শাহেদ, যেন পা দুটো শরীরটাকে আর ধরে রাখতে পারছে না। 'কিন্তু নঈম তো কোন অন্যায় করেনি! এটা কি করল কেয়া? ওরা, ওরা দু'জনেই পাগল হয়ে গেছে!' দু'হাতে মুখ ঢাকল সে। 'ইস্, ওদের সাথে ভিড়ে কি বোকামিই না করেছি!'

'মানে?' ভুরু কুঁচকে উঠল রানার। 'হঠাৎ সাধু হয়ে উঠলে যে বড়? শেষবার যখন তোমার সাথে আমার দেখা হলো, আবিদকে খুন করার ব্যাপারে তোমার উৎসাহের মধ্যে কোনরকম কমতি লক্ষ করিনি তো!'

'আসল কথা, আবিদকে ওরা ধরতে পারবে এ-কথা একবারও আমি বিশ্বাস করিনি,' খানিক ইতস্তত করে নিচু গলায় বলল শাহেদ। 'মানে, ওদের প্ল্যানটাকে মোটেও সিরিয়াসলি নিইনি আমি। আল্লার কিরে, আমার কথা বিশ্বাস করো।' কথার খোঁচা খেয়ে নার্ভাস বোধটা থাকল না আর। হঠাৎ গলা চড়াল সে। 'পুলিসে খবর দেব! খুন-খারাবির মধ্যে আমি নেই!' এদিক ওদিক মাথা নাড়তে শুরু করল সে।

'সাধু সাজার সময় পেরিয়ে গেছে,' বলল রানা। 'পুলিসের কাছে গেলে সবার আগে তোমাকেই ওরা গ্রেফতার করবে। এই ঝামেলা থেকে বেরুবার একমাত্র উপায়, সবাই মিলে আবিদকে খুঁজে বের করা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

'কি আশ্চর্য, ব্যাপারটা বুঝতে পারছ না তুমি?' চেয়ারের হাতলে একটা ঘুসি বসিয়ে দিল শাহেদ। 'পুলিসকে আমি সব কথা খুলে বললে কেয়া আর আকরামের ফাঁদ থেকে বেরিয়ে যেতে পারছ তুমি। ওরা নঈমের খুনের দায় তোমার ঘাড়ে চাপাবে এ আমি হতে দেব না।'

'পুলিস আমাকে বেকায়দায় পাবার জন্যে অনেকদিন ধরে ওত পেতে আছে,' বলল রানা। উত্তেজিতভাবে পায়চারি শুরু করল ছোট কামরার ভেতর। 'তোমার কথা ওরা কানেই তুলবে না। বিশ্বাস করার তো প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া,' তিক্ত

একটু হাসি দেখা গেল ওর ঠোঁটে, 'কাল এই সময়ের মধ্যে আরেকটা খুনের জন্যে আমাকে খুঁজতে শুরু করবে তারা।'

'আরেকটা খুন?' আঁতকে উঠল শাহেদ। 'মানে?'

'আজ রাতে শামিমাকে সাথে নিয়ে ওর বাড়িতে গিয়েছিলাম,' বলল রানা। 'সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে ঘাড় ভেঙে গেছে ওর।'

'তাহলে খুন বলছ কেন?' হতভম্ব দেখাল শাহেদকে।

'খুন নয়? ওকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়া হয়েছে। আসল কথা হলো, ওখানে ছিলাম আমি। ট্যাক্সি ড্রাইভারের কাছ থেকে আমার চেহারার বর্ণনা পাবে পুলিস। হয়তো পেতে দেরি হবে, কিন্তু পাবে। নঈমের ফ্ল্যাট থেকে আমাকে বেরুতে দেখেছে দারোয়ান। সে-ও আমার চেহারার বর্ণনা দেবে। দুই আর দুই যোগ করতে খুব একটা বেগ পেতে হবে না পুলিসকে।'

'কিন্তু শামিমাকে ধাক্কা দিল কে?' সামনের দিকে ঝুঁকে জানতে চাইল শাহেদ। 'তুমি কিভাবে জানলে তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়া হয়েছে?'

'কেন, অনুমান করতে পারছ না? আমার বিশ্বাস, এটাও আবিদের কাজ।'

শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল শাহেদের। 'অসম্ভব! আমি বিশ্বাস করি না।'

'কেন? না বিশ্বাস করার কি আছে? আমার ধারণা, আমরা পৌঁছুবার আগে থেকেই ওখানে অপেক্ষা করছিল আবিদ। শামিমা গোপন তথ্য ফাঁস করে দিচ্ছিল। আবিদের বোনের ফোন নাম্বার নিয়ে আসার জন্যে দোতলায় উঠছিল সে। সিঁড়ির মাথা থেকে তাকে ধাক্কা দেয় আবিদ। এর মধ্যে অসম্ভবের কি আছে?'

'আমার বিশ্বাস হয় না!' বলে চেয়ারে গা এলিয়ে দিল শাহেদ।

'সেটাই তো জানতে চাইছি, কেন বিশ্বাস হয় না? প্রথম যখন দেখা হলো তোমার সাথে, তুমি বললে আবিদ হেন করেছে, তেন করেছে, সে একটা খুনী, ইত্যাদি আরও কত কি। হঠাৎ করে তাকে অন্যরকম মনে করছ, কারণটা কি? আমার আগেই সন্দেহ হয়েছিল তোমার ধাতটাই আলাদা, কেয়া বা আকরামের সাথে কোন মিল নেই। তাহলে ওদের সাথে ভিড়লে কেন?'

'গড়গড় করে বলে যাই, আবোল তাবোল প্রলাপ বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এ-থেকেই আমার কেসটা বুঝে নিতে হবে তোমাকে,' চেয়ারে সিধে হয়ে বসে শুরু করল শাহেদ। 'আসলে তুমি ঠিকই ধরেছ, এদের কাছে কোথাও খাপ খাই না আমি। বলতে পারো, আমার জীবনটা একটা ব্যর্থ জীবন। নিজেরই সন্দেহ হয়, আসলে হয়তো এখনও আমি বড় হইনি। সেই ছোটবেলা থেকে অ্যাডভেঞ্চার গল্প পড়ে আসছি, আজও একটা বই পেলে আমি অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের কথা বেমালুম ভুলে যাই। জেল ভেঙে পালাবার মধ্যে যে ঝুঁকি আছে, সেটা আমার ভাল ঠেকেনি, কিন্তু যে অ্যাডভেঞ্চার আছে সেটুকু উপভোগ করতে চেয়েছিলাম পুরোমাত্রায়। ব্যাংক লুঠ করার ব্যাপারটাও তাই। সবাই যখন বলল, আমিও রাজি হয়ে গেলাম। কিন্তু ধরা পড়ার ঝুঁকি আছে বুঝতে পেরে আমি শুধু কাঁদতে বাকি রেখেছি। তারপর কেয়া বলল, আবিদকে শাস্তি দেবার প্রতিজ্ঞাটা আমরা রাখব। স্রেফ অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ ছিল বলে আইডিয়াটা আমার দারুণ পছন্দ হয়। মনে মনে জানতাম, আবিদের টিকিরও সন্ধান পাবে না কেয়া। সেজন্যেই দলে ভিড়ি

আমি। আবিদকে ধরতে পারবে মনে করলে এসবের মধ্যে নিজেকে কখনোই জড়াতাম না।'একনাগাড়ে এত কথা বলে হাঁপাতে শুরু করল শাহেদ। একটু বিশ্রাম নিয়ে বলল, 'না বাবা, দরকার নেই আর! আমার ভাগের টাকা নিয়ে কেটে পড়ব আমি, ছোটখাট একটা চাকরি খুঁজে নেব। যদিও একটা হাত না থাকায় চাকরি পেতে একটু অসুবিধেই হবে...'

'আবিদকে খুন করতে চাও না তাহলে?'

'বললাম তো, ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি আবিদকে ওরা খুঁজে বের করতে পারবে,' বলল শাহেদ। 'ভেবেছিলাম ঢাকায় এসে একটা চাকরি খুঁজে নেব। কিন্তু এখানে আসার পরপরই মারা গেল মনসুর। তার এই মৃত্যুর সাথে আবিদের সম্পর্ক আছে, আমি তা এখনও বিশ্বাস করতে পারি না। মনসুর এক বিচিত্র টাইপের লোক ছিল। পানি আর যম, দুটোই তার কাছে সমান। আমরা সবাই বলাবলি করতাম, পানিকে যার এত ভয়, পানিতেই তার মরণ লেখা আছে। ঠিক তাই ঘটল। আমার ধারণা পা পিছলে বা ওই ধরনের কোন কারণে পুকুরে পড়ে গিয়েছিল সে, তারপর মারা গেছে আতঙ্কে। না, সাঁতার জানত না। আবিদ তাকে খুন করেছে এখনও আমার তা বিশ্বাস হয় না।'

'কিন্তু জাফরের মৃত্যু?' জানতে চাইল রানা।

'ওটাও একটা দুর্ঘটনা হতে পারে। কেয়া বলছে, আবিদ দায়ী। কিন্তু সে-ই বা জানল কিভাবে? জাফর ট্রেন থেকে পড়ে যেতে পারে না?' হাতের তালু দিয়ে হাঁটু ঘষতে শুরু করল সে, তাকিয়ে আছে কার্পেটের দিকে। 'তারপর কেয়া বলল, আবিদের খোঁজে এবার আমাকে বেরুতে হবে। কিন্তু সেরকম কোন ইচ্ছে আমার ছিল না। সত্যি কথা বলতে কি, আবিদের ওপর বরাবর দুর্বলতা ছিল আমার। ওকে আমি পছন্দ করতাম। আমার দৃষ্টিতে আবিদ ছিল আদর্শ পুরুষ—স্মার্ট, সাহসী, কারও সাতে-পাঁচে নেই, অহঙ্কার-মুক্ত এবং দেশপ্রেমিক। কাপুরুষের মত কিছু করা তার প্রকৃতি বিরুদ্ধ ছিল। অথচ সবাই বলল, বেঈমানী নাকি সে-ই করেছে। আমার ঠিক বিশ্বাস হয়নি। এখনও হয় না। কাজেই কেয়া যখন তাকে খুন করার জন্যে খুঁজে বের করে নিয়ে আসতে বলল, আমি বললাম, পারব না। বললাম, কাজটা আমাদের দ্বারা হবার নয়। বাইরের কারও সাহায্য দরকার আমাদের। অনেক বলে কয়ে শেষ পর্যন্ত কেয়াকে রাজি করাই আমি।' মুখ তুলে রানার দিকে ক্ষমা-প্রার্থনার দৃষ্টিতে তাকাল সে। 'কিন্তু সেজন্যে এখন আমি অনুতপ্ত। তোমাকে এর মধ্যে টেনে নিয়ে আসার জন্যে আমিই দায়ী। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই করতে হবে।'

'দুঃখিত আমিও,' বলল রানা। 'তোমার জন্যে।'

'কেন?'

'নিজেকে বিকট একটা সমস্যার সাথে জড়িয়ে ফেলেছ দেখে।'

'কিন্তু মজার ব্যাপার কি জানো?' রানার দিকে ঝুঁকে পড়ল শাহেদ। 'কেয়া সত্যি সত্যি চায় তুমি আবিদকে খুন করো, এটাও আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারি না। তবে একটা জিনিস বুঝি, কেয়ার মনে দয়া-মায়ার কোন স্থান নেই।' পায়ের ওপর পা তুলল, আবার নামাল, নড়েচড়ে বসল—স্থির হতে পারছে না সে।

'তোমাকে অনুসরণ করার জন্যে ফ্ল্যাট থেকে আমি বেরিয়ে আসার পর আকরাম গুলি করে নঈমকে। ফ্ল্যাটে ফিরছি, মোড়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল সে। বলল, কেয়া ঠিকানা বদল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, নঈমের ফ্ল্যাটে ফিরে যাওয়া নিরাপদ নয়। বুঝলাম সিরিয়াস কিছু একটা ঘটেছে, কিন্তু জিজ্ঞেস করার সাহস পেলাম না। ইসলামপুর রোডের মাথায় একটা হোটেল পাওয়া গেছে, ঠিক হয়েছে আপাতত আমরা সেখানেই উঠব। আকরামের সাথে এলাম হোটেলে। আমাকে দেখেও কিছু বলল না কেয়া। বলল আরও অনেক পরে। কোন ব্যাখ্যা নয়, বর্ণনা নয়, শুধু বলল নঈমকে মেরে ফেলা হয়েছে। আকরামের চোখের দৃষ্টি দেখে পরিষ্কার বুঝলাম, বেচারীকে সে-ই গুলি করেছে।' দম নিয়ে চেয়ারে হেলান দিল শাহেদ। 'ওদেরকে আমার ভয় করতে লাগল। ঠিক করলাম, পালাব। তাই তোমার কাছে এসেছি। তুমি যদি কোন পরামর্শ দিতে পারো...'

একটা হাই চাপল রানা। ভীষণ ক্লান্তি লাগছে ওর। 'আমার পরামর্শ তুমি শুনবে? ঠিক আছে, দেয়া যাবে পরামর্শ। তার আগে, কি করবে বলে ঠিক করেছ, বলো?'

'এখনও কিছু ঠিক করিনি,' বলল শাহেদ। 'ভেবেছিলাম পুলিসের কাছে যাব। কিন্তু তুমি বাধা দিচ্ছ...'

'পুলিসের কাছে গেলে ফেঁসে যাবে তুমিও,' রানার গলার আওয়াজে ধৈর্য হারাবার সুর। 'আমাদের এখন আবিদকে খুঁজে বের করতে হবে। ওর যে একটা বোন আছে তুমি জানো?'

'তাই নাকি? আবিদের বোন আছে?' অবাক দেখাল শাহেদকে। 'চাচী-মা আছে জানতাম, কিন্তু বোনের কথা তো শুনিনি। তুমি ঠিক জানো?'

'শামিমা বলল আমাকে। বেশ কয়েক বছর আগে নাকি তাকে টেলিফোন করেছিল, নিজের নাম্বারটাও দিয়েছিল শামিমাকে। ভাগ্যই বলতে পারো, তার বেডরুমে পুরানো একটা নোটবুক পেয়ে যাই, তাতে নাম্বারটা সত্যিই আছে। গাইড দেখে নাম্বারটা চেক করেছি। মেয়েটার নাম টিনা রহমান। কমলাপুর এলাকায় থাকে। গাইডে একটা স্টুডিওর ঠিকানা লেখা আছে। সকাল হোক, তার সাথে দেখা করতে যাব আমি।' কানের নিচে, চোয়ালের ওপর সেঁটে থাকা অ্যাডহেসিভ প্লাস্টারের উপর আঙুল বুলাল রানা। 'একটা কথা বলা হয়নি তোমাকে, আবিদের একেবারে সামনে পড়ে গিয়েছিলাম আমি।' নঈমের ফ্ল্যাটে কেন গিয়েছিল ও, সেখানে কি ঘটেছে সব শাহেদকে বলল ও।

'তোমাকে আমি বলে মনে করেছিল আবিদ?' হতভম্ব দেখাল শাহেদকে। 'কিন্তু আমাকে সে গুলি করতে পারে না! তার সাথে সব সময় ভাল সম্পর্ক ছিল আমার। আমি যে তাকে পছন্দ করি, সেটা জানত সে! উঁহুঁ, অসম্ভব!'

'খুন করার ইচ্ছে থাকলে দ্বিতীয় বার গুলি করত, ছুটে পালাত না,' বলল রানা।

'উঁহুঁ,' ঘন ঘন মাথা নাড়ল শাহেদ। 'এ আমি বিশ্বাস করি না। তোমাকে আমি বলে মনে করে থাকলে গুলি করত না সে। আবিদের সাথে আমার অন্য রকম সম্পর্ক ছিল।'

'আমি তো বলছি, গুলিটা গায়ে লাগায়নি ইচ্ছে করেই। খুন করবে বলে গুলি করেনি।'

মাথাটা নেড়েই চলেছে শাহেদ। 'এর মধ্যে কিছু একটা রহস্য আছে। তুমি ঠিক জানো লোকটা আবিদ ছিল?'

'যেই হোক সে, তার গলাটা স্বাভাবিক ছিল না,' বলল রানা। 'ফ্যাঁসফেঁসে, নিচু, কর্কশ। তোমার নাম ধরে ডেকেছে। আর কে হতে পারে?'

'তাই তো!' হতভম্ব দেখাল শাহেদকে। 'আর কেই-বা হতে পারে! না, আর কেউ হতে পারে না!'

'ভুলে যাও। ঘুমে চোখ বুজে আসছে আমার, শুতে গেলাম। তুমি?'

'আমি মানে?'

'কি করবে? এখানে থাকবে, নাকি ফিরে যাবে ওদের কাছে?'

সাথে সাথে জবাব দিল শাহেদ। 'ওদের কাছে আমি আর ফিরে যাচ্ছি না। তুমি যদি তাড়িয়ে না দেও, আজ রাতটুকু এখানে কাটাতে চাই। তারপর কাল সকালে ভেবে দেখব...'

'আমার সাথে কথা না বলে চলে যেয়ো না,' বলল রানা। হাত তুলে সোফাটা দেখাল। 'ওখানে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ো। দাঁড়াও, একটা চাদর এনে দিই।'

দু'মিনিট পর বেডরুমে ঢুকে ভেতর থেকে দরজা লাগিয়ে দিল রানা। ঘুমানো তো দূরের কথা, বিছানাতেই উঠল না ও। সিগারেট ধরিয়ে জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকল বাইরে। রাস্তার ওপারে ড্রাগস্টোরের সাইন বোর্ডের মাথায় নগ্ন একটা বাল্‌ব্ জ্বলছে, বৃষ্টির ফোঁটাগুলোকে আলাদা আলাদা ভাবে দেখা যাচ্ছে। একটা প্ল্যান গজিয়ে উঠল ওর মাথায়। সকাল হোক, বুঝিয়ে-শুনিয়ে ওদের কাছে ফেরত পাঠাবে শাহেদকে। শত্রু ঘাঁটিতে একজন বন্ধু থাকলে বিরাট উপকার হবে। নিশ্চিতভাবে জানে না, কিন্তু অনুভব করছে সে, শাহেদকে বিশ্বাস করা যায়। সে হয়তো চেষ্টা করলে আই.ও.ইউ. এবং মাউজারটা হাত করতে পারবে। তা পারলে অর্ধেক বিপদ কেটে যাবে ওর। সকাল হোক, বোঝাতে হবে শাহেদকে।

কাপড় চোপড় খুলে শুয়ে পড়ল রানা। সাথে সাথে ঘুমিয়েও পড়ল, কিন্তু একটা দুঃস্বপ্ন অস্থির করে তুলল ওকে। একই স্বপ্ন বারবার দেখল ও। ওর বিছানার কিনারায় বসে আছে শামিমা, কি যেন বলার চেষ্টা করছে ওকে। কিন্তু যতবারই মুখ খুলতে গেল, অন্ধকার থেকে একটা হাত বেরিয়ে এসে চেপে ধরল তার মুখটা। চিনতে পারল রানা। আবিদের হাত ওটা।

পরদিন সকাল দশটায় কিচেনে ঢুকে রানা দেখল, কফি তৈরি করছে শাহেদ।

'কাগজ দিয়ে গেছে,' রানাকে দেখেই বলল সে। 'নঈমের খবরটা বেরিয়েছে।'

মাথার চুলে আঙুল চালাতে চালাতে হুম করে একটা আওয়াজ করল রানা। 'থামলে কেন? কি লিখেছে?'

'পুলিস কথা বলতে চায়...তুমি বরং নিজেই পড়ে দেখো। কাগজটা সিটিং রুমে পাবে।'

'শামিমার কথা কিছু লিখেছে?'

'না। দারোয়ান তোমার চেহারার হুবহু বর্ণনা দিয়েছে পুলিসকে।'

দেঁতো হাসি দেখা গেল রানার ঠোঁটে। 'বলিনি তোমাকে?'

সিটিং রুমে ঢুকল ও। নঈমের লাশ আবিষ্কারের খবরটা প্রথম পৃষ্ঠায় জায়গা পেয়েছে। দারোয়ান লোকটার সাথে কথা বলেছে রিপোর্টাররা। দারোয়ান জানিয়েছে, শক্ত-সমর্থ, উদ্ধত চেহারার এক যুবককে নঈমের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছে সে, নঈম যখন মারা গেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে তার কাছাকাছি সময়ে। রানার হাঁটার এবং চুল আঁচড়াবার ভঙ্গি, পরনের পোশাক ইত্যাদিরও নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছে সে। পুলিস জানিয়েছে, এই যুবকের সাথে কথা বলতে চায় তারা। সে হয়তো নতুন কোন তথ্য দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করতে পারবে। তাদের ধারণা কেউ সম্ভবত প্রতিশোধ নেবার জন্যে খুন করেছে নঈমকে। ফ্ল্যাট থেকে কিছুই খোয়া যায়নি।

ট্রেতে করে টোস্ট, সেদ্ধ ডিম আর কফি নিয়ে সিটিং রুমে ঢুকল শাহেদ।

'মজা শুরু হবে শামিমাকে পাবার পর,' নিজের কাপে কফি ঢালতে ঢালতে বলল রানা। 'বাঁচতে হলে একটা অ্যালিবাই তৈরি করে নিতে হবে আমাকে।'

'তোমার শার্ট, ট্রাউজার, জুতো সব লুকিয়ে ফেলতে হবে,' বলল শাহেদ। 'ওগুলো যদি এখানে পায় পুলিস...'

'ঠিক। একটু সাহায্য করো আমাকে। সব সুটকেসে ভরে দিচ্ছি, সেটা হোটেল জনপদে রেখে আসবে তুমি। পারবে না? ঠিকানা বললে রিকশাওয়ালা সোজা হোটেলের সামনে নামিয়ে দেবে তোমাকে। ওখানে একটা মেয়ে আছে, রুবি। আমার কথা বললেই হবে, সুটকেসটা রেখে দেবে সে। বলবে, আমি ফেরত না চাওয়া পর্যন্ত সুটকেসটা তার কাছে রাখতে বলে দিয়েছি। কি, পারবে না?'

'কেন পারব না?' উৎসাহের সাথে বলল শাহেদ। 'কিন্তু অ্যালিবাই তৈরি করবে কিভাবে?'

'করে নেব,' বলল রানা। 'এবার তোমার ব্যাপারে কি ভেবেছি শোনো। কাল বললে, এসবের মধ্যে আমাকে টেনে এনেছ বলে তুমি অনুতপ্ত। বেশ, বুঝলাম। কিন্তু তুমি কি এই ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে আমাকে সাহায্য করতে রাজি আছ? এর মধ্যে ঝুঁকি আছে, তাই উত্তর দেবার আগে ভেবে দেখো...'

'অবশ্যই,' রানাকে বাধা দিয়ে বলল শাহেদ। 'অবশ্যই সাহায্য করব আমি। সেই ইচ্ছে নিয়েই তো তোমার কাছে আসা। হয় আমি পুলিসের কাছে যাব, নয়তো তুমি যা বলবে তাই করব।'

'আমি চাই কেয়া আর আকরামের কাছে আবার ফিরে যাও তুমি,' বলল রানা। প্রতিবাদ করে কিছু বলতে যাচ্ছিল শাহেদ, একটা হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল ও। 'ওদের মাথায় শয়তানী বুদ্ধি গিজগিজ করছে, কেউ সাথে না থাকলে জানব কিভাবে কি করতে যাচ্ছে ওরা? ঠিক কি করতে চায় সেটা জানার জন্যে ওদের সাথেই তোমার থাকা দরকার। তাছাড়া, ওদের সাথে থাকলে তুমি হয়তো আই.ও.ইউ. আর মাউজারটা বাগাবার একটা সুযোগ পেয়ে যাবে।'

'আমার কাছ থেকে বড় বেশি আশা করছ তুমি,' চেহারায় অস্বস্তি নিয়ে বলল শাহেদ। 'ওদের সাথে স্পাই হিসেবে থাকতে বলছ আমাকে। যদি ধরা পড়ে যাই?

আমি তেমন চালাক-চতুর নই, অভিনয় জানি না…'

'তোমাকে আমি জোর করছি না,' গম্ভীর সুরে বলল রানা। 'কাজটা করবে কি করবে না সে তোমার ইচ্ছে। কিন্তু পারবে না, এটা তোমার ভুল ধারণা। আর,' একটু থেমে ধীরে ধীরে আবার বলল ও, 'আমাকে সাহায্য করার এটাই একমাত্র উপায়।'

ইতস্তত করতে লাগল শাহেদ। তারপর বলল, 'বেশ, ঠিক আছে। অন্তত চেষ্টা করে দেখব। কিন্তু আমার বড্ড ভয় ভয় করছে, ওরা যদি জানতে পারে…'

'তুমি না বললে জানবে না। ভান করবে, তুমি আমাকে অনুসরণ করতে গিয়ে হারিয়ে ফেলেছ। আজ আমি আবিদের সন্ধানে বেরুচ্ছি। প্রথমে তার বোনের সাথে দেখা করব। তুমি বরং মেয়েটার ফোন নাম্বার টুকে রাখো, আমাকে দরকার হলে ফোন করতে পারবে। দুপুরের দিকে ওখানে থাকব আমি। আর হ্যাঁ, তোমাকে আমি পাব কোথায়?'

'হোটেল পুবালিতে উঠেছি আমরা।'

আবিদের বোন টিনা রহমানের ঠিকানা আর টেলিফোন নাম্বার একটা এনভেলাপের পিছনে লিখে সেটা শাহেদের হাতে ধরিয়ে দিল রানা। 'সুটকেসটা গুছিয়ে দিই, ওটা নিয়ে চলে যাও তুমি। আবিদের বোন সম্পর্কে কেয়া বা আকরামকে একটা কথাও বলবে না, মনে থাকবে তো? এখন থেকে ওদেরকে আমরা কিছুই জানাব না।'

সুটকেস নিয়ে শাহেদ চলে যাবার পর হোটেল জনপদে ফোন করল রানা। 'কে, আলি হোসেন?' গলার আওয়াজটা গম্ভীর করে তুলে বলল ও। 'সেদিন বিকেলের আগে তোমার হোটেল ছেড়ে বেরুইনি আমি। কথাটা রায়হানকেও জানিয়ে দাও। এর জন্যে দু'হাজার পাবে তুমি।'

ঝাড়া দশ সেকেন্ড কোন আওয়াজ করল না আলি হোসেন খান। রানা শুধু তার ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পেল। তারপর চাপা গলায় বলল আলি হোসেন, 'ওরা আপনার চেহারার বর্ণনা পেয়ে গেছে। অ্যালিবাইটা তৈরি করতে চাইছেন ভাল কথা, কিন্তু এর আয়ু খুব বেশি হবে বলে মনে করি না।'

'এই অ্যালিবাইটাকে পরমায়ু দিতে হবে,' বলল রানা। 'কিভাবে কি করবে তুমি, তা আমি জানি না। রায়হানের সাথে যুক্তি করে উপায় বের করো।'

আবার কয়েক সেকেন্ড কোন কথা বলল না আলি হোসেন। ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে। তারপর বলল, 'ঠিক আছে। জিজ্ঞেস করলে আপনি যা শিখিয়ে দিলেন তাই বলব, কিন্তু ব্যাপারটা যদি কেঁচে যায় তখন আবার যেন আমাকে দায়ী করবেন না।'

'তোমাকে দায়িত্ব দিয়েছি, কেঁচে গেলে তোমাকে দায়ী করব না তো কাকে করব?' ধমকের সুরে কথাটা জিজ্ঞেস করেই ফোনের রিসিভার রেখে দিল রানা।

রিসিভার রেখে দিয়ে সেটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল রানা। ভুরু কুঁচকে আছে, চেহারায় উদ্বেগ। একটা সময় ছিল যখন বিশ্বাস রাখা যেত আলি হোসেনের ওপর। কিন্তু দিন পাল্টেছে, পয়সার লোভে পুলিসের ইনফরমার হয়ে গেছে লোকটা। রানাকে যমের মত ভয় করে সে, কিন্তু তবু মনটা খুঁত খুঁত করতে

লাগল। আলি হোসেনের সাহায্য না চেয়ে অন্য কোন উপায়ও ছিল না। অল্প সময়ের ভেতর একমাত্র সেই পারে একটা অ্যালিবাই খাড়া করে দিতে। বেডরুমে ফিরে যাবে রানা, এই সময় ফোন বেজে উঠল। হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলল ও।

'কে?'

অপরপ্রান্ত থেকে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলার আওয়াজ পাওয়া গেল, কে যেন হাঁপাচ্ছে। 'ডিউক ভাই!'

একটা মেয়ের গলা, চেনা, কিন্তু চিনতে কষ্ট হলো রানার। রুবি কথা বলছে। 'ডিউক ভাই, আমি, আ-মি রুবি।'

বুঝে নিল রানা, কিছু একটা অঘটন ঘটেছে। এর আগে রুবি কখনও ফোন করেনি তাকে। 'কি ব্যাপার, রুবি? কি হয়েছে?'

'ডিউক ভাই, আপনি পালিয়ে যান!' রুদ্ধশ্বাসে বলল রুবি। 'পুলিস! আমাদের মনিব আলি হোসেন সাহেব আপনার ঠিকানা দিয়েছে ওদেরকে।'

'কতক্ষণ আগে?'

'মিনিট দশেক। পুলিস ইন্সপেক্টর ফয়েজ আহমেদ এসেছিলেন এখানে। কি একটা খুনের কথা বলছিলেন উনি।'

'ঠিক আছে, রুবি। চিন্তার কিছু নেই। তুমি ফোন করায় খুশি হয়েছি আমি। একটা সুটকেস পাঠিয়েছি তোমার কাছে, ওটা লুকিয়ে রেখো। কেউ যেন না পায়। এখন তাহলে ছাড়ি, কেমন? তাড়া আছে। আবার দেখা হবে।' কি যেন বলতে শুরু করল রুবি, কিন্তু তা আর না শুনে রিসিভার রেখে দিল রানা।

এক সেকেন্ড পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ও। তারপর বেডরুমের দিকে পা বাড়াতে যাবে, তীক্ষ্ণ শব্দে বেজে উঠল কলিং বেল। ঠিকে ঝি নয়, কাজ সেরে অনেক আগেই চলে গেছে সে। আর কে হতে পারে? নিশ্চয়ই পুলিস! দ্রুত জানালার সামনে এসে দাঁড়াল ও। পর্দা সামান্য একটু সরিয়ে উঁকি দিয়ে নিচের উঠানে তাকাল। মুখ তুলে ওপর দিকে তাকিয়ে আছে দু'জন তাগড়া চেহারার লোক, পরনে পুলিস ইউনিফর্ম। ঝম ঝম বৃষ্টির মধ্যে ভিজছে তারা। একজনকে চিনতে পারল রানা। ইন্সপেক্টর ফয়েজ আহমেদ।

ছুটে বেডরুমে ফিরে এল রানা। পুরানো একটা রেনকোট বের করল খাটের তলা থেকে। অনেক দিন পরে পরে নোংরা হয়ে গেছে, কিন্তু এখন আর ঝেড়ে পরিষ্কার করার সময় নেই। বাইরে যা বৃষ্টি, সব এমনিতেই ধুয়ে সাফ হয়ে যাবে। পুরানো একটা হ্যাটও খুঁজে পাওয়া গেল। দেরাজ থেকে মানি ব্যাগটা বের করে ভরে নিল ট্রাউজারের পকেটে। বেডরুম থেকে ফ্ল্যাটের পিছনের প্যাসেজে বেরিয়ে এল ও। শেষ মাথায় পৌঁছে উঁকি দিয়ে দেখে নিল সরু গলিটা। না, বাড়ির পিছন দিকে পাহারা বসায়নি পুলিস। অন্তত কাউকে দেখতে পেল না রানা। রেলিঙের ওপর উঠে হাত বাড়াতেই নাগালের মধ্যে চলে এল পানির মোটা পাইপটা। ঝুলে পড়ল রানা। সড়সড় করে নেমে এল নিচের গলিতে।

এগোবার আগে চারদিকটা ভাল করে দেখে নিচ্ছে রানা, এই সময় সাক্ষাৎ আজরাইলের মত একটা দরজার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একজন পুলিস কনস্টেবল। লোকটা পিছু হটছে, দেখতেই পায়নি রানাকে।

'এই যে, ভাই, চোর ধরতে এসেছেন নাকি?'

'কে!' চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়াল কনস্টেবল। কপালে হাত তুলে বৃষ্টি ঠেকাল, কটমট করে তাকাল রানার দিকে। উল্টোদিকের একটা দরজা দেখিয়ে বলল রানা, 'এখানে থাকি। ছাদ থেকে দেখলাম ওই বাড়িটাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছেন আপনারা। ব্যাপারটা কি বলুন তো?'

'পুলিসী ব্যাপারে নাক গলাবেন না!' রুষ্ট দেখাল কনস্টেবলকে। 'যান, নিজের কাজে যান।' বলে হন হন করে গলির ভেতর দিকে এগোল সে।

'জ্বে,' মৃদু হেসে এগোল রানা। মেইন রোডে উঠে এসে সামনেই একটা রিকশা দেখে লাফ দিয়ে চড়ে বসল তাতে। হাসছে আপন মনে।

'কি উইছে, সাব? হাসতেছেন ক্যান?' প্যাসেঞ্জার পাগল কিনা বুঝতে চায় রিকশাওয়ালা।

'লটারি পেয়েছি,' হাসতে হাসতেই বলল রানা। মনে মনে একটা হিসেব কষল, একবার গ্রেফতার হয়ে ছাড়া পেতে কত টাকা লাগতে পারে। মানসিক দুশ্চিন্তা, শারীরিক কষ্ট ইত্যাদিরও একটা দাম আছে। 'পাঁচ লাখ টাকা!'

ঠিকানা মিলিয়ে একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল রানা। বেশ উঁচু পাঁচিল বাড়িটার, পাশাপাশি অনেকগুলো সাইনবোর্ড দাঁড় করানো। বুঝতে অসুবিধে হয় না, বাড়িওয়ালা মাত্র একজনকে বাড়িটা ভাড়া দেয়নি বা দিতে পারেনি, কয়েকটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে ভাগ করে দিয়েছে। প্রথম সাইনবোর্ডটা একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির। দ্বিতীয়টা হস্তশিল্প কারখানার। তৃতীয়টা একটা স্টুডিও-র।

বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে, স্টুডিও বিচিত্রা। তার নিচে গোটা গোটা অক্ষরে বলা হয়েছে, এখানে ফটো তোলা ছাড়াও প্রতিকৃতি আঁকা হয়।

খোলাই ছিল গেট, ভেতরে ঢুকে পড়ল রানা। মস্ত উঠান, প্রায় চারকোনা। তিন-চারটে করে কামরা নিয়ে এক একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু সামনের চার সারির কোথাও বিচিত্রা স্টুডিও-র সাইনবোর্ড দেখল না রানা। বাঁ দিকে এগোল ও। সারির শেষে খানিকটা ফাঁকা জায়গা, তার পেছন দিকে কয়েকটা কামরা নিয়ে বিচিত্রা স্টুডিও। একটু পিছিয়ে পড়ায় স্টুডিওটাকে দলছুট বলে মনে হয়। সামনের উঠান থেকে ভাল দেখা যায় না।

ধাপ ক'টা টপকে সদর দরজার সামনে দাঁড়াল রানা। চাপ দিল কলিংবেলের বোতামে। বৃষ্টি ছেড়ে গেছে খানিক আগে, রেনকোটটা ভাঁজ করে হাতে রেখেছে ও। অপর হাতটা ট্রাউজারের পকেটে। মাথার ভেতরটা ফাঁকা লাগছে, কিছু চিন্তা করতে পারছে না। আবিদের বোনকে কি বলবে অনেক ভেবেও ঠিক করতে পারেনি এখনও। মেয়েটা কি ধরনের জানা নেই। তাকে দেখার আগেই কেন যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠল ও।

দরজা খুলে সামনে এসে দাঁড়াল একটা মেয়ে। দেখেই রানার মনটা একটু দমে গেল। আশা করেছিল উদ্ভিন্ন যৌবনা, স্মার্ট, অপরূপ সুন্দরী হবে আবিদের বোন। কিন্তু এ যেন ঠিক উল্টোটা। আর যাই হোক, এই মেয়েকে স্মার্ট বা অপরূপ সুন্দরী বলা চলে না। নেহাতই সাধারণ চেহারার একটা মেয়ে। বাংলাদেশী প্রিন্টের একটা

শাড়ি পরে আছে, পা দুটো খালি, রুজ লিপস্টিক কিছুই নেই মুখে। মাথায় চুল আছে প্রচুর, কিন্তু আজ তার কোন যত্ন নেয়নি। চোখ দুটো বড় বড় কিন্তু আশ্চর্য শান্ত। রোগাই বলা যায় তাকে। বেঁটে নয়, তবে লম্বাও বলা চলে না। বড় বেশি সাধারণ, বড় বেশি ঘরোয়া লাগল রানার।

'কাকে চাইছেন?' শান্ত, কিন্তু স্পষ্ট কণ্ঠ। প্রশ্নটা করার সময় ভদ্রতা করে একটু হাসল। অবাক হয়ে লক্ষ করল রানা, হাসলে মেয়েটার মুখ উজ্জ্বল আলোময় হয়ে ওঠে। যাক, অন্তত একটা বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করা গেছে। দেখতে সাধারণ হলেও, হাসিটা তা নয়।

বড় বড় সরল চোখের দিকে তাকিয়ে মিথ্যে কথা বলতে বাধল রানার। সরাসরি বলল ও, 'আপনার ভাইকে খুঁজছি আমি—আবিদুর রহমানকে,' নিজের কানেই অজুহাতের মত শোনাল কথাটা। 'আপনি তো আবিদের বোন, তাই না?'

মুখের হাসিটা ম্লান হয়ে গেল, ঘন ঘন চোখ পিট পিট করল মেয়েটা। উজ্জ্বল আলোটা নিভে গেছে চেহারা থেকে। 'আবিদ?' শুকনো মুখে বলল টিনা রহমান। 'কেন, আপনি জানেন না?' রানাকে যেন আবিদের বন্ধু বলে ধরে নিয়েছে সে। 'ও তো প্রায় আঠারো মাস হলো মারা গেছে।'

নয়

ঢাকার বাজে হোটেলগুলোরই একটা পুবালি। ঢোকার মুখে কোন সাইনবোর্ড নেই। দু'পাশে দুটো দোকান: একটা থান কাপড়ের, আরেকটা স্টেশনারির। হোটেলের সদর দরজার কাঁচে পুবালি লেখা আছে বটে, কিন্তু অক্ষরগুলোর এমনই ডিজাইন, তার ওপর কালের আঁচড়ে এতই ঝাপসা হয়ে গেছে, পড়াই যায় না। দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলেই প্রায় খাড়া কাঠের সিঁড়ি। সিঁড়ির মাথায় নোংরা, সিল্কের একটা পর্দা ঝুলছে, কারণটা অনুমান করা কঠিন। পর্দার ওপারে চারকোনা লাউঞ্জ। ছোট একটা জায়গা, দিনের বেলাও অন্ধকার। কঠিন চেহারার খানকয়েক চেয়ার ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে রাখা হয়েছে। সাথে একটা বেতের টেবিলও আছে। কাছেই ম্যানেজারের কামরা, রিসেপশন ডেস্কটা সেখানেই। কিন্তু কামরাটার দরজায় মস্ত এক তালা ঝুলছে। কবাটের গায়ে ছোট টিনের সাইনবোর্ড, তাতে লেখা—প্রাইভেট, সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। কবাটের গায়ে একটা গর্ত, কাঁচ দিয়ে ঢাকা। রুম বুক করতে হলে ওই কাঁচে টোকা দিয়ে রিসেপশনিস্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয়।

ম্যানেজারের কামরা থেকে কয়েক হাত দূরে আরও একটা ছোট সাইনবোর্ড, তাতে লেখা—লাউঞ্জ, শুধুমাত্র অতিথিদের জন্য। পাবলিক লাউঞ্জের চেয়ে অন্ধকার এখানে বেশি। দুটো জানালা আছে, উঁকি দিলে পিছনের একটা রাস্তা দেখতে পাওয়া যায়। এখানের চেয়ারগুলোর চেহারা কঠিন নয়, বিধ্বস্ত। তবে, গদি মোড়া। বেতের একটা টেবিল ফেলা রয়েছে, সেটাকে সামনে নিয়ে গদিমোড়া

চেয়ারে বসে আছে আকরাম খান।

প্রায় ঘণ্টাখানেক হয়ে গেল এখানে বসে আছে আকরাম। হাঁটু দুটো পরস্পরের সাথে সেঁটে আছে, একটা কনুই টেবিলের ওপর, মুঠো করা হাতের ওপর চিবুক। সময়টা অতীত রোমন্থন করে পার করে দিচ্ছে সে। নিজের সম্পর্কে ভাবছিল, তার শুধু অতীত আছে, বর্তমানটা সেই অতীতকে কেন্দ্র করেই, কিন্তু কোন ভবিষ্যৎ নেই। তার যেন কঠিন একটা রোগ হয়েছে, ভাল হবার কোন আশা নেই, মনে মনে জানে তার জীবনে হঠাৎ করে, এবং কোন নোটিশ না দিয়েই নেমে আসবে অন্ধকার, মৃত্যু। বিষয়টা নিয়ে চিন্তার জাল বোনার সময় আশ্চর্য একটা নির্লিপ্ত ভাব এসে যায় তার মনে। ভবিষ্যতের কথা মোটেও ভাবে না সে। মাথার ভেতর শুধু অতীত স্মৃতি ঘুরে ফিরে আসে। দু'জনের কথা ভুলতে পারে না সে। একজন তার স্ত্রী, সাজিয়া। আরেকজন তার শত্রু, আবিদ।

চেষ্টা করতে হয় না, চোখ বুজলেই চোখের সামনে এসে দাঁড়ায় সাজিয়া। রক্ত-মাংসের সাজিয়াকে যেমন দেখেছে সে, কল্পনার এই সাজিয়া তার চেয়েও যেন জ্যান্ত। এই এখন যেমন দেখতে পাচ্ছে তাকে। একটু বেঁটে, মোটা নয়, তবে মুটিয়ে যাবার লক্ষণ রয়েছে বলে মনে হয়। পা দুটোয় খুব বেশি মাংস, কিন্তু লোহার মত শক্ত পেশী। নিরেট, চওড়া নিতম্ব। কোমর ছাড়িয়ে নেমে গেছে ঢেউ খেলানো কালো চুল। মারা যাবার সময় বয়স হয়েছিল পঁচিশ। ষোলোয় বিয়ে হয়েছিল তার সাথে।

সাজিয়া মারা যাবার পর থেকে সেই নয়টা বছরের প্রতিটি দিন খুঁটিয়ে স্মরণ করবার চেষ্টা করে আসছে আকরাম। প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি, প্রতিটি কথা মনের মণিকোঠায় জমা করে রেখেছে সে। স্মৃতি হাতড়ে আরও ঘটনার কথা মনে করতে চেষ্টা করে সে। নতুন কিছু মনে পড়লে দিন কয়েক শুধু সেটাই রোমন্থন করে, যাতে ভুলে না যায়।

দু'জনেই সুখী হয়েছিল ওরা। ওদের দিনগুলো কাটত হাসি, আনন্দ আর ফূর্তিতে। অভাবের সাথে মানিয়ে চলার সহজাত একটা গুণ ছিল সাজিয়ার। দুনিয়ায় তার মত আরেকটা মেয়ে থাকতে পারে, বিশ্বাস করে না আকরাম। সাজিয়ার মনটা ছিল কোমল, কাউকে আঘাত দিতে জানত না। কিন্তু সাহস ছিল দুর্দান্ত, আত্মীয়-স্বজন ছাড়া বিদেশে থাকতে হলে যা একান্ত ভাবে থাকা দরকার। ইয়াহিয়া সরকার পূর্ব-পাকিস্তানের ওপর পাঞ্জাবী সেনাদের লেলিয়ে দিয়েছে, বি.বি.সি.-র এই খবর শুনে তার চোখে যে আগুন জ্বলে উঠতে দেখেছিল আকরাম, জীবনে কখনও ভুলবে না। সাজিয়ার দেশপ্রেম কি গভীর, টের পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল সে। লাহোর সীমান্ত পেরিয়ে ইন্ডিয়ায় পালাবার প্ল্যানটা ছিল আকরামের, কিন্তু সীমান্ত এলাকায় পৌঁছে ফিরোজ ভাইয়ের গেরিলা দলে যোগ দেয়ার কথা মাথায় এসেছিল সাজিয়ার। সিদ্ধান্ত নিতে খানিক দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিল আকরাম, কিন্তু সাজিয়ার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাব দেখে সে আর আপত্তি করবার সাহস পায়নি।

তারপর ধরা পড়ল কেয়া, শাহেদ আর আবিদ। ফিরোজ ভাইয়ের সাথে বেঈমানী করল আবিদ। আস্তানায় গুলি খেয়ে মরল রেন্টু আর সাজিয়া। ফিরোজ ভাইকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেল পাঞ্জাবী সেনারা। সবশেষে জাফর আর

মনসুরের সাথে ধরা পড়ল সে-ও।

যুদ্ধের দিনগুলো লাহোর ক্যান্টনমেন্টে বন্দী ছিল ওরা, পরস্পরের সাথে কোন যোগাযোগ করতে পারেনি। যুদ্ধ শেষ হলো, জন্ম নিল নতুন বাংলাদেশ, ওদেরকে ক্যান্টনমেন্ট থেকে চালান দেয়া হলো লাহোর জেলে। জেলে আসার পর সবার সাথে গোপন যোগাযোগ করার প্রথম উদ্যোগ নেয় সে। সিন্ধী আর বেলুচী কয়েদীরা ওদের ওপর ভারি সদয় ছিল। তাদের সাহায্য নিয়ে সবার সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হলো। সবাইকে জানিয়ে দিল সে, প্রতিশোধ নিতে হবে। আবিদের ক্ষমা নেই। একটা শপথনামা লিখল সে, নিজের রক্ত দিয়ে সই করল তাতে। তারপর সেটা পাঠিয়ে দিল একে একে সবার কাছে। কেউ আপত্তি বা প্রতিবাদ করেনি, যার যার নিজের রক্ত দিয়ে সবাই সই করেছিল সেই শপথ নামায়। এরপর শুরু হলো সুযোগের অপেক্ষায় থাকার পালা, ভেবে বের করা কিভাবে জেল ভেঙে পালানো যায়। তার ইচ্ছে ছিল, দেরি না করা। প্রথম সুযোগেই জেল ভেঙে পালাতে হবে। কিন্তু বাধা দিল কেয়া। ইতিমধ্যে গোপন চিরকুট লিখে নিজের মনোভাব সবাইকে জানিয়েছে কেয়া, সবাই বুঝেছে আবিদকে ওরা সবাই মিলে যতটুকু ঘৃণা করে, ওর ওপর একা কেয়ার ঘৃণা তারচেয়ে অনেক বেশি। সে যুক্তি দিল, তাড়াহুড়ো করলে গোটা ব্যাপারটাই ভণ্ডুল হয়ে যাবে। পালাতে গিয়ে একবার যদি ধরা পড়ে যেতে হয়, দ্বিতীয়বার আর সুযোগ আসবে না। কাজেই পালানোর শতকরা একশো ভাগ সম্ভাবনা আছে জেনেই পালাবার চেষ্টা নিতে হবে। সেজন্যে দরকার হলে কয়েক বছর অপেক্ষা করতেও আপত্তি নেই কেয়ার। আকরাম সেটা চায়নি। কিন্তু বাকি সবাই কেয়াকেই সমর্থন দেয়। সেজন্যেই দশ-এগারো বছর দেরি হয়ে গেল ওদের। এর জন্যে কেয়াকেই দায়ী করে সে।

যাই হোক, জেল ভেঙে সত্যি পালাতে পেরেছে ওরা। পাকিস্তান থেকে ইন্ডিয়া, সেখান থেকে বাংলাদেশে এসে পৌঁচেছে। তার ইচ্ছে ছিল, প্রতিশোধটা নিজেরাই নেবে। বাইরের সাহায্য গ্রহণের ব্যাপারে প্রথম থেকেই ঘোর আপত্তি জানিয়ে আসছে সে। কিন্তু অকর্মার ধাড়ি, ভীতু শাহেদের মাথায় কি যে আছে! কেয়াও তার কথা মেনে নিল। টাকা-পয়সা সব কেয়ার হাতে, তাই আবিদের খোঁজে একা বেরিয়ে যেতে পারছে না সে। কিন্তু সুযোগ পেলে ডিউক কবে খুঁজে বের করবে আবিদকে, তার অপেক্ষায় থাকবে না সে, নিজেই খুঁজতে বেরুবে। আবিদকে নিজের হাতে খুন করতে না পারলে প্রতিশোধ নেয়ার সার্থকতা কোথায়!

নঈমের কথা মনে পড়ল আকরামের। বাংলাদেশে আসার পর সন্তুষ্ট হবার মত এই একটাই কাজ করেছে সে, গুলি করে মেরেছে নঈমকে। এই প্রথম কারও অনুমতি বা মতামতের ধার না ধেরে নিজের ইচ্ছে মত একটা দায়িত্ব পালন করেছে সে। নঈমকে নিয়ে কি করা হবে ভেবে পাচ্ছিল না শাহেদ আর কেয়া, তাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, প্রয়োজনে কত দ্রুত সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে সে। ফ্ল্যাট থেকে শাহেদ বেরিয়ে যাবার পরপরই নঈমের মাথায় গুলি করে ও। কেয়া ছিল পাশের কামরায়। মাউজারের সামনে একটা কুশন রেখে গুলি করেছিল সে, ফলে আওয়াজটা বেশিরভাগই চাপা পড়ে গিয়েছিল। ঘরে ঢুকে কেয়া দেখল, কার্পেটের ওপর নিথর পড়ে আছে নঈমের লাশ।

পরিচয় হবার পর থেকে এই প্রথম মনে মনে কেয়ার প্রশংসা করল আকরাম। অস্থির না হয়ে, চেঁচামেচি না করে, নঈমের লাশ দেখেই নতুন একটা বুদ্ধি আঁটল সে। নঈমের মৃত্যুটাকে ফাঁদ হিসেবে দেখল সে, যে ফাঁদে আটকা পড়তে বাধ্য হবে ডিউক। নঈমের খুনের দায় ডিউকের ওপর চাপানো যায়, কথাটা কেয়া না বললে আকরামের মাথায় ঢুকতই না। যদিও তার সন্দেহ ছিল, মাউজারে ডিউকের হাতের ছাপ পাওয়া যাবে কিনা। কিন্তু কেয়া তাকে বোঝাল, পাওয়া যাক বা না যাক, পাওয়া যাবে বলে ডিউক বিশ্বাস করলেই হলো। আসল কথা, নিজেদের হাতে এমন কিছু একটা রাখা যাতে ডিউককে ইচ্ছে মত নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরানো যায়।

আকরাম এখন অন্য কথা ভাবছে। ডিউককে দিয়ে কাজটা করিয়ে নেবার ধারণা কেয়ার মন থেকে যদি মুছে ফেলা যায়, আবিদকে খুঁজে বের করার জন্যে নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করতে পারে সে। ডিউকের কাছ থেকে টাকাটা আদায় করা তেমন কঠিন হবে না। আর যদি বেয়াদপি করেই সে, নঈমকে যে দাওয়াই দেয়া হয়েছে, শেষ পর্যন্ত তাকেও সেই একই দাওয়াই দিতে কোন অসুবিধে নেই। হয়তো নঈমের মত সহজে দাওয়াই গেলানো যাবে না ডিউককে, কিন্তু তাই বলে কাজটা অসম্ভব নয়।

আরেকটা সমস্যা হলো শাহেদ। মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে সে। নঈমের মৃত্যু নার্ভাস করে তুলেছে তাকে। অবশ্য ওর ওপর কোনকালেই ভরসা রাখতে পারেনি আকরাম। অকর্মার ধাড়ি, ভীতুর ডিম। যুদ্ধের সময় মোটামুটি সাহসের পরিচয় দিয়েছিল বটে, কিন্তু একটানা এক যুগেরও বেশি জেল খেটে ভোঁতা হয়ে গেছে মানুষটা। দেরি না করে ওর ব্যাপারেও কিছু একটা করা দরকার।

লাউঞ্জের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল এক বুড়ো লোক। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে লাগল সে। চেহারায় ঝগড়াটে ভাব, ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে। 'আজকের ইত্তেফাকটা, বুঝলেন? কোথাও পেলাম না! কি জ্বালা বলুন দেখি। হাতে কাগজ না থাকলে সকাল বেলা নাস্তায় বসা যায়? ম্যানেজারের কাছে কমপ্লেন করব আমি!'

কটমট করে বুড়োর দিকে একবার তাকাল আকরাম।

ইতস্তত ভাবটা বেড়ে গেল বুড়োর। রাগ তাকে ক্লান্ত করে তুলেছে। নিঃসঙ্গ মানুষ, সঙ্গ পাবার জন্যে লালায়িত হয়ে উঠেছে, আবার বলল সে, 'আপনাকে বোধহয় বিরক্ত করছি আমি! আপনি এখানে আছেন জানতাম না।'

আকরাম কোন উত্তরও করল না, ফিরেও তাকাল না।

'আপনি বোধ হয় নতুন এসেছেন, তাই না?' জানতে চাইল বুড়ো। আকরাম চুপ করে থাকায় অপমান বোধ করছে সে। 'তা খবরের কাগজ পড়ার অভ্যেস নেই বুঝি?'

'বেরিয়ে যান!' হঠাৎ কুকুরের মত ঘেউ করে খেঁকিয়ে উঠল আকরাম।

'কি বললেন?' অবাক হয়ে জানতে চাইল বুড়ো। 'দুঃখিত, কানে ভাল শুনি না আমি। বয়স হয়েছে তো! আরেক বার বলুন—একটু জোরে!'

ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল আকরামের গলার ভেতর থেকে, অন্য দিকে মুখ ফেরাল সে।

'আজকের ইত্তেফাকটা, দেখেছেন নাকি?' বুড়োও নাছোড়বান্দা। 'নিশ্চয়ই কেউ লুকিয়ে ফেলেছে। যাই, ম্যানেজারকে বলি গিয়ে।'

বুড়ো চলে যেতে দরজাটা ভিড়িয়ে দিয়ে এল আকরাম। আবার চিন্তার জাল বুনে চলল সে। এবার শাহেদকে নিয়ে। হঠাৎ উপলব্ধি করতে পেরেছে, ওকে খুন না করলেই নয়।

দশ

কাঁচ লাগানো সুইং ডোর ঠেলে হোটেল পুবালিতে ঢুকল কেয়া। কোন দিকে না তাকিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল ওপরে। ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাকে, কপালে চিন্তার রেখা। ভাঁজ করা কয়েকটা খবরের কাগজ রয়েছে তার হাতে। পর্দা সরিয়ে পাবলিক লাউঞ্জে পা দিতেই দেখল, ম্যানেজারের কামরার সামনে দাঁড়িয়ে দরজায় টোকা দিতে যাচ্ছে থুরথুরে এক বুড়ো। কেয়ার জানা নেই, এই বুড়োই খানিক আগে কথা বলেছে আকরামের সাথে।

আজ প্রায় দশ-বারো বছর ধরে হোটেল পুবালিতে আছে লোকটা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বৃটেনের পক্ষ নিয়ে বার্মায় যুদ্ধ করেছে সে। অবশ্য কোন পদোন্নতি হয়নি, সাধারণ সৈনিক হিসেবেই অবসর নিয়েছিল। ভারত ভাগ হয়ে যাবার পর পাকিস্তান সরকারের চাকরি করেছে সে। অবসর নিয়েছে বছর পনেরো আগে। তিনকুলে নেই কেউ, পেনশনের টাকায় একটা মানুষ কোন রকমে চলে যায়। তার মত নিঃসঙ্গ মানুষ ঢাকায় বোধ হয় আর দ্বিতীয়টি নেই।

ম্যানেজারের দরজায় টোকা দিতে গিয়েও দিল না লোকটা, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই দেখতে পেল কেয়াকে। কেয়া প্রথম যখন হোটেলে আসে তখনও মুহূর্ত কয়েকের জন্যে তাকে দেখেছিল সে। মনে মনে অবাক না হয়ে পারেনি। পুবালি এমনই একটা হোটেল, গত দশ বছরে কোন সুন্দরী বা যুবতী মেয়েকে ঢুকতে দেখেনি সে। কেয়ার পোশাক-আশাক, চলন-বলন ইত্যাদি দেখে তাকে অন্য কোন জগতের মানুষ বলে মনে হয়েছে বুড়োর।

'আদাব,' বিনয়ে বিগলিত ভাব দেখিয়ে কেয়ার দিকে এগিয়ে আসে বুড়ো। 'আজ একেবারে ভোর বেলা বেরিয়েছিলেন! আরে, আপনার হাতে দেখছি খবরের কাগজ! সেই কখন থেকে আজকের ইত্তেফাকটা খুঁজছি...'

মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়াল কেয়া। বুড়ো ওর মনে কোন সহানুভূতি জাগাতে পারেনি। কটমট করে তাকাল সে। উত্তরে কিছুই না বলে বুড়োকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

কেয়ার আচরণ নিঃসঙ্গ লোকটাকে যেন প্রচণ্ড এক ঘুসি বসিয়ে দিয়েছে। তার গমন পথের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল সে। বিড়বিড় করে কি যেন বলল। হঠাৎ করে নিজেকে অসম্ভব বুড়ো বলে মনে হলো তার। আজ তার উপলব্ধি হলো, নামে মাত্র বেঁচে আছে সে, জীবন তাকে অনেক আগেই ছেড়ে চলে গেছে।

রেসিডেন্টস লাউঞ্জে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল কেয়া। 'পুলিস নঈমের লাশ পেয়েছে,' শান্ত গলায়, সিন্ধী ভাষায় বলল সে।

চোখ বুজে ছিল আকরাম, ভীষণ ভাবে চমকে উঠল সে। তারপর দ্রুত ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল কেয়ার দিকে। ধাতস্থ হবার জন্যে কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকল সে, তারপর চমকে ওঠাটাকে ব্যাখ্যা করার জন্যে বলল, 'তুমি এসেছ বুঝতে পারিনি। খবরটা কাগজে আছে?'

কাগজগুলো ছুঁড়ে টেবিলের ওপর ফেলল কেয়া, আকরামের কাছ থেকে সরে গিয়ে লাউঞ্জের অন্ধকার কোণে একটা ধুলো মাখা চেয়ারে বসল। 'ফার্স্ট পেজেই দেখতে পাবে।'

সবগুলো কাগজেই রিপোর্ট করা হয়েছে। একে একে সবগুলো রিপোর্ট পড়ল আকরাম। চেহারায় কোন ভাবান্তর নেই। 'ডিউকের যে বর্ণনা দিয়েছে, কোথাও কোন খুঁত নেই। শালা ঠিক ধরা পড়ে যাবে।'

'কিভাবে গা বাঁচাতে হয় জানে সে, ধরা পড়বে না,' বলল কেয়া। 'বরং আবিদকে খোঁজার জন্যে আরও উঠে পড়ে লাগবে।'

হাতের কাগজ ছুঁড়ে মেঝেতে ফেলে দিল আকরাম। তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল কেয়ার দিকে। 'কিন্তু ধরা পড়লে আমাদের কথা সব ফাঁস করে দেবে, অস্বীকার করতে পারো? এই রকম একটা বাটপারের সাথে নিজেদেরকে জড়ানো মোটেই উচিত হয়নি আমাদের। সিক্রেসি আউট করা মহা বোকামি হয়ে গেছে।'

'তোমার বকবকানি থামাও তো!' চটে উঠে বলল কেয়া। 'এ-ধরনের কাজে ডিউকই একমাত্র যোগ্য লোক। পারলে সেই পারবে। ভুলে গিয়ে থাকলে আরেকবার তার রেকর্ডে চোখ বুলিয়ে নাও। আন্ডারগ্রাউন্ড জগতে তার প্রতিপত্তি আছে, দরকার হলে অনেকের সাহায্য নিতে পারবে। তাছাড়া, আবিদ তাকে চেনে না।'

'যতই যুক্তি দেখাও, আমাকে কনভিন্স করতে পারবে না। ওকে সব জানানো ভুল হয়ে গেছে, সেটা যত তাড়াতাড়ি স্বীকার করো ততই ভাল। শাহেদ একটা গর্দভ, আর তুমি কিনা তার কথাতেই নাচলে!'

'যুক্তি বোঝে না, এমন গোঁয়ার তো দেখিনি,' গলা চড়িয়ে বলল কেয়া। 'পারো তো শুধু সমালোচনা করতে! জাফর আর মনসুরের মত এক এক করে আমরা বাকি সবাই মারা গেলে সেটা বুঝি ভাল হত? আবিদকে তুমি খুঁজে বের করবে? ছোঃ! নিজেকে বড় বেশি চালাক মনে করো, সেটাই তোমার মস্ত দোষ। আবিদের সাথে টেক্কা দেয়া আমাদের তিনজনের কারও কর্ম নয়, কথাটা মনে রেখো।'

'তোমার ধারণা, ডিউকের বুঝি খুব বুদ্ধি?' ঝাঁঝের সাথে জানতে চাইল আকরাম।

'অবশ্যই!' জোর দিয়ে বলল কেয়া। 'অন্তত আমাদের সবার চেয়ে বেশি তো বটেই।'

'তাই যদি হবে,' বিদ্রূপের সুরে জানতে চাইল আকরাম, 'তাহলে আমাদের ফাঁদে ব্যাটা ধরা পড়ল কিভাবে?'

উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠল কেয়ার মুখ, কিন্তু বলার মত কিছু না পেয়ে কটমট

করে তাকিয়ে থাকল শুধু।

'কি, মুখে কথা সরছে না কেন?'

'ডিউককে ফাঁদে ফেলার জন্যে একজন লোককে খুন করতে হয়েছে আমাদের,' বলল কেয়া। 'এতে বুদ্ধির কোন চমক নেই। আমাদের বুদ্ধির কাছে হেরে গেছে ডিউক, তা মনে করার কোন কারণ নেই। কথা হচ্ছিল আবিদকে খুঁজে বের করে তাকে খুন করার মত যোগ্যতা ডিউকের আছে কিনা তাই নিয়ে। আমি বলছি আছে।'

'সে তর্কে আমার রুচি নেই,' কঠিন সুরে বলল আকরাম। 'আবিদকে নিজের হাতে খুন করার মধ্যে যে সন্তুষ্টি, সেটা থেকে নিজেকে আমি বঞ্চিত করতে রাজি নই, বলে রাখলাম। যাই ঘটে যাক, তাকে আমি নিজের হাতে খুন করব।'

'এখনও তাহলে এখানে বসে আছ কেন? যাও, বেরিয়ে পড়ো! খুঁজে বের করো তাকে। নিজের হাতে মারো। কে তোমাকে বাধা দিচ্ছে? যাও!'

'সময় হলে ঠিকই যাব, কারও অনুমতির অপেক্ষায় বসে থাকব না,' ঝাঁঝের সাথে জবাব দিল আকরাম। 'এর জন্যে এক যুগের বেশি অপেক্ষা করেছি আমি। তোমার মত একটা মেয়েলোকের নির্বুদ্ধিতার জন্যে নিজেকে আমি বঞ্চিত করতে রাজি নই।'

নগ্ন ঘৃণা ফুটে উঠল কেয়ার চোখে। 'নেমকহারাম! তোমার কাছে আমি একটা মেয়েলোক? আমি বোকা? কে তোমাকে জেল থেকে বেরুতে সাহায্য করল? ব্যাংক লুট করার প্ল্যানটা কার কাছ থেকে পেয়েছ? চোরা পথে কার বদৌলতে ঢুকতে পারলে বাংলাদেশে? কে খুঁজে বের করল ডিউককে? আমি, কেয়া চৌধুরী নই? নেমকহারাম! বেঈমান! এখন বলে কিনা আমি একটা মেয়েলোক! আমি একটা বোকা! পুরুষ নই, সেটা তোমার সৌভাগ্য! তা হলে এখুনি তোমার সব ক'টা দাঁত ফেলে দিতাম।' ফোঁস ফোঁস করে হাঁপাতে শুরু করল কেয়া। 'সবার সমালোচনা করো—তুমি নিজে কি? কাপুরুষ!'

'কি বললে?' রেগে তো গেলই, তারচেয়ে বেশি বিস্মিত হলো আকরাম। 'আমি কাপুরুষ?'

'নও?' ঠোঁট বাঁকা করে বিদ্রূপের হাসি হাসল কেয়া। 'নঈমকে খুন করাটা কি বীরপুরুষের কাজ হয়েছে বলে মনে করো?'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল আকরাম। কেয়ার মনে হলো, তাকে মারতে আসছে সে। কিন্তু ভয় পেল না। উদ্ধত ভঙ্গিতে, শিরদাঁড়া খাড়া করে চেয়ারে বসে থাকল সে, চোখে আগুন নিয়ে তাকিয়ে থাকল আকরামের দিকে।

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিল আকরাম। কেয়ার দিকে পিছন ফিরল সে, জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলল, 'আমি ঝগড়া করতে চাই না। কিন্তু একটা কথা পরিষ্কার হয়ে যাওয়া ভাল। আবিদের ব্যাপারে এতদিন অপেক্ষা করেছি আমরা, শুধু তোমার জন্যে। তুমিই আমাদেরকে জেল ভেঙে পালাতে দাওনি। আমি অপেক্ষা করার ঘোর বিরোধী ছিলাম। কিন্তু অপেক্ষা যখন করেইছি, নিজের হাতে প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়ছি না। আমরা যদি একসাথে থাকতে চাই, খুব তাড়াতাড়ি অ্যাকশনে যেতে হবে। তা না হলে আমাকে কিছু টাকা দেবে তুমি, দল

থেকে বেরিয়ে গিয়ে আমি একাই খুঁজব আবিদকে।'

'টাকার কথা ডিউককে বলো গিয়ে,' আবার বিদ্রূপের হাসি দেখা গেল কেয়ার ঠোঁটে। 'টাকা তো সব তার কাছে। কিন্তু যদি মনে করো...'

লাউঞ্জের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল শাহেদ। প্রথমে আকরাম তারপর কেয়ার দিকে দ্রুত তাকাল সে। দরজা বন্ধ করল। আড়ষ্ট একটা ভঙ্গি রয়েছে তার হাবভাবে, কেয়া বা আকরামের দৃষ্টি এড়াল না।

'তুমি আবার ফিরে এলে কেন?' সামনের দিকে ঝুঁকে জানতে চাইল কেয়া। 'ডিউক কোথায়?'

'জানি না,' বলল শাহেদ। 'তাকে আমি হারিয়ে ফেলেছি।'

অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। তারপর হঠাৎ করেই চরকির মত আধপাক ঘুরল আকরাম, কেয়ার দিকে একটা আঙুল তুলল। 'দেখলে তো? গোটা ব্যাপারটা লেজে-গোবরে করে ছেড়েছে। ডিউক সটকে পড়েছে, সেই সাথে টাকাটাও গেছে। আবার বলে কিনা আমি নাকি কোন কাজেরই নই, শুধু সমালোচনা করি। এবার মজা বোঝো!'

'চুপ!' রাগের লাগাম টেনে রেখেছে কেয়া, গলার আওয়াজটা কর্কশ শোনাল। ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। এক পা এক পা করে এগিয়ে শাহেদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে তার। 'কিভাবে হারালে তাকে? তার ওপর থেকে চোখ ফেরাতে নিষেধ করেছিলাম তোমাকে। কি হয়েছে বলো।'

গড় গড় করে বলে গেল শাহেদ, 'নিজের ফ্ল্যাটে ফিরল সে। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলাম আমি। ঘরের আলো নিভে গেল দেখে ভাবলাম শুয়ে পড়েছে। কিছু খাওয়া হয়নি আমার, তাই কাছের একটা রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসলাম। মিনিট পনেরো-র বেশি ছিলাম না ওখানে। তারপর সারাটা রাত ফ্ল্যাটের বাইরে পাহারায় থেকেছি। কিন্তু সকালে তাকে বেরুতে দেখলাম না। নিশ্চয়ই আমি যখন রেস্তোরাঁয় গিয়েছিলাম...'

হিসহিস করে উঠল কেয়ার কণ্ঠস্বর, 'আমাকে টেলিফোন করোনি কেন? খাদ ভরাট করার এতই তাগাদা অনুভব করলে, একটা খবর পর্যন্ত দেবার কথা মনে পড়ল না? ওই সময়টা ফ্ল্যাটের ওপর আকরাম নজর রাখতে পারত। তোমার মাথায় কি শুধুই গোবর ভরা, মগজ একটু খেলাতে পারো না?'

'আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালাতে পেরেছে ডিউক, তার জন্যে সেটা ভালই হয়েছে,' মুখটাকে গোমড়া করে তুলে বলল শাহেদ। 'আজ সকালে আমি যখন ফ্ল্যাটের ওপর নজর রাখছি, ওখানে পুলিস এসেছিল। গোটা এলাকা ঘেরাও দিয়েছে ওরা।'

কেয়া এবং আকরাম দু'জনেই চমকে উঠল।

'পুলিস?' ফিসফিস করে বলল কেয়া।

'হ্যাঁ। ভাগ্যটা নেহাতই ভাল, তাই একটুর জন্যে ওদের চোখে পড়ে যাইনি।'

'দেখলে তো?' আকরামের গলা থেকে বিজয়োল্লাস বেরিয়ে এল। 'বলিনি? চেহারার বর্ণনা থেকেই ডিউককে চিনে নিয়েছে ওরা! এখন শুধু তার ধরা পড়াটা বাকি।'

'এখনও পড়েনি।' বলল বটে, কিন্তু চিন্তার রেখা ফুটে উঠল কেয়ার কপালে।

'এর বেশি আর কিছু করার ছিল না আমার,' বলল শাহেদ। এদের দু'জনের কাছ থেকে সরে যেতে পারলে বাঁচে সে। 'আমি এখন ঘুমাতে যাব। সারারাত জেগে শরীরের বারোটা বেজে গেছে। তোমরা দু'জন মিলে ঠিক করো এরপর কি করব আমরা।'

'ডিউককে ফিরে পাবার আশা না করাই ভাল,' তিক্ত কণ্ঠে বলল আকরাম। 'আমাদের টাকা মেরে দিয়ে পালিয়েছে সে। এখন তার পিছনে পুলিস লেগেছে, আমাদের ব্যাপার নিয়ে থোড়াই মাথা ঘামাবে।' বাঁকা চোখে কেয়ার দিকে তাকাল একবার। 'এসো, আবিদকে আমরা নিজেরাই খুঁজে বের করি। এক হপ্তা আগেই কাজটা শুরু করা উচিত ছিল আমাদের। আজ আমি নিজেই শামিমা আখতারের সাথে দেখা করব।'

'তাকে নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া করে লাভ নেই আর,' কিছু না ভেবেই বলে বসল শাহেদ। 'সে মারা গেছে।' বলেই বুঝল, মারাত্মক ভুল করে ফেলেছে সে। মুখের রঙ বদলে গেল। নিজের ওপর রাগে দিশেহারা বোধ করল সে।

'মারা গেছে?' কর্কশ শোনাল কেয়ার কণ্ঠস্বর। তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকল শাহেদের দিকে। 'তুমি জানলে কিভাবে?'

'ডিউক বলেছে,' বলল শাহেদ। জানে, মিথ্যে বললে সাংঘাতিক ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাবে।

'ডিউক?' কেয়া আকরামের দিকে তাকাল, আকরাম কেয়ার দিকে। 'কখন সে এ-সব কথা বলল তোমাকে?'

জানালার দিকে সরে গেল শাহেদ। পকেট থেকে প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট তুলল ঠোঁটে। এই ফাঁকে দ্রুত চিন্তার সুযোগ পেয়ে গেল। কিন্তু যে ভুলটা করে ফেলেছে সেটা সংশোধনের কোন উপায় দেখল না সে। বলল, 'গতরাতে। রাস্তায় তার সাথে আমার কয়েক সেকেন্ডের জন্যে দেখা হয়েছিল। বলল সে নাকি শামিমার বাড়িতে গিয়েছিল...'

'থামো!' প্রায় গর্জে উঠে শাহেদকে বাধা দিল আকরাম। 'কথাটা তুমি প্রথমেই আমাদেরকে বলোনি কেন?'

সিগারেট ধরাবার সময় লক্ষ্য করল শাহেদ, হাত দুটো কাঁপছে তার। 'মুখ খোলার সুযোগ দাও আমাকে।' চেহারায় বিরক্তির ছাপ টেনে নিয়ে এসে বলল সে। 'বলতেই তো যাচ্ছিলাম...'

'তাই কি? বলতে যাচ্ছিলে, নাকি মুখ ফস্কে বেরিয়ে পড়ল? বলছ, মারা গেছে। কিভাবে মারা গেছে? ঘটনাটা কি?'

'ডিউকের ধারণা আবিদ তাকে খুন করেছে।'

কেয়া এবং আকরাম দু'জনেই পাথরের মত শক্ত হয়ে গেল।

নিজের অজান্তেই কেয়ার একটা হাত গলায় উঠে গেল, যেন দম আটকে আসছে তার। 'কেন? ডিউক তা ভাবছে কেন?'

ইতিমধ্যে বেশ খানিকটা সাহস ফিরে পেয়েছে শাহেদ। শান্ত সুরে বলল, 'শামিমার বাড়িতে গিয়েছিল ডিউক। তার ধারণা ওখানে গা ঢাকা দিয়ে ছিল আবিদ। শামিমাকে আবিদ সম্পর্কে কথা বলতে রাজি করায় ডিউক। ওদের কথা

আড়াল থেকে সব শুনে ফেলে আবিদ, অন্তত ডিউকের তাই ধারণা। কিছু একটা নিয়ে আসার জন্যে দোতলায় উঠে যায় শামিমা। নিচে থেকে তার চিৎকার শুনতে পায় ডিউক। হলে ঢুকে দেখে সিঁড়ির নিচে পড়ে আছে শামিমা, তার ঘাড় ভেঙে গেছে। ডিউক বলছে, আবিদেরই কাজ এটা। তা নয় তো কি? শামিমাকে আর কে খুন করতে পারে?'

এগিয়ে এসে শাহেদের সামনে দাঁড়াল আকরাম। 'আর কি জানো তুমি, শাহেদ? আর কি লুকাচ্ছ?'

আকরামের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি সহ্য করতে পারল না শাহেদ, অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। 'কি আশ্চর্য, লুকাব কেন!'

'নিশ্চয়ই লুকাচ্ছ! তা না হলে তোমার চেহারা চোরের মত দেখাচ্ছে কেন?' দু'কোমরে হাত রাখল আকরাম। 'মেয়েটা দোতলায় গেল কেন?'

'আমি কি করে জানব? ডিউক আমাকে অতশত বলেনি।'

'তুমি জিজ্ঞেস করোনি কেন? নাকি জিজ্ঞেস করেছ, কিন্তু আমাদের কাছে স্বীকার যাচ্ছ না?'

'দেখো, তোমরা যদি আমাকে...' শেষ করতে পারল না শাহেদ, বাধা দিল কেয়া।

'ঠিক আছে, শাহেদ,' শান্ত ভাবে বলল সে। 'যাও শুয়ে পড়োগে তুমি। আর কিছু বলার নেই তোমাকে।'

'নেই মানে?' বোমার মত বিস্ফোরিত হলো আকরাম। 'মিথ্যে কথা বলছে ও, জেনেও এত সহজে ছেড়ে দেব? ওর চামড়া ছাড়িয়ে লবণের ছিটে না দিই তো নিজের নাম বদলে রাখব আমি! ও একটা মিনমিনে শয়তান, ওকে আমি কোনদিন বিশ্বাস করতে পারিনি। কি লুকাচ্ছে বলুক, তা না হলে আজ ওর একদিন কি আমার একদিন...'

'মুখ সামলে কথা বলো, আকরাম!' সতর্ক হয়ে উঠল শাহেদ। বিপদের আভাস পেয়ে গেছে সে। 'ডিউককে শামিমা কি বলেছে না বলেছে তা আমার জানার কথা নয়। ডিউককে তোমরা চেনো!'

'ওকে যেতে দাও, আকরাম,' বলল কেয়া।

'অসম্ভব।' গর্জে উঠল আকরাম। 'এর আমি শেষ দেখে ছাড়ব।'

'জাহান্নামে যাও!' চিৎকার করে বলল শাহেদ। ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগোল সে।

'শাহেদ!'

আকরামের গলায় এমন কিছু ছিল, থমকে দাঁড়িয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে পিছন দিকে না তাকিয়ে পারল না শাহেদ। মুখের সামনে কুৎসিত মাউজারের মাজল দেখতে পেল সে।

'দাঁড়াও তুমি,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল আকরাম। 'তোমাকে আমি...

'পিস্তল সরাও!' চাপা গলায় সাবধান করে দিল কেয়া। 'কে যেন আসছে...!'

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল সেই বুড়ো লোকটা। হাতে একটা ইত্তেফাক রয়েছে, খুশিতে আত্মহারা শিশুর মত তিনজনের সামনে নাড়ল সেটা। 'দেখুন দেখি

কাণ্ড! আমি পেপার খুঁজে মরছি, ওদিকে এক ব্যাটা বেয়ারা ছাদে বসে এটার ওপর কাগজ রেখে ওয়াইফকে চিঠি লিখছে!' আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল সে, হঠাৎ মাউজারটা দেখতে পেয়ে চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে গেল। ঝুলে পড়ল মুখ, দ্রুত একে একে তাকাল তিনজনের দিকে। বোকা বোকা দেখাল তাকে। নিচু গলায়, প্রায় ফিসফিস করে জানতে চাইল, 'এসব কি ব্যাপার? আপনারা···আপনারা···'

চট করে মাউজারটা পকেটে ভরে ফেলল আকরাম। মারমুখো ভঙ্গিতে বুড়োর দিকে এক পা এগোল সে।

'আকরাম!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল কেয়া।

পিছুতে শুরু করল বুড়ো। 'কি—কি—কি···' আকরামের চোখের দিকে সম্মোহিতের মত তাকিয়ে আছে, পিছিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। হাতের কাগজটা দোর-গোড়ায় ফেলে দিয়ে বেরিয়ে গেল সে। ছুটল। ক্রমশ দূরে মিলিয়ে গেল তার পায়ের আওয়াজ।

ঝাড়া তিন সেকেন্ড নড়ল না কেউ। তারপর রুদ্ধশ্বাসে বলল কেয়া, 'সর্বনাশ করেছ তুমি! সবাইকে বলে দেবে ও। এখুনি কেটে পড়তে হবে। জলদি! ওপরে গিয়ে যে যার ব্যাগ গুছিয়ে নিই, চলো।'

'ভয়ে আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হয়ে গেছে বুড়োর,' তাচ্ছিল্যের সাথে বলল আকরাম। 'ঘর থেকে সারাদিন আজ বেরই হবে না ও। পালাবার কোন্ দরকার নেই।' কিন্তু চেহারা দেখে বোঝা গেল, ঘাবড়ে গেছে সে-ও।

'যা বলছি করো!' খেঁকিয়ে উঠল কেয়া। 'ওপরে গিয়ে সব গুছিয়ে নাও! পুলিসকে যদি বলে দেয়···' দ্রুত আকরামকে পাশ কাটিয়ে প্যাসেজে বেরিয়ে এল সে। বুড়ো লোকটাকে কোথাও দেখল না ছুটল সিঁড়ির দিকে।

'কথায় কথায় পিস্তল বের করো! এখন?' রাগে, ভয়ে ঘামতে শুরু করেছে শাহেদ। 'তুমি একটা ইডিয়েট।' বলে প্যাসেজে বেরিয়ে এল সে। তাকে অনুসরণ করল আকরাম। বিড়বিড় করে কি যেন বলছে সে।

'জলদি! জলদি!' সিঁড়ির মাথা থেকে ওদেরকে বলল কেয়া। 'বুড়ো নিশ্চয়ই খবর দিতে গেছে। জলদি এসো।'

লাফ দিয়ে সিঁড়ির ধাপ টপকাতে শুরু করল ওরা। রিসেপশন ডেস্কের পাশে টেলিফোন-ঘর রয়েছে, সেখানে একবার উঁকি দেবার কথা কারও মনে পড়ল না। ওদের পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল বুড়ো, কিন্তু ভয় পাবার কোন কারণ দেখল না—শব্দগুলো সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাচ্ছে। হাত কাঁপছে তার, থানার নাম্বারে ডায়াল করতে বারবার ভুল হয়ে যাচ্ছে। আপনমনে বিড়বিড় করছে সে। পিস্তল! এত থাকতে হোটেল পুবালিতে সে যদি সময়মত লাউঞ্জে না ঢুকত, খুন হয়ে যেত একজন লোক। এক সেকেন্ড দেরি হলে, হয়তো তাকেও গুলি করত লোকটা। কাঁপা আঙুল দিয়ে আবার থানার নাম্বারে ডায়াল করতে শুরু করল সে।

যে যার কামরা থেকে একসাথে বেরিয়ে এল ওরা, প্রত্যেকের সাথে একটা করে লেদার সুটকেস। ম্যাক্সি বদলে শাড়ি পরেছে কেয়া। আকরাম আর শাহেদও কাপড় পাল্টেছে। দু'জনেই হালকা ঘিয়ে রঙের প্যান্ট আর সাদা শার্ট পরেছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়াল ওরা। চেহারা দেখে মনে হয় না ওদের মধ্যে কোন্ বিরোধ আছে। একসাথে দাঁড়াবার ভঙ্গির মধ্যে একতার একটা ভাব স্পষ্ট হয়ে আছে। সেই যুদ্ধের সময়কার স্মৃতি মনে পড়ে গেল শাহেদের। একজন আরেকজনের জন্যে প্রাণ দিতে ব্যগ্র হয়ে থাকত ওরা। শত্রু নিধনের জন্যে সবাই একপায়ে খাড়া। আকরাম যে খানিক আগে ওর দিকে পিস্তল তুলেছিল, কথাটা বেমালুম ভুলে গেছে সে। অনেক দিন পর আজ আবার উত্তেজনা অনুভব করছে। এই অ্যাডভেঞ্চার চিরকাল ভাল লাগে তার।

টুক্ করে একটা শব্দ, একটু ফিসফাস বা খসখস কিছুই নেই, গোটা হোটেল নিস্তব্ধ হয়ে আছে। সিঁড়ির নিচে লাউঞ্জটা ফাঁকা। অথচ তিনজনই অনুভব করল, ওদের ওপর নজর রাখা হয়েছে। জিনিস-পত্র গোছগাছ করে সুটকেসে ভরতে একটু বেশি সময় লেগে গেছে ওদের। ওদের মনে হলো, তিনজনের দলটাকে ফাঁদে আটকাবার জন্যে এই দশ মিনিটে ব্যাপক আয়োজন করা হয়েছে। শাহেদ রোমাঞ্চ অনুভব করলেও, আকরাম মনে মনে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে। এই ঘটনার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত মোটামুটি আয়ত্তের মধ্যে ছিল সব। কিন্তু তার বোকামির জন্যে নিরাপত্তার পাঁচিলটা ভেঙে পড়েছে হুড়মুড় করে। পুলিস এখন জানবে, তার কাছে একটা বেআইনী পিস্তল আছে। পুলিস সেটা উদ্ধার করার জন্যে উঠে পড়ে লাগবে। প্রাণ হারাবার চেয়ে বেশি ভয় তার গ্রেফতার হওয়াকে। পুলিসের হাতে পড়া মানে আবার জেলের ঘানি টানা। চোদ্দ শিকের ভেতর ঢোকার চাইতে আত্মহত্যা করা তার কাছে ঢের ভাল। কারণ, আবিদের ওপর প্রতিশোধ না নিয়ে বেঁচে থাকার কোন মানে হয় না। কাজেই, যে-কোন অ্যাকশনের জন্যে নিজেকে তৈরি করে নিয়েছে সে। তার দৃষ্টিতে মুক্তিযুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি। বাংলাদেশের মাটিতে আবিদ যতদিন বেঁচে আছে, ততদিন এই দেশ তার জন্যে স্বাধীন নয়। নিজে খুন হতে আপত্তি নেই, আপত্তি নেই আরও কাউকে খুন করতে, কিন্তু পুলিসের হাতে ধরা পড়তে সত্যিই আপত্তি আছে তার।

তার এই মনোভাব পরিষ্কার টের পেয়ে গেল কেয়া। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে আকরাম কি রকম ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে, সে-অভিজ্ঞতা আছে তার। জানে, তার কাছ থেকে পিস্তলটা আদায় করা এখন আর সম্ভব নয়। দরকার হলে কেয়াকে গুলি করবে আকরাম, কিন্তু পিস্তল হাতছাড়া করবে না। এখন একমাত্র আশা, ভাগ্য হয়তো ওদেরকে সহায়তা করবে, ভালয় ভালয় হোটেল থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে।

সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল কেয়া। কয়েক সেকেন্ড পর তাকে অনুসরণ করল আকরাম। সবার পিছনে শাহেদ। কোন রকম তাড়াহুড়ো না করে, নিঃশব্দে নামছে ওরা। তিনজনের মনেই দ্বিধা, জানে না এরই মধ্যে ওদের জন্যে ফাঁদ পাতা হয়ে গেছে কিনা। হঠাৎ কি মনে হতে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাতেই সিঁড়ির মাথার কাছ থেকে একটা ছায়াকে দ্রুত সরে যেতে দেখল শাহেদ।

সিঁড়ির অর্ধেকটা নেমে এসেছে কেয়া, এই সময় সেই বুড়োকে দেখতে পেয়ে থমকে গেল সে। রেসিডেন্টস লাউঞ্জের দোর-গোড়ায় এসে দাঁড়াল লোকটা। কেয়াকে সে-ই আগে দেখতে পেল, দেখেই দ্রুত পিছিয়ে গিয়ে চোখের আড়াল

হয়ে গেল। কিন্তু কবাটের ফাঁকে তার জুতো পরা পা দেখা যাচ্ছে, তারমানে ওখানেই লুকিয়ে আছে।

হোটেলের ম্যানেজার তার কামরা থেকে বেরুতে সাহস পায়নি, পুলিসের জন্যে অপেক্ষা করছে সে। ঘরের ভেতর থেকেই সবাইকে বলে দিয়েছে, কেউ যেন তিনজনের দলটাকে বাধা না দেয়। হোটেলের ভেতরে গোলাগুলি হোক, তা সে চায় না।

পাবলিক লাউঞ্জে নেমে এল ওরা তিনজন।

'এসো,' ফিসফিস করে বলল কেয়া। আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেছে তার। পুলিস এখনও এসে পৌঁছায়নি, বুঝতে পেরেছে সে। পাবলিক লাউঞ্জ পেরিয়ে আরেকটা সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়াল। পর্দা সরিয়ে নিচে তাকাল। কেউ নেই সিঁড়িতে। নিচের মেইন এন্ট্রান্সের কাছেও নেই কেউ। নিচে নেমে বেরিয়ে যেতে পারলেই এ-যাত্রা বেঁচে যাবে ওরা।

ধাপ বেয়ে নামতে শুরু করবে কেয়া, এই সময় সুইং ডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকল পুলিস। মাত্র দু'জন, কিন্তু দু'জনকে দেখেই জ্ঞান হারাবার মত অবস্থা হলো কেয়ার। মুখ তুলে পুলিস দু'জন তার দিকেই তাকিয়ে আছে। তাদের একজন বলল, 'ওখানেই দাঁড়ান, প্লীজ!' বলেই সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত উঠতে শুরু করল সে।

কেয়ার সারা শরীরে আতঙ্কের ঢেউ বয়ে গেল। নড়ার শক্তি পেল না সে। ইচ্ছে হলো ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটতে শুরু করে, কিন্তু পারল না। জানে, ওপর থেকে পালাবার কোন উপায় নেই। পরাজয় মেনে নিতে যাচ্ছে কেয়া, এই সময় আকরামের হাতে গর্জে উঠল মাউজার।

চোখের পলকে ঘটে গেল ঘটনাটা। বুকে গুলি খেয়ে সিঁড়ির ধাপের ওপরই লুটিয়ে পড়ল পুলিস অফিসার।

গুলির পর আবার জমাট নিস্তব্ধতা নেমে এল হোটেল পুবালিতে।

প্রতিশোধ-২

প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর, ১৯৮২

এক

'মারা গেছে?' চমকে গেল রানা।

'কেন, আপনি জানেন না?' মৃদু কণ্ঠে বলল টিনা রহমান।

প্রচণ্ড একটা ঝাঁকির মত লাগল বিস্ময়ের ধাক্কাটা। টিনা রহমানের মুখের দিকে বোকার মত তাকিয়ে থাকল রানা। পরমুহূর্তে সন্দেহ জাগল মনে, মিথ্যে কথা বলছে না তো? আবিদকে যে খোঁজা হচ্ছে তা হয়তো জানে মেয়েটা, মারা যাবার মিথ্যে খবর রটিয়ে ভাইকে বাঁচাতে চায়?

টিনার পরা বাংলাদেশী প্রিন্টের শাড়িতে নীল আর সাদা ফুলের জটিল নকশা, সেদিকে তাকিয়ে থেকে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করল রানা। 'দুঃখিত,' শান্ত সুরে বলল ও। হ্যাটটা পরল আবার। 'আমি জানতাম না। জানলে আপনাকে বিরক্ত করতে আসতাম না...' অনিচ্ছাসত্ত্বেও জটিল নকশা থেকে চোখ তুলে আবার টিনা রহমানের মুখে তাকাল।

'না-না, বিরক্ত হবার কি আছে,' তাড়াতাড়ি বলল টিনা, রানার অস্বস্তি দূর করার জন্যে তার হাবভাবে একটা ব্যস্ততা প্রকাশ পেল। 'দেড় বছর তো আর কম সময় নয়। প্রথম প্রথম ওর অভাব সাংঘাতিক কষ্ট দিত। কিন্তু মানুষ তো আর অতীত নিয়ে বাঁচে না!'

'তা ঠিক,' বলল রানা। আর কি বলা উচিত বা এরপর আরও কি শুনতে হবে, কিছুই জানা নেই। রেনকোটটা হাত বদল করল ও। 'মনটা খারাপ হয়ে গেল। ঠিক আছে, আপনাকে আর দাঁড় করিয়ে রাখব না, আমি চলি।'

'না-না, সে কি!' ব্যস্ত হয়ে উঠে বলল টিনা রহমান। 'এভাবে দোরগোড়া থেকে চলে যাবেন তা কি করে হয়। আসুন, ভেতরে আসুন। আপনিও বুঝি এয়ারফোর্সে ছিলেন?'

'না। তবে আবিদ এয়ারফোর্সে থাকার সময়ই ওর সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল,' সাবধানে শব্দগুলো বাছাই করে, ভেবেচিন্তে কথাগুলো বলল রানা। 'ওকে ভাল লাগত, সেজন্যেই ওর কথা ভুলতে পারিনি। আমার নাম সায়েম—সায়েম চৌধুরী। আমি বরং ফিরেই যাই, শুধু শুধু আপনার সময় নষ্ট হবে...'

পিছিয়ে গেল টিনা, দরজাটা সবটুকু খুলে দিল। 'হবে না। আপনি আসুন তো!'

হ্যাটটা হাতে নিয়ে একটা অফিস কামরায় ঢুকল রানা। পাশের ঘরে ঢোকার দরজাটা খোলা, চেহারা দেখে বোঝা গেল, ওটা একটা স্টুডিও। এক ধারে একটা

ইজেলও খাড়া করা রয়েছে। ভেতরে আবছা অন্ধকার মত, তবু ইজেলের অসমাপ্ত ছবিটা দেখতে পেল। বুক খুলে একজন মা তার শিশুকে দুধ দিচ্ছে। শিল্প সম্পর্কে তেমন কিছু বোঝে না রানা, কিন্তু মায়ের নিঃসঙ্কোচ, সাদাসিধে অথচ বলিষ্ঠ মুখাবয়বের সাথে আশ্চর্য একটা মিল খুঁজে পেল টিনা রহমানের। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল ও। দরজা পেরিয়ে ঢুকে পড়ল স্টুডিওতে। ইজেলের সামনে দাঁড়িয়ে ভাল করে দেখল ছবিটা। ছবিতে যে মেয়েটা রয়েছে তার বয়সও অল্প বটে, কিন্তু তার চেহারার সাথে টিনা রহমানের কোন মিল নেই। একটু যেন নিরাশই হলো রানা। তবে লক্ষ করল, চোখ এবং তাকাবার ভঙ্গি টিনা রহমানের সাথে মিলে যায়।

পায়ের আওয়াজ হলো।

'সুন্দর,' বলল রানা। 'আপনার আঁকা?'

'হ্যাঁ।' রানার পাশে এসে দাঁড়াল টিনা। হাত দুটো বুকে ভাঁজ করে তাকিয়ে থাকল ছবিটার দিকে। তার মধ্যে যে নিঃসঙ্কোচ, বলিষ্ঠ একটা ভাব আছে এই মুহূর্তে আবার সেটা নতুন করে আবিষ্কার করল রানা। এত কাছে দাঁড়িয়েছে, গায়ে গা ঠেকে যেতে পারে। কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ ছবি দেখার পর একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল টিনা। বলল, 'আজ আবিদ বেঁচে থাকলে এই ছবি দেখে একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত। ছোট বোনটিকে সে-ই তো হাতে ধরে আঁক কাটতে শিখিয়েছিল।'

নগ্নবক্ষা মায়ের চোখ দুটো রানার জন্যে অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াল। বড় বেশি সরল আর অন্তর্ভেদী ওগুলো। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে স্টুডিওর চারদিকে তাকাল ও। পরিষ্কার, ঝকঝক করছে সব। একদিকের প্রায় সবটুকু দেয়াল জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা বুক-কেস, তাতে রাজ্যের বই। ইজেলের কাছ থেকে দূরে এক সাথে খানকয়েক কাঠের চেয়ার, পাশেই একটা ডিভান। দেয়ালের ওপর দিকে অনেকগুলো পেইন্টিং, দেখেই বুঝল, টিনারই আঁকা। সব ছবিতেই গাঢ় রঙ ব্যবহার করা হয়েছে, শক্ত হাতে ধরা নিষ্কম্প তুলির টান রেখাগুলোর মধ্যে আশ্চর্য একটা দৃঢ়তা আর কাঠিন্যের ভাব এনে দিয়েছে। এই রকম ছোটখাট সাদাসিধে চেহারার একটা মেয়ে কোত্থেকে এত শক্তি পায় ভেবে অবাকই লাগল রানার। মেয়েটার ভেতর প্রচণ্ড একটা মনের জোর সুপ্ত হয়ে আছে, সন্দেহ নেই। অনেক মানুষের চেহারা দেখে ব্যক্তিত্ব বোঝা যায় না, বুঝতে হলে তার কাজের সাথে পরিচয় থাকতে হয়। টিনা রহমানের ব্যক্তিত্ব যে অত্যন্ত প্রখর, বিনা তর্কে মেনে নিল সেটা রানা।

কেমন যেন আড়ষ্ট বোধ করছে ও। কি বলবে কি করবে কিছুই ঠিক করতে পারছে না। কিন্তু মেয়েটা যে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বোধ করছে, সেটা বুঝল, ওকে সে সহজেই ভাইয়ের বন্ধু বলে মেনে নিতে পেরেছে। আচরণে কোনরকম দ্বিধা বা অস্বস্তি নেই।

'ঠিক কি সূত্রে ওর সাথে আপনার পরিচয় হয়েছিল বলুন তো?' হঠাৎ জানতে চেয়ে দ্রুত ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল টিনা। অস্বস্তির সাথে লক্ষ করল রানা, ইজেলে আঁকা মেয়েটার মতই টিনার চোখ জোড়াও বড় বেশি সরল আর অন্তর্ভেদী।

'একটা কাজে এয়ারবেসে যেতে হত আমাকে,' বলল রানা। 'পরিচয় হয়

ক্যান্টিনে। আমি বাঙালী জানতে পেরে ও-ই নিজে এসে আলাপ করে। প্রায় রোজই একবার করে আমাকে যেতে হত, ফলে ওর সাথে আমার একটা বন্ধুত্ব মত হয়ে যায়। হঠাৎ একটা ঠেকায় পড়ে গিয়ে ওর কাছ থেকে পাঁচশো টাকা ধার করেছিলাম আমি। কিন্তু সেটা আর ফেরত দেয়া হয়নি। অ্যাদ্দিন পাকিস্তানে আটকা পড়েছিলাম, তাই ওর খোঁজ পাইনি। টাকাটা ফিরিয়ে দেবার জন্যেই আমার আসা…'

'দাঁড়িয়ে কেন, বসুন,' একটা আর্মচেয়ার দেখিয়ে বলল টিনা। একটু অন্যমনস্ক দেখাল তাকে। ধীরে ধীরে বলল, 'আবিদকে চেনে এমন কারও সাথে অনেক বছর পর দেখা হলো আমার। এখন মনে হচ্ছে ওর বন্ধু-বান্ধবদের সাথে একটা যোগাযোগ রাখা উচিত ছিল আমার…বসুন না! কি খাবেন বলুন? চা, না কফি?'

'ওসব ঝামেলা করতে যাবেন না, প্লীজ,' বলল রানা। 'যদি অনুমতি করেন তো আমি একটা সিগারেট ধরাই।'

ইজেলের পাশের টেবিল থেকে গোল্ডলিফের একটা খোলা প্যাকেট তুলে রানার দিকে বাড়িয়ে দিল টিনা। রানা বসল দেখে ওর সামনের একটা চেয়ারে সে-ও বসল। জানতে চাইল, 'কিন্তু আপনি আমার ঠিকানা পেলেন কোথায়?'

'দেশে ফিরেই মনে পড়ে গেল, আবিদ আমার কাছ থেকে টাকা পাবে। তার মানে ওর সাথে দেখা করার একটা অজুহাত পেয়ে গেলাম। টেলিফোন গাইডে ওর নাম পাব মনে করে অনেক খোঁজাখুঁজি করলাম, কিন্তু পেলাম না। তার বদলে পেলাম আপনার নাম। টিনা রহমান আবিদুর রহমানের বোন হতে পারে মনে করে আন্দাজে একটা ঢিল ছুঁড়লাম,' কথার সাথে হাসি জুড়ে দিয়ে বলল রানা, 'ঢিলটা যে ঠিক জায়গা মত গিয়ে লাগবে তা কিন্তু আমি মোটেই আশা করিনি।' একটু থেমে কথাগুলো গুছিয়ে নিল ও, তারপর আবার বলল, 'টিনা নামে ওর যে একটা বোন আছে সেটা অবশ্য আমি ওর মুখেই শুনেছিলাম।'

পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে নড়েচড়ে বসল টিনা। সোজা রানার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, 'আমার কথা কি বলেছিল ও?' এই প্রথম মেয়েটার চেহারায় চাপা একটা উত্তেজনা লক্ষ্য করল রানা।

'এত দিন পর সব কথা আজ আর আমার মনে নেই,' বলল রানা। যতটুকু না বললেই নয় তার বেশি মিথ্যে কথা বলতে চায় না ও। সত্যি কথাগুলো গোপন করে রাখতে এমনিতেই হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে, সহজভাবে তাকাতে পারছে না টিনার চোখে। আবিদকে কেন খুঁজছে, আসল কারণটা বলে ফেলার একটা ঝোঁক মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চাইল মনের ভেতর। ইচ্ছে হলো, কেয়া, আকরাম আর শ্মহেদের কথা গড়গড় করে সব বলে ফেলে। অনেক কষ্টে নিজেকে দমিয়ে রাখল সে। বলল, 'ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে আলাপ করার সময় আপনার নামটা ওর মুখে শুনি আমি। কি কারণে জানি না নামটা মনে ছিল, ভুলে যাইনি। বোধহয় টিনা নামটা ছোট আর সুন্দর বলেই।'

'অথচ নামের পিছনের মানুষটা সম্পর্কে কি বলেছিল সে, আজ আর তা আপনার মনে নেই?' একটু মনঃক্ষুণ্ণ দেখাল টিনাকে। 'কি বলেছিল জানতে পারলে…'

আর কি মিথ্যে বলা যায়, মনের আনাচে কানাচে হাতড়াতে শুরু করল রানা। 'বিশ্বাস করুন, পরিষ্কার মনে করতে পারছি না। বোধহয়···মানে, আপনি দেখতে কেমন বা ওই ধরনের কোন প্রসঙ্গে কিছু একটা বলেছিল আবিদ। যতদূর মনে পড়ে, আমি ওকে বলেছিলাম, আপনি দেখতে খুব সুন্দর, ইউরোপিয়ানদের মত। উত্তরে হেসে উঠেছিল আবিদ, তারপর বলেছিল··· আমার ভুলও হতে পারে—বলেছিল, আমার বোন কিন্তু বাঙালী মেয়েরা যেমন দেখতে হয় তেমনি, কিন্তু আমার চেয়ে সুন্দর।'

সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে রানার মুখে তাকিয়ে থাকল টিনা। 'এ ধরনের কথা বলতে পারে না আবিদ। ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি বুঝতে পেরেছি। আসলে জানতে চাওয়াটাই উচিত হয়নি আমার।'

'দুঃখিত,' তাড়াতাড়ি বলল রানা। 'বানিয়ে কিছু বলতে চাইনি আমি, বোকা মাথাটা থেকে ফট করে বেরিয়ে গেছে। আসলে, আপনার সাথে দেখা হবে সেটা ভাবিনি কিনা, কেমন যেন অপ্রস্তুত বোধ করছি।' প্রসঙ্গ বদল করে জানতে চাইল, 'আচ্ছা, আবিদ মারা গেল কিভাবে? নাকি এ-ব্যাপারে কিছু বলতে আপনার খারাপ লাগবে?'

'না, তা নয়।' চেয়ারে হেলান দিল টিনা। চোখ দুটো হঠাৎ করেই যেন জ্যান্ত হয়ে উঠল, সজীব হয়ে উঠল মুখের চেহারা। 'আবিদের কথা বলার সুযোগ হয় না, কেউ জিজ্ঞেস করলে তবে তো! আমার চেয়ে বছর কয়েকের বড় হলেও, আদর দিয়ে মাথায় তুলেছিল আমাকে, তাই তুই বলতাম ওকে। মা বলুন, বাবা বলুন, বন্ধু বলুন ওই ছিল আমার সব। এই যে স্বাধীনভাবে একা রয়ে গেছি আজও আমি, বলতে পারেন, সেটাও ওর কারণে। আবিদ নেই বলেই, আমার কোন উচ্চাশা বা স্বপ্ন নেই, কোন প্ল্যান নেই, ঘর বাঁধার উৎসাহ নেই, কিছুই নেই। আবিদ নেই বলে যেন আমিও নেই।' হঠাৎ কেমন যেন থতমত খেয়ে গিয়ে চুপ করে গেল সে। তারপর দ্রুত বলল, 'দেখুন তো, কি সব আবোল-তাবোল বকছি!'

'না, কে বলল! বলে যান!'

'তার চেয়ে বরং আবিদের কথা বলি আপনাকে। এয়ারফোর্স থেকে কিভাবে পালিয়ে গিয়েছিল, চিঠিতে সব জানায় আমাকে ও। চিঠিটা এক বাঙালী পরিবারের হাতে দেয় ও, তারা পাকিস্তান থেকে ভারত হয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে আসে। আরও লিখেছিল ফিরোজ চৌধুরীর কথা। তার একটা গেরিলা দলে যোগ দেয় ও। ওকে নিয়ে নয়জন ছিল গেরিলা দলে। লাইন থেকে ট্রেন ফেলে দিত ওরা। সারা চিঠিতে ফিরোজ চৌধুরীর কথাই বেশি ছিল। তার মত বিবেচক, বুদ্ধিমান, সাহসী যোদ্ধা নাকি সচরাচর দেখা যায় না। চিঠিতে বাকি সাতজন সম্পর্কেও অনেক কথা লিখেছিল ও। বিভিন্ন জেলার লোক ছিল ওরা। ফিরোজ চৌধুরী আর রেন্টু ছিল বরিশালের, কেয়া আর সাজিয়া, এরা ছিল ঢাকার মেয়ে। জাফর আর আকরাম ছিল রাজশাহীর, ঢাকার ছেলে ছিল দু'জন, মনসুর আর আবিদ। আরেকজনের নাম···দাঁড়ান মনে করি···।' খানিকক্ষণ চিন্তা করে নামটা মনে করতে চেষ্টা করল টিনা, তারপর হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার চেহারা। 'মনে পড়েছে। সে ছিল দিনাজপুরের, নামটা যতদূর মনে করতে পারছি—শাহেদ। মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে

বেশি কথা লিখেছিল কেয়া সম্পর্কে। মেয়েটার এত প্রশংসা করেছিল, সন্দেহ হয়েছিল, ও বোধহয় কেয়ার প্রেমেই পড়ে গেছে। যাই হোক, পরে খবর পেলাম, দলটা ধরা পড়ে গেছে। তারপর আর কোন খবর পাইনি, তবে দেশ স্বাধীন হবার ক'দিন পরই সশরীরে ফিরে আসে আবিদ। কিন্তু ওর দল সম্পর্কে বা বন্ধু-বান্ধব সম্পর্কে এরপর আর কোন কথা মুখে আনেনি ও। কারণটা বুঝতে পারিনি আমি। প্রসঙ্গটা তুললেই কেমন যেন গম্ভীর, আনমনা হয়ে যেত ও। একদিন তো আমাকে বলেই বসল, ওসব কথা আর তুলবি না কখনও! যা ঘটেছে আমি ভুলে যেতে চাই।'

টিনা মিথ্যে কথা বলছে, এখন তা আর মনে হলো না রানার। জানতে চাইল ও, 'মারা গেল কিভাবে?'

'ক্যানসারে।' খানিক চুপ করে থাকার পর আবার বলল টিনা, 'দেশে ফেরার পর থেকে কোন কাজ-কর্ম করেনি। বলত, ভাল লাগে না। ঘরেই চুপচাপ বসে থাকত। কি যে হয়েছিল ওর, আজও একটা রহস্য হয়ে আছে আমার কাছে।'

'মারা যে গেছে তাতে তো কোন সন্দেহ নেই, তাই না?' টিনার চোখে চোখ রেখে জানতে চাইল রানা। 'মানে, আমি বলতে চাইছি, দুনিয়ায় অনেক আজব ব্যাপারই তো ঘটে...'

'তার মানে? আপনার কথা আমি ঠিক...'

আরও কতটা কি জানে টিনা, বুঝতে চায় রানা। বলল, 'দিন কয়েক আগে আপনার ভাইয়ের কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম একজনকে। আবিদের এক বান্ধবী, শামিমা আখতার।' চমকে উঠল টিনা, হাত দুটো শক্ত মুঠো হয়ে গেল, লক্ষ্য করল রানা। 'মেয়েটাকে আপনি চেনেন কিনা জানি না আমি। আশ্চর্য কি জানেন, শামিমা বলল, আপনার ভাই নাকি বেঁচে আছে। বলল, মাত্র হপ্তা কয়েক আগে আবিদের সাথে তার নাকি দেখা হয়েছে।'

শামিমার নাম শুনে হঠাৎ যেমন রেগে উঠেছিল টিনা, তেমনি হঠাৎ আবার শান্ত হয়ে গেল। একদৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল সে। তারপর বলল, 'এ-ধরনের একটা কথা কিভাবে বলতে পারল সে? তার কাছে কেন গিয়েছিলেন আপনি? কি যেন বুঝতে পারছি না আমি।'

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে নড়েচড়ে উঠল রানা। 'ওর কথাও গল্প করেছিল আবিদ। ওর সাথে হঠাৎ করে এক জায়গায় দেখা হয়ে গেল, তাই জিজ্ঞেস করা। আবিদ কোথায় আছে জিজ্ঞেস করতে বলল, জানি না, তবে হপ্তাকয়েক আগে আমার কাছে এসেছিল।'

চেহারা শান্ত দেখালেও ভেতরে রাগ ছিল, সেটা বেরিয়ে এল গলার আওয়াজ থেকে। 'এ-ধরনের একটা মিথ্যে কথা বলার কি মানে থাকতে পারে, বলুন তো! আপনিও মস্ত একটা ভুল করছেন। আবিদের বান্ধবী—কক্ষনো নয়! শামিমা আবিদের বান্ধবী হয় কিভাবে! ওর কথা বেশ ক'বারই আমাকে বলেছে আবিদ। গোটা ব্যাপারটা একতরফা, এবং ফিজিক্যাল। মেয়েটা লোভী, আবিদের কাছ থেকে টাকা-পয়সা নিত। এর বেশি কিছু না। মন দেয়া-নেয়ার কোন ব্যাপার ছিল না। খুব বেশি হলে বছরে দু'চার বার দেখা হত ওদের। একটা বাজে মেয়ে,

বুঝলেন? নিশ্চয়ই আপনার কাছ থেকে কিছু টাকা পাবার আশায় এই রকম জঘন্য একটা কথা বলেছে।'

কি বুঝবে, কি বলবে ঠিক করতে না পেরে চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজল রানা। তিন সেকেন্ড চিন্তা করে চোখ মেলল, বলল, 'কি জানি! যা বলল তা থেকে বুঝলাম, ওদের সম্পর্কটা বেশ গভীরই ছিল। আবিদ নাকি ওর জন্যে একটা বাড়িও কিনেছিল। সেই বাড়ির একটা ঘর খুব সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছিল...'

'বাড়ি? আবিদ ওই জঘন্য মেয়েটার জন্যে একটা বাড়ি কিনেছিল?' টিনা যেন আকাশ থেকে পড়ল। 'আপনার কি মাথা খারাপ হলো? পাকিস্তানে যাবার মাত্র দিন কয়েক আগে ওর সাথে পরিচয় হয় আবিদের। তারপর ফিরে এল, কিন্তু ফিরে এসে শামিমার সাথে কোনরকম সম্পর্ক রাখেনি ও। খানিক আগে বললাম না আপনাকে, কোন কাজ করত না ও, বাড়ি থেকে কোথাও বেরুত না?' একটু চিন্তা করে আবার বলল সে, 'আমার বিশ্বাস, গত দশ বছরে ওদের আর দেখা হয়নি।'

'আবিদ আপনাকে সব কথা নাও বলে থাকতে পারে,' বলল রানা, ভাইয়ের ওপর টিনার অটল বিশ্বাসের বহর দেখে অস্বস্তি বোধ করল ও। 'তাছাড়া, এ-কথাও তো সত্যি যে ভাইয়েরা সাধারণত বোনেদের কাছে সব কথা বলে না...'

'কিন্তু কথা সেটা নয়,' তীক্ষ্ণ শোনাল টিনার গলা। 'ওদের সম্পর্ক কি ছিল না ছিল সেটা আমাদের আলোচ্য বিষয় হতে পারে না। আবিদ যদি মেয়েটার সাথে একটু মাখামাখি করেও থাকে, আমি কেয়ার করি না। সে বলছে, আবিদ বেঁচে আছে। এটা একটা জঘন্য মিথ্যে কথা!'

'কিন্তু মিথ্যে কথাটা বলছে কেন?' শান্ত সুরে জানতে চাইল রানা। 'তার নিশ্চয়ই একটা কারণ আছে?'

সাথে সাথে জানতে চাইল টিনা, 'ইনফরমেশনটার জন্যে তাকে আপনি কত টাকা দিয়েছেন?'

'টাকা দিয়েছি তা আপনি ধরে নিচ্ছেন কেন?'

'বললাম না, মেয়েটাকে আমি চিনি? ওর স্বভাব আমার জানা আছে। টাকার বিনিময়ে ওকে দিয়ে আপনি যা খুশি বলিয়ে বা করিয়ে নিতে পারবেন।'

'ঠিক আছে, আমি স্বীকার করছি, ওকে টাকা দিয়েছি। কিন্তু টাকা তাকে আমি এমনিতেও দিতাম। যদি বলত আবিদ মরে গেছে, তবুও। তাহলে মিথ্যে বলল কেন?'

'আবিদ বেঁচে আছে, এটাই আপনি শুনতে চেয়েছিলেন। তাই নয় কি? সেটা শামিমা ধরতে পারে। মরে গেছে শুনলে আপনি উৎসাহ হারাবেন, সেটা বুঝতে পেরেই এই কথাটা আপনাকে বলেছে সে।'

টিনার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রানা। এই দিকটা ভেবে দেখা হয়নি ওর। টিনা এখন ওর মনে খুব জোরাল একটা সন্দেহ ঢুকিয়ে দিয়েছে। আসলে কে মিথ্যে কথা বলছে? টিনা, নাকি শামিমা?

চেয়ার থেকে উঠে ধীর পায়ে এগোল টিনা, ইজেলের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। রাজ্যের অস্বস্তি নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। মাথা নিচু করে কি যেন ভাবছে টিনা। হঠাৎ মুখ তুলল সে, বলল, 'আপনি আমাকে সন্দেহের মধ্যে ফেলে

দিয়েছেন। সবার কথা বলেছে আবিদ, কিন্তু আপনার নাম তার মুখে শুনিনি কখনও। কেন বলুন তো?'

'হতে পারে আমি হয়তো তার মনে কোন ছাপ ফেলতে পারিনি,' বলল রানা। তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ বদল করতে চাইল রানা, 'আর কাউকে দেখছি না যে, একা থাকেন নাকি?'

'না,' রানার চোখে চোখ রেখে বলল টিনা। 'আজ ছুটির দিন, কর্মচারীরা কেউ আসেনি। আমরা দুই বান্ধবী থাকি এখানে, দেশ থেকে কাল-পরশু ফিরবে সে। এটা অফিস কাম রেসিডেন্স, আমাদের কোন অসুবিধে হয় না।' একটু থেমে অভিযোগের সুরে বলল সে, 'আপনি কিন্তু আমার প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন। তাহলে আমার সন্দেহের কথাটা খুলেই বলি। কেন যেন মনে হচ্ছে আমার, আপনি আমার ভাইকে চিনতেন না। জানতে পারি, কি দরকারে আপনি তার খোঁজ নিতে এসেছেন?'

ঝট্ করে চেয়ার ছাড়ল রানা, কিছু বলতে গেল, এই সময় জানালা দিয়ে বাইরে চোখ পড়তেই একজন লোককে পড়িমরি করে ছুটে আসতে দেখে চমকে উঠল ও। লোকটাকে দেখেই চিনল রানা—শাহেদ। ফাঁকা উঠানে দাঁড়িয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত চারদিকে তাকাল সে। তারপর স্টুডিওটা কোন্ দিকে বুঝতে পেরে এদিকে ছুটে আসতে শুরু করল। অফিস কামরার দরজায় দড়াম করে ধাক্কা খেল সে, তারপর দমাদম ঘুসি মারতে শুরু করল কবাটের গায়ে। স্টুডিও থেকে দ্রুত বেরিয়ে অফিস কামরায় ঢুকল রানা।

'কি ব্যাপার?' অবাক হয়ে জানতে চাইল টিনা।

জবাব না দিয়ে দরজা খুলে দিল রানা। কবাটে হেলান দিয়ে হাঁপাচ্ছিল শাহেদ, দরজা খোলার সাথে সাথে কামরার ভেতর দিকে পড়ে যেতে শুরু করল সে। ঝুঁকে, তাড়াতাড়ি তাকে ধরে ফেলল রানা। 'কি হয়েছে?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইল ও। 'তুমি এখানে কেন?'

মুখ তুলে তাকাল শাহেদ। কিন্তু এত ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে যে কথা বলার শক্তি নেই। ভূতে পাওয়া মানুষের মত ভয়ে বিকৃত হয়ে আছে চেহারা।

'কি হয়েছে?' তার কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিল রানা।

'আরেকটু হলে ধরে ফেলেছিল আমাকে ওরা!' হাঁসফাঁস করতে করতে বলল শাহেদ। 'এখানে না এসে আমার কোন উপায় ছিল না। আর কোথাও যাবার জায়গা নেই আমার···কুত্তার বাচ্চাটা দু'জন পুলিস অফিসারকে গুলি করে মেরে ফেলেছে!'

'চুপ!' বলেই ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা। দু'ঘরের মাঝখানের দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে টিনা।

'এসব কি হচ্ছে এখানে?' কঠিন সুরে জানতে চাইল টিনা।

'আবিদ তার চিঠিতে শাহেদ নামের কারও কথা লিখেছিল,' শান্ত কণ্ঠে বলল রানা। 'গেরিলা দলে ছিল ও। নয়জনের একজন।' শাহেদকে দেখিয়ে বলল, 'এর নাম শাহেদ। আপনি বলছিলেন, আবিদের বন্ধু-বান্ধবদের সাথে যোগাযোগ রাখা উচিত ছিল। নিন, যোগাযোগটা আমিই করিয়ে দিলাম!'

দুই

সাত ফিট উঁচু পাঁচিলের গায়ে সবুজ রঙের গেট, গেটের মাথা থেকে ধীরে ধীরে উঁচু হলো হুড়কোটা। ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে গেটের মস্ত দুই কবাট। তারপর একটা মাথা আর খাকী ইউনিফর্ম পরা একটা কাঁধ ঢুকল ভেতরে। পুলিস। উঁকি দিয়ে উঠানটা দেখে নিয়ে মাথা আর কাঁধ আবার ফিরিয়ে নিল বাইরে। তিন সেকেন্ড পর গেটটা পুরোপুরি খুলে গেল, সাবধানে পা ফেলে ভেতরে ঢুকল দু'জন পুলিস। এদের কাছে আর্মস নেই, হাতে শুধু একটা করে লাঠি।

উঠানটা প্রায় চারকোনা। তিন-চারটে করে কামরা নিয়ে একটা করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। কামরাগুলো বাংলো প্যাটার্নের, এক জোড়া বাংলোর মাঝখানে বিশ ফিট করে ব্যবধান। জানালার পর্দা সামান্য একটু সরিয়ে সেই বিশ ফিট ব্যবধানের ভেতর দিয়ে দৃষ্টি ফেলে বাড়ির গেট, উঠানের খানিকটা দেখতে পাচ্ছে রানা। কংক্রিটের সরু পথ ধরে পুলিস দু'জন এগোল, দেখতে দেখতে বাড়ির আরেক কোণের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল তারা। খোলা রাস্তার ওপারে গেট দিয়ে তাকাল রানা। কৌতূহলী দর্শকের বেশ ভিড় জমে উঠেছে সেখানে।

রানার পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে টিনা, সে-ও পর্দা সরিয়ে তাকিয়ে আছে উঠান আর গেটের দিকে।

'ওরা তোমাকে এখানে ঢুকতে দেখেছে?' জানালা থেকে চোখ না সরিয়েই জানতে চাইল রানা।

ইতিমধ্যে নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছে শাহেদ। এখন আর আগের মত ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে না। যদিও কথা বলার সময় তার গলা কেঁপে গেল। 'মনে হয় না। ওদের চেয়ে পঞ্চাশ গজ এগিয়ে ছিলাম আমি। বাঁক নিয়ে গেট দিয়ে ঢোকার সময় কেউ আমাকে দেখেনি। উঁহুঁ, আমি যে এখানে আছি ওরা তা জানে না। ঢুকেছে নাকি? ঢুকেছে?'

'উঠানের ওদিকে খোঁজাখুঁজি করছে,' বলল রানা। জানালার কাছ থেকে সরে এল ও।

'ধরা পড়লে আমি শেষ!' ফিসফিস করে বলল শাহেদ। 'ওরা বলবে, পুলিসকে গুলি করার প্ল্যান করেছিল আকরাম সেটা আমার জানা ছিল। লোকজনের চোখের সামনে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা হয়েছে ওদেরকে...'

'ওখানে বসে চুপ করে থাকো।' ইঙ্গিতে টিনাকে দেখাল সে, চোখ রাঙিয়ে সাবধান করে দিল শাহেদকে। 'তুমি এখানে আছ কিনা জানে না ওরা, কাজেই ভয়ের কিছু নেই।' ধপ করে একটা আর্মচেয়ারে বসে পড়ল শাহেদ। ইতিমধ্যে জানালার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছে টিনা, তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। 'আমি দুঃখিত, টিনা। এসবের একটা ব্যাখ্যা অবশ্যই আছে, কিন্তু সব কথা আপনাকে বলার মত সময় নেই। যাই ঘটুক না কেন, আপনাকে আমি ঝামেলা

থেকে দূরে রাখতে চাই। আপনি নিশ্চয়ই একটা সাইড নেবার কথা ভাবছেন?'

ঝাড়া পাঁচ সেকেন্ড নিঃশব্দে রানার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল টিনা। সতর্ক, সন্দিহান দেখাল তাকে। কিন্তু সন্ত্রস্ত বা আতঙ্কিত বলে মনে হলো না। 'এর আগে আপনাদের কাউকে আমি দেখিনি,' ঠিক কঠিন নয়, খানিকটা গম্ভীর সুরে বলল সে, 'পুলিস জানতে চাইলে যেটুকু জানি বলব ওদেরকে।'

মুচকে একটু হাসল রানা। বলল, 'ঠিক তাই করা উচিত আপনার। কিন্তু আমরা এমন একটা ব্যবস্থা করতে চাই, যেন আপনার সাথে পুলিসের দেখাই না হয়।' শাহেদের দিকে ফিরল ও। 'টিনাকে বাঁধতে হয়। ওর সাথে আমাদের কোন শত্রুতা নেই, কিন্তু নিজেদের সেফটির জন্যে আমরা কোন ঝুঁকি নিতে পারি না। রশি-টশি কিছু পাওয়া যায় কিনা দেখো। গা ঝাড়া দাও, তাড়াতাড়ি করো!'

দ্রুত এক পা পিছিয়ে গেল টিনা, কিন্তু তার একটা কব্জি ধরে ফেলল রানা। টিনা দাঁড়িয়ে পড়তেই কব্জিটা ছেড়ে দিল ও। 'ঠাণ্ডা হোন। বোঝার চেষ্টা করুন। আপনার কোন ক্ষতি করতে যাচ্ছি না আমরা। শুধু আমাদের নয়, আপনার ভালর জন্যেও এই ব্যবস্থা। প্লীজ, চিৎকার করবেন না। পুলিস যদি বুঝতে পারে আমরা এখানে আছি, তাহলে ছুটে আসবে ওরা। বাধ্য হয়ে এখান থেকে পালাবার চেষ্টা করতে হবে আমাদের। তখন ইচ্ছে না থাকলেও আপনাকে অজ্ঞান করে রেখে যেতে হবে আমাদের। তা না হলে আপনি পুলিসকে জানিয়ে দেবেন কোন্ দিক দিয়ে পালাচ্ছি আমরা। তাই বলছি, শুধু শুধু ঝুঁকি নেবেন না। আমি এবং শাহেদ, আমাদের দু'জনকেই খুঁজছে পুলিস। একান্ত প্রয়োজন না হলে নিষ্ঠুর হতে চাই না আমরা। যা বলছি করুন, আপনার কোন ক্ষতি হবে না। পুলিস বিদায় হলেই আপনাকে মুক্ত করে দিয়ে এখান থেকে চলে যাব আমরা। কথা দিচ্ছি, আপনার কোন ক্ষতি হতে দেব না।'

'আপনি যে ভুয়া, সেটা আমি প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছি,' আগের মতই গম্ভীর দেখাল টিনাকে। 'না, আমি চিৎকার করব না। ওর কথা আমি শুনেছি। ও একটা খুনী, তাই না?'

'হায় খোদা, না! শাহেদ একটা পিঁপড়ে পর্যন্ত মারতে পারে না। আপনার ভাইয়ের কিছু বন্ধু পাকিস্তান থেকে ঢাকায় এসেছে। ওরা...' হঠাৎ চুপ করে গিয়ে প্রসঙ্গ বদল করল রানা, '...থাক ওসব কথা। পুলিসকে গুলি শাহেদ করেনি, করেছে আকরাম। আকরামের কথা মনে আছে—রাজশাহীর আকরাম? আবিদের সাথে গেরিলা দলে ছিল?'

একের পর এক বিস্ময়ের ধাক্কা খেয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছে টিনা, ভয় পাবার সুযোগই তার ঘটেনি। 'এসবের অর্থ কি? আপনারা এখানে কেন এসেছেন?'

'দুঃখিত, এখন ওসব কথা বলার সময় নয়।' পাশের কামরা থেকে দুই প্রস্থ রশি নিয়ে ফিরে এল শাহেদ, তার হাত থেকে সেগুলো নিল রানা। 'পর্দা সরিয়ে ওদের ওপর নজর রাখো।' জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল শাহেদ। টিনার দিকে তাকাল রানা। 'দিন, হাত দুটো দিন। এ আপনার ভালর জন্যেই। আমি জানি আপনি কোন গোলমাল করবেন না।'

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল টিনা। চোখের দৃষ্টি রানার চোখে স্থির হয়ে আছে।

রানার সন্দেহ হলো, এই বুঝি চিৎকার করে উঠল। 'না,' বলল টিনা। 'গোলমাল করব সে সাহস আমার নেই। কি করতে হবে আমাকে?'

'ঘুরে দাঁড়িয়ে হাত দুটো পিছন দিকে নিয়ে আসুন।'

শান্ত ভাবে নির্দেশ পালন করল টিনা, তাড়াতাড়ি তার কব্জি দুটো এক করে বেঁধে ফেলল রানা 'খুব বেশি আঁটো হয়ে গেল না তো? লাগছে?' কাজটা করতে এতটা খারাপ লাগছে দেখে মনে মনে অবাক হয়ে গেল ও।

'না। ঠিক আছে।'

শাহেদের কাছ থেকে চেয়ে নেয়া সিল্কের একটা রুমাল গোল পাকাল রানা, বলল, 'এবার আমার দিকে ফিরে মুখটা খুলুন।'

ঘুরে দাঁড়াল টিনা, রানার হাতের দিকে তাকাল। 'কেন?' এতক্ষণে মেয়েটা ভয় পেতে শুরু করেছে, লক্ষ্য করল রানা। 'বললাম তো, আমি কোন গোলমাল করব না।' বলে পিছিয়ে গেল এক পা।

'আমরা কেটে পড়ার পর পুলিস যদি আপনার কাছে আসে, যদি জিজ্ঞেস করে আপনি চিৎকার করেননি কেন, তখন কি উত্তর দেবেন?' জানতে চাইল রানা। 'আপনার মুখ বন্ধ না করে উপায় নেই। এ আপনার ভালর জন্যেই।'

চেহারা একটু ফ্যাকাসে হয়ে গেল টিনার, তবে মুখ খুলতে আর আপত্তি করল না।

'ভেরি গুড!' খুশি হয়ে উঠল রানা। 'এবার আপনার বেডরুমে চলুন। বিছানায় শুইয়ে দেব আপনাকে। পুলিস চলে গেলে আপনার বাঁধন কেটে দেয়া হবে।'

পাশের ঘর থেকে বেডরুমে ঢুকল ওরা। বিছানার কিনারায় বসে মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল টিনা। তার চেহারা দেখে রানার বুঝতে অসুবিধে হলো না, সাংঘাতিক ভয় পেয়েছে মেয়েটা।

'আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারলে খুশি হতাম,' বলে টিনার পায়ের কাছে হাঁটু ভাঁজ করে বসে পড়ল রানা। রশি দিয়ে পা দুটো এক করে বাঁধল। 'আপনার কোনরকম ক্ষতি হবে না। কথা দিলে আমি সেটা রাখি। পুলিস চলে গেলেই আমি নিজে আপনার বাঁধন খুলে দেব। ততক্ষণ বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে থাকুন। কোথাও ব্যথা লাগছে না তো?'

বিছানায় শুয়ে বালিশে মাথা রাখল টিনা।

'কি রকম খারাপ লাগছে আপনার সে আমি বুঝতে পারছি,' বলল রানা। অভয় দেবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠেছে ও। 'সব ঠিক হয়ে যাবে। একটুও ভয় পাননি আপনি, কি বলেন?'

খানিকক্ষণ ইতস্তত করে এদিক ওদিক মাথা নাড়ল টিনা। তার কাঁধে বার দুয়েক মৃদু চাপড় দিল রানা। সাহস যোগাতে মৃদু হাসল। তারপর ফিরে এল অফিস কামরায়। দাঁড়াল শাহেদের পাশে। 'এদিকে আসছে ওরা?'

'না। আমার মনে হয়, এক এক করে সবগুলো বাড়ি সার্চ করবে ওরা।' রানা অনুভব করল, থরথর করে কাঁপছে শাহেদের শরীর।

'তুমি একটা বোকার হদ্দ,' বলল রানা। 'মেয়েটার সামনে ঝোলার বিড়াল দিলে তো বের করে! আসলে ঘটেছেটা কি?'

থেমে থেমে দীর্ঘ একটা শ্বাস টানল শাহেদ। ফিসফিস করে বলল, 'কাকের চেয়েও চালাক আকরাম, আমাকে দেখেই বুঝে ফেলে তোমার সাথে হাত মিলিয়েছি আমি, ওদের বিরুদ্ধে চলে গেছি। কিন্তু অভিযোগটা আমি অস্বীকার করতেই পিস্তল বের করল সে। হোটেলের বুড়ো একজন বোর্ডার সেটা দেখে ফেলল। খবর দিয়ে সে-ই পুলিস আনায়। কেয়া বুঝতে পারে, সর্বনাশ ঘটতে যাচ্ছে, জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে হোটেল ছেড়ে যেতে বলে সে। কিন্তু আমরা একটু দেরি করে ফেলি। বেরুতে যাচ্ছি, এই সময় পুলিস এসে পড়ল। তাদের একজন সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছিল, কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে গুলি করল আকরাম। দ্বিতীয় পুলিসটা গা ঢাকা দিতে চেষ্টা করল, কিন্তু তাকেও ছাড়ল না আকরাম। সোজা তার মাথার পিছনে গুলি করল সে। এমন ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে আর কাউকে দেখিনি আমি।'

প্রচণ্ড রাগ হলো রানার, কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারল না। নিজেকে শান্ত করার জন্যে একটা সিগারেট ধরাল ও। 'আর যাই করো, এই শহরে পুলিস মারা চলে না!' বলল ও। 'দরকার হলে আকরামের খোঁজে শহরের প্রতিটা ইঁট আলগা করে ছাড়বে ওরা। তারপর কি হলো?'

'ওদেরকে গুলি করতে দেখে দিশেহারা হয়ে পড়ি আমি। ওরা মারা গেছে বুঝতে পেরে ব্যাগ ফেলে পাগলের মত ছুটতে শুরু করি। রাস্তায় বেরিয়ে এসে দেখি চারদিক লোকে লোকারণ্য, পালাবার কোন ফাঁক-ফোকর নেই। কয়েকজন লোক আমাকে ধরার জন্যে এগিয়ে এল। তাদেরকে কামড়ে, খামচে কোনরকমে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আবার ছুটতে শুরু করি। ভিড়ের ভেতর দিয়ে কিভাবে বেরিয়ে আসতে পারলাম, বলতে পারব না। কিন্তু বেরিয়ে আসতে পারলেও, পিছন দিকে তাকিয়ে দেখি, একদল লোক আমাকে ধাওয়া করে আসছে। বললে বিশ্বাস করবেন না,' ঝট করে রানার দিকে তাকাল শাহেদ, 'সেই মুহূর্তে হোটেল থেকে বেরিয়ে আমার পিছু পিছু ছুটতে শুরু করে কেয়া, চিৎকার করতে থাকে, ধরুন! ধরুন! পালাল! খুনী পালাল! এতে করে আমাকে যারা ধাওয়া করছিল তাদের সংখ্যা আরও বেড়ে গেল। এই গোলমালের মধ্যে পুলিসের একটা জীপে চড়ে বসে কেয়া আর আকরাম, তারপর ভিড়ের ভেতর দিয়ে জোরে জীপ চালিয়ে কেটে পড়ে। আমাকে পাশ কাটাবার সময় ফিরেও একবার তাকাল না। আমি তখন পিছনে মারমুখো পাবলিককে নিয়ে প্রাণের দায়ে ছুটছি!'

হাসি পেল রানার, সেটা চেপে রাখল। 'তোমার নার্ভের প্রশংসা করতে হয়। বলে যাও, তারপর কি হলো? এখানে এলে কিভাবে?'

'ভাগ্যের জোরে। দু'জন লোক আর সবাইকে পিছনে ফেলে আমার একেবারে পিঠের কাছে চলে এসেছিল,' বলল শাহেদ। 'আরেকটু হলে ধরে ফেলত আমার শার্ট। বিপদটা টের পেয়ে আমি নিজেই হঠাৎ রুখে দাঁড়াই। এটা ওরা আশা করেনি। চোখ বুজে মুঠো পাকানো হাত চালাই আমি, ঘুসি খেয়ে দু'জনেই রাস্তার ওপর পড়ে যায়। তারপর আবার আমি ছুটতে শুরু করি। পাবলিক পিছিয়ে পড়তে শুরু করে, এই সুযোগে একটা বাড়ির ভেতর ঢুকে বাগানে গা ঢাকা দিই আমি। আধ ঘণ্টা ছিলাম ওখানে। তারপর বেরিয়ে এসে একটা বেবী ট্যাক্সি ভাড়া

করি। কমলাপুর রেল স্টেশনের সামনে বেবী থেকে নেমে ড্রাইভারকে ভাড়া দিচ্ছি, এই সময় একটা পুলিসের গাড়ি দেখলাম। গাড়ি থেকে একজন পুলিস আমাকে দেখতে পেয়েই চিৎকার করে উঠল। প্রথমে থতমত খেয়ে গিয়েছিল ড্রাইভার, তারপরই আমাকে ধরার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। কিন্তু আমি কি আর থাকি সেখানে! ও ঝাঁপিয়ে পড়তেই স্যাঁৎ করে সরে গেলাম, তারপর প্রাণপণে ছুটলাম। আবার শুরু হলো পিছু ধাওয়া। এবার পাবলিক নয়, খোদ পুলিস। ছুটতে ছুটতে হঠাৎ মনে পড়ল, এটা কমলাপুর এলাকা, তোমার দেয়া টিনা রহমানের ঠিকানাতেও কমলাপুরের একটা স্টুডিওর নাম লেখা ছিল। বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হয়নি, ভাগ্যগুণে হঠাৎ বাড়ির নাম্বার আর স্টুডিওর সাইনবোর্ডটা দেখতে পাই। এখানে না ঢুকলে এতক্ষণে হাতকড়া পরা অবস্থায় থানায় থাকতাম আমি।'

'হুঁ,' বলল রানা। 'কিন্তু এখানে তুমি বেশিক্ষণ থাকতে পারছ না। পরিস্থিতিটা জটিল করে ফেলেছ তুমি, শাহেদ। তোমাকে আমি দোষ দিচ্ছি না, কিন্তু আমার তুমি মস্ত একটা ক্ষতি করে ফেলেছ। টিনার সাথে বেশ খাতির হয়ে যেত আমার, কিন্তু তুমি এসে সব ভণ্ডুল করে দিলে।'

কিন্তু রানার কথা শাহেদ শুনতেই পেল না। নিজেকে নিয়ে বড় বেশি উদ্বিগ্ন সে। 'আমি যে গুলি করিনি পুলিসকে সেটা বিশ্বাস করানোই দায় হবে,' আপনমনে বলে চলল সে, 'ওরা দু'জন মানুষ নয়, শয়তানের চেলা। আকরাম একটা বাস্টার্ড, আর কেয়া হচ্ছে ডাইনী! প্রথমে নঈমের খুনের দায় তোমার ঘাড়ে চাপাল, এখন পুলিস খুনের দায় আমার ঘাড়ে চাপাল। মাথায় বাজ পড়ে মরুক ওরা! সাপে কাটুক! গাড়ির তলায় চাপা পড়ুক!'

'শয়তানের চেলা তাতে কোন সন্দেহ নেই,' ক্ষীণ একটু হাসি দেখা গেল রানার ঠোঁটে। 'কিন্তু তার মানে এই নয় যে...' হঠাৎ চুপ করে গেল রানা, কাঁধে আঙুলের খোঁচা দিয়ে শাহেদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল, তারপর একটু ঝুঁকে জানালা দিয়ে ভাল করে বাইরে তাকাল। 'ওই, আসছে ওরা।'

উঠান ধরে, দুই বাংলোর মাঝখান দিয়ে সোজা বিচিত্রা স্টুডিওর দিকে এগিয়ে আসছে পুলিস দু'জন। তাদের পিছনে একজন লোককে দেখা গেল। বাদামী রঙের স্যুট পরে আছে, মাথায় মস্ত একটা টাক। লোকটার আগে আগে এগিয়ে আসছে বিরাট ভুঁড়িটা, দেখে হাসি পেয়ে গেল রানার।

'বেডরুমে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকো,' চাপা স্বরে নির্দেশ দিল রানা। 'সব সামলে নেব আমি। জলদি! আর হ্যাঁ, কান খোলা রেখো। হঠাৎ তোমাকে কেটে পড়তে হতে পারে।'

বেডরুমে চলে গেল শাহেদ। পরমুহূর্তে বেজে উঠল কলিং বেল। বেডরুমের দরজা ভেতর থেকে শাহেদ বন্ধ করেছে কিনা দেখে নিল রানা, তারপর আবার অফিস কামরায় ফিরে এল। দ্বিতীয়বার কলিং বেল বাজতে দরজা খুলে দিল ও। পুলিস দেখে অবাক হবার ভান করল, বিস্মিত কণ্ঠে জানতে চাইল, 'কি ব্যাপার? কিছু হয়েছে নাকি?'

'আমরা একজন লোককে খুঁজছি, বোধহয় এদিকেই এসেছে,' রানা থামতেই পুলিস কনস্টেবলদের একজন বলল, রানাকে ছাড়িয়ে অফিস কামরার ভেতর চলে

এল তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। 'লোকটা বেশ মোটাসোটা, একটা হাত নেই, মুখে কাটা দাগ আছে। সাদা শার্ট পরে আছে সে। আর ঘিয়ে রঙের প্যান্ট। দেখেছেন নাকি?'

'না!'

পুলিস দু'জনের মাঝখানে এসে দাঁড়াল বাদামী স্যুট পরা প্রৌঢ়। রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল বিরূপ চোখে। 'আপনি কে?' জানতে চাইল সে। 'আপনাকে তো এর আগে কখনও দেখিনি!' খোঁচা খোঁচা দাড়ি গজিয়েছে সারা মুখে, খসখস করে চুলকাচ্ছে গাল।

লোকটার ভঙ্গি অনুকরণ করে রানাও তার আপাদমস্তক দেখল। 'আমাকে নিয়ে আপনার মাথা ব্যথার কোন কারণ দেখি না। তার চেয়ে দাড়িটা কামিয়ে ফেলুন, বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে। নাকি দাড়ি রাখতে চান?'

লোকটার চেহারা লাল হয়ে উঠল। 'কে আপনি?'

'সবাই সায়েম বলে ডাকে—সায়েম চৌধুরী। টিনার মামাতো ভাই। আপনার কৌতূহলের কারণ?'

'আমার নাম সরাফত আলি জোয়ারদার,' এমন সুরে বলল লোকটা, যেন নামটা শুনলেই তাকে চিনতে পারবে রানা। 'মিস টিনা রহমানের প্রতিবেশী আমি। কোথায় তিনি? তাঁর সাথে কথা বলতে চাই আমি।'

'টিনা শপিঙ করতে বেরিয়েছে,' বলল রানা। তাচ্ছিল্যের সাথে মুখ ফিরিয়ে নিল, তাকাল পুলিসদের দিকে। 'আর কিছু জানার আছে আপনাদের?'

'না। লোকটাকে আপনি যদি দেখে না থাকেন, আর কিছু জানার নেই।'

'দেখিনি।'

একজন কনস্টেবলের হাত ধরে ক'হাত তফাতে নিয়ে গেল প্রৌঢ় সরাফত আলি, মন্ত্র পড়ার ভঙ্গিতে তার কানের কাছে ফিস ফিস করতে শুরু করল। প্রতিটি শব্দ শুনতে পেল রানা। 'অচেনা লোক, আগে কখনও দেখিনি, ব্যবহার তেমন সুবিধের নয়...'

পুলিসটা ওর দিকে তাকাতেই চোখ মটকাল রানা। সরাফত আলিকে বলল, 'ঘণ্টা খানেক অপেক্ষা করতে রাজি থাকলে টিনার সাথে কথা বলে যেতে পারবেন। যদি বলেন তো বাইরে একটা চেয়ার বের করে দিই। অচেনা মানুষ, আপনাকে তো আমি ঘরের ভেতর বসাতে পারি না!'

'কথায় কথা বাড়ে,' চেহারায় অস্বস্তি নিয়ে বলল একজন কনস্টেবল। সরাফত আলিকে বলল, 'খামোকা থেকে লাভ নেই।' সঙ্গীর দিকে তাকাল। 'এসো দবির। আমরা এখানে শুধু শুধু সময় নষ্ট করছি। এদিকে কোথাও না থেমে সোজা চলে গেছে খুনী।'

কংক্রিটের পথ ধরে চলে যাচ্ছে ওরা। হাত নেড়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছে সরাফত আলি, কিন্তু পুলিস দু'জন তার কথায় কান দিচ্ছে না।

দরজা বন্ধ করে গলা চড়িয়ে বলল রানা, 'বিপদ কেটে গেছে।'

বেডরুম থেকে বেরিয়ে, স্টুডিও হয়ে, অফিস কামরায় ঢুকল শাহেদ। উত্তেজনায় টান টান হয়ে আছে চেহারা। ফ্যাকাসে দেখাল তাকে। ইঙ্গিতে বেডরুমের দিকটা দেখাল সে। 'ওকে নিয়ে কি করব আমরা?'

'আপাতত ওর কথা ভুলে যাও। প্রশ্ন হলো, তোমাকে নিয়ে কি করা হবে?'

পায়চারি করতে শুরু করল শাহেদ। 'জানি, আমার কোন আশা নেই। স্বেচ্ছায় ধরা দেয়াটাই আমার জন্যে এখন সবচেয়ে ভাল। ধরা দিলে তখন হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করবে ওরা।'

'আকরাম যে গুলি করেছে, দেখেছে কেউ?'

'জানি না। মনে হয় দেখেনি। সবাই আমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে ছিল। ঘটনাটা তো হঠাৎ করে, চোখের পলকে ঘটে গেল। আওয়াজ অবশ্যই শুনেছে, কিন্তু গুলির আওয়াজ শোনার পর কেউ মাথা বের করে দেখতে যায় না কে গুলি করল।'

'তবু, ইতিমধ্যে পুলিস নিশ্চয়ই জানে যে তুমি একা ছিলে না, তোমার সাথে আরও দু'জন ছিল। আকরামের চেহারার বর্ণনাও তারা পেয়ে গেছে। এমনও তো হতে পারে যে তাকেই ওরা আগে ধরতে পারবে। ধরার সময় তার কাছে হয়তো পিস্তলটাও পাবে।'

'তাতেও আমার বিপদ কাটবে না,' ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল শাহেদ।

'না। কিছু একটা করতে হবে আমাদের। ঘণ্টা দু'তিনের মধ্যে ফুলফোর্সে সার্চ শুরু করবে ওরা। ছুটি বাতিল করে দিয়ে এরই মধ্যে সমর্থ সবাইকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। নিজেদের কেউ গুলি খেলে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে ওরা।'

'সবই আমি বুঝি!' চেহারায় মরিয়া একটা ভাব ফুটে উঠল শাহেদের। 'আপনি কি বলেন? ধরা দেব?'

'তারচেয়ে আমার সাথে এসো তুমি,' বলল রানা। 'শামিমার লাশ পেতে খুব বেশি দেরি হবে না ওদের। তখন ওরা আমার পিছনেও উঠেপড়ে লাগবে।'

'কিন্তু আমাকে সাথে নিলে আপনার বোঝা বরং বাড়বে...'

'আমার কথা মত চললে বাড়বে না,' বলল রানা।

'কিন্তু আপনি যাবেন কোথায়?'

'খুলনা।'

'খুলনা? কেন, ওখানে কি আছে?'

'তোমাকে বলতে ভুলে গেছি। খুলনা ছাড়িয়ে কোথাও একটা চর বা দ্বীপ আছে, সেখানে একটা বাড়ি আছে আবিদের। গা ঢাকা দেবার জন্যে ওখানে খুব সুবিধে হতে পারে আমাদের। বলা যায় না, ওখানে আমরা হয়তো আবিদকে পেয়েও যেতে পারি। আমি যাচ্ছি, ইচ্ছে করলে আমার সাথে তুমিও যেতে পারো।'

'ঠিক আছে, যাব আমি।'

'আমরাও যাব,' দোরগোড়া থেকে বলল আকরাম। কেয়াকে পিছনে নিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকল সে। তার হাতে চকচক করছে মাউজারটা। ধরে আছে সোজা রানার বুকে।

তিন

'ফাঁসির রশি গলায় এঁটে বসলে কেমন লাগে, আকরাম?' জানতে চাইল রানা, চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে সামনে লম্বা করে দিল পা দুটো। ঠোঁটে বাঁকা হাসি।

'সাবধান, হাত যেন না নড়ে।' হিংস্র হয়ে উঠল আকরামের চেহারা। 'আর তুমি,' শাহেদকে বলল সে, 'বসো ওখানে।'

সাথে সাথে বসে পড়ল শাহেদ। পা দুটো থরথর করে কাঁপছিল তার, বসতে পেরে আরাম বোধ করল।

'তোমরা বোধহয় শাহেদের পিছু নিয়ে এখানে ঢুকেছ?' জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ,' বলল কেয়া। তার সামনে থেকে শাহেদের দিকে সরে গেল আকরাম, রানার সামনে এসে দাঁড়াল কেয়া। 'কেউ নোড়ো না। ডিউক, তোমার পিস্তলটা বের করে নিচ্ছি আমি। বাধা দিতে চেষ্টা করলে আকরাম তোমাকে গুলি করবে।' বলতে বলতে রানার পিছনে চলে এল সে।

'পিস্তলটা নিলে আমার ওপর দয়া করা হবে,' বলল রানা। কাঁধের ওপর দিয়ে কেয়ার দিকে তাকাল ও। 'পুলিস এসে পড়লে আমার কাছে পাবে না ওটা। ওরা যে কাছে পিঠেই আছে, জানো নিশ্চয়ই?'

ট্রাউজারের পকেটে হাত গলিয়ে রানার পিস্তলটা বের করে নিল কেয়া। তারপর পিছিয়ে গেল। 'জানি। কিন্তু তুমি যদি কোনরকম চালাকি করার চেষ্টা করো, মারা পড়বে। কথাটা তোমাকেও বলা হচ্ছে, শাহেদ।'

রানার সামনে চলে এল কেয়া, পিস্তলটা কোমরে গুঁজে শাড়ি দিয়ে ফোলা জায়গাটা ঢেকে নিল।

'গুলির রেখা থেকে সরে যাও!' ঝাঁঝের সাথে বলল আকরাম। 'বোকার মত যেখানে সেখানে দাঁড়াও কেন!'

'এখানে কোন গোলাগুলি করব না আমরা,' দৃঢ় ভঙ্গিতে বলল কেয়া। 'এই মুহূর্তে আমরা সবাই বিপদের মধ্যে আছি। বিপদ কাটাতে হলে সবাইকে এক হতে হবে।'

'তোমাদের বিপদ সম্পর্কে আমার কোন মাথাব্যথা নেই,' বলল রানা। 'পুলিস খুন করায় আমি বিশ্বাস করি না। ওটা করলে নিজের কবর খোঁড়া হয়। তোমার হাতের ওটা দেখে মনে হচ্ছে, সেই মাউজারটা—না, আকরাম? ওটা দিয়েই তো ঘুম পাড়িয়েছ নঈমকে। বাঁচা গেল! ওতে এখন আর আমার হাতের ছাপ নেই। নঈমের খুনের দায় আমার ঘাড়ে চাপাবে, সে উপায় আর রইল না তোমাদের।'

'টেলিগ্রাম বেরিয়েছে,' বলে ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে ভাঁজ করা এক পাতার একটা খবরের কাগজ বের করল কেয়া। ছুঁড়ে রানার কোলের ওপর ফেলল সেটা। বিদ্রূপের হাসি ফুটল তার ঠোঁটে। 'পড়ে দেখো। শামিমার লাশ পেয়েছে পুলিস। তোমার চেহারার বর্ণনা দেশের সব থানায় পৌঁছে গেছে। এখানেই শেষ, তা ভেব

না। তোমার নামও জেনে ফেলেছে ওরা। কাগজে সেটা ছাপাও হয়েছে। এসবের মানে, তোমার বিপদও আমাদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। বরং বেশি। পুলিস তোমার পরিচয় জানে, কিন্তু আমাদের পরিচয় জানে না।'

কাগজের সামনের পৃষ্ঠায় চোখ বুলাল রানা। গম্ভীর হয়ে উঠল চেহারা। 'ট্যাক্সি ড্রাইভার বারোটা বাজিয়েছে আমার, চেহারার বর্ণনা দিতে কোথাও কোন খুঁত রাখেনি। পুলিস বলছে, আমি নাকি সাংঘাতিক ডেঞ্জারাস।' দেঁতো হাসি দেখা গেল ওর মুখে। কাগজটা ছুঁড়ে মেঝেতে ফেলে দিল ও। 'তোমরা কি বলো? আমাকে দেখে ডেঞ্জারাস বলে মনে হয়?' সিগারেট ধরাল। তাকাল কেয়ার দিকে। চোখে শূন্য দৃষ্টি। তারপর তাড়াতাড়ি জানতে চাইল, 'কখন থেকে রাস্তায় পাওয়া যাচ্ছে টেলিগ্রামটা? নিশ্চয়ই এক ঘণ্টার বেশি নয়?'

'কেন বলো তো?' হঠাৎ সতর্ক হয়ে উঠল কেয়া। 'এখানে তোমাকে কেউ দেখেছে নাকি?'

'দেখেছে। দু'জন পুলিস আর একজন প্রতিবেশীর সাথে কথা হয়েছে আমার। কমরেড শাহেদকে খুঁজতে এসেছিল ওরা—দেখোনি ওদেরকে?' খবরের কাগজটা দেখিয়ে আবার বলল, 'ওই চেহারার বর্ণনা পড়বে ওরা, এবং ফিরে আসবে আবার—সদলবলে।' মাথা নিচু করে কিছু ভাবল ও, তারপর বলল, 'এখানে থাকা বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে না। এখুনি কেটে পড়া উচিত।'

ঘন ঘন মাথা নাড়ল কেয়া। 'তা সম্ভব নয়। শুধু রাস্তায় নয়, অলিতে গলিতেও টহল দিচ্ছে পুলিস। দিনের বেলা বাইরে বেরুলে নির্ঘাত ধরা পড়ে যাব।'

ঝট্ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল শাহেদ। অসুস্থ, উন্মাদ দেখাল তাকে। 'ডিউক যা বলছে শোনো! পুলিস এসে পড়লে আর কিছু করার থাকবে না আমাদের। পালাতে হবে এখুনি! পুলিস দু'জন হয়তো এরই মধ্যে টেলিগ্রাম পেয়ে গেছে! এখানে আর এক সেকেন্ডও নয়!'

তার কথায় কান না দিয়ে কি যেন চিন্তা করল রানা, তারপর মুখ তুলে বলল, 'উত্তেজিত হবার দরকার নেই। পুলিস আর সরাফত আলি আমাকে দেখেছে, বেশ ভাল কথা। এখন আমরা যদি সরাফত আলির অফিসে গিয়ে গা ঢাকা দিই, সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। পুলিস খানিকক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এসে দেখবে, আমি নেই। দেখে ভাববে, যেভাবেই হোক কর্ডন ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছি আমি। অন্তত তাই ভাববে বলে আশা করতে দোষ কি? কিন্তু ধরো, পুলিস গোটা বাড়িটা আবার সার্চ করতে চাইবে। সেক্ষেত্রে আকরাম একটু কেরামতি দেখালেই আমরা রেহাই পেয়ে যাব।'

'মানে?' জানতে চাইল কেয়া।

'প্রতিবেশী সরাফত আলিকে আটক করব আমরা,' বলল রানা। তার মনে ভয় ঢুকিয়ে দেবার দায়িত্ব আকরামের। সরাফত আলি বললে পুলিস তার স্টুডিওতে ঢুকবে না। তারপর রাত পর্যন্ত ওখানেই নিরাপদে থাকতে পারব আমরা।'

'হুঁ,' বলল কেয়া। 'মন্দ নয়। আবিদের বোন, কোথায় সে?'

তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল রানার দৃষ্টি। দু'সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর জানতে চাইল, 'কোথায় পেলে ইনফরমেশনটা? আবিদের যে একটা বোন আছে, তাই বা তুমি

জানলে কোত্থেকে?'

কেমন যেন ঘাবড়ে গেল কেয়া, কিন্তু পরমুহূর্তে রাগে কেঁপে উঠল সে। চাপা গলায় বলল, 'যা জিজ্ঞেস করছি বলো। নষ্ট করার মত সময় নেই আমাদের।'

'বেডরূমে,' বলল রানা। 'বেঁধে রেখেছি।'

'তোমাকে দেখেছে সে?' শাহেদকে জিজ্ঞেস করল কেয়া।

'হ্যাঁ।'

'তাহলে তাকে আমরা এখানে রেখে যেতে পারি না।'

কেয়ার কথায় যুক্তি আছে, উপলব্ধি করল রানা, কিন্তু সায় দিতে ইচ্ছে করল না। জানে, সাথে করে নিয়ে গেলে মেয়েটাকে বিপদের সাথে জড়িয়ে ফেলা হবে। খানিক চিন্তা করে বলল, 'ওকে নিয়ে গেলে অসুবিধে হতে পারে।'

'কোন অসুবিধে হবে না,' জেদের সুরে বলল কেয়া। 'ওকে আমরা কোনভাবেই এখানে রেখে যেতে পারি না!'

ঠিক আছে, মনে মনে ভাবল রানা। টিনার সেফটির দিকে নজর রাখব আমি।

হঠাৎ প্রায় আঁতকে উঠে ফিসফিস করে বলল শাহেদ। 'চুপ! সরাফত আলি! শালা এদিকেই তাকিয়ে আছে!'

নেটের পর্দা, সহজেই দৃষ্টি চলে বাইরে। শাহেদের দৃষ্টি অনুসরণ করে ওরা দেখল, নিজের অফিস কামরার বাইরে একা দাঁড়িয়ে রয়েছে বিরাট-বপু সরাফত আলি। চেহারায় অদ্ভুত একটা কৌতূহলী ভাব, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে স্টুডিও বিচিত্রার দিকে।

'ওকে পটিয়ে অফিসের ভেতর নিয়ে যেতে এক মিনিটও লাগবে না আমার,' বলল কেয়া। 'আবিদের বোনকে নিয়ে তোমরা সবাই আমার পিছু পিছু এসো। কেউ কিছু ফেলে এসো না।' অফিসের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল সে। কংক্রিটের পথ ধরে দ্রুত এগোতে দেখল তাকে ওরা। সোজা সরাফত আলির দিকে যাচ্ছে। কি ঘটে দেখার জন্যে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে থাকল না রানা, স্টুডিও হয়ে চলে এল টিনার বেডরূমে। আগের মতই বিছানায় শুয়ে আছে টিনা, কিন্তু চাদর ভাঁজ খেয়ে আছে দেখে বুঝতে অসুবিধে হলো না, নিজেকে মুক্ত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে সে।

টিনার দিকে ঝুঁকে পড়ল রানা, বলল, 'ঘটনার অনেক শাখা গজাচ্ছে। এখুনি আপনাকে ছেড়ে দিতে পারছি না। আপনার ভাইয়ের ক'জন বন্ধু-বান্ধব চলে এসেছে এখানে। কেয়ার কথা মনে আছে তো? ঢাকার মেয়ে কেয়া চৌধুরী? আর রাজশাহীর আকরাম? এইমাত্র এসে পৌঁছুল ওরা। আমরা সবাই সরাফত আলির অফিসে গা ঢাকা দিতে যাচ্ছি। কারণ, এখানে আবার আসতে পারে পুলিস। আপনিও আমাদের সাথে যাচ্ছেন, কিন্তু কেউ কোন ক্ষতি করবে না আপনার।' টিনার পায়ের বাঁধন খুলে দিল রানা। 'আমার ওপর বিশ্বাস রাখুন।'

দোরগোড়ায় শাহেদকে দেখা গেল। 'তাড়াতাড়ি করো! লোকটার কাছে পৌঁছে গেছে কেয়া।'

'আমার রেনকোট, হ্যাট আর ব্যাগটা নিয়ে এসো তুমি,' বলল রানা। টিনার একটা হাত ধরে বিছানার ওপর বসাল তাকে। 'ওঠো। ভয় পাবার কিছু নেই। কথা

দিয়েছি, তোমার কোন ক্ষতি হতে দেব না আমি।'

কিন্তু এবার রানার কথায় বিশ্বাস রাখতে পারল না টিনা, ঝাঁকি দিয়ে ছাড়িয়ে নিল হাত।

'কি হলো?' নরম সুরে বলল রানা, 'ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করো...'

শাহেদকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ঘরে ঢুকল আকরাম। 'তুমি সময় নষ্ট করছ!' রানাকে বলল সে। 'ওকে বের করে নিয়ে যেতে বলা হয়েছে তোমাকে, না পারলে সরে দাঁড়াও!' হাতের পিস্তলটা টিনার দিকে তাক করে ধরল সে। 'এই যে, সোজা কথায় কাজ হবে, নাকি মরতে চাও?'

পিস্তল দেখেই আঁতকে উঠল টিনা, নিজের অজান্তেই ঝট করে উঠে দাঁড়াল সে। আকরামের দিকে নয়, তাকিয়ে থাকল পিস্তলের মাজলের দিকে।

'আমার দিকে তাকান,' নরম সুরে বলল রানা। সাথে সাথে তাকাল টিনা। তার কাঁধে একটা হাত রাখল রানা। 'চলুন। কোন গোলমাল না করলে কেউ আপনার গায়ে একটা টোকাও মারবে না। চলুন, প্লীজ।'

দু'চোখে ভয়, কিন্তু মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাল টিনা।

'অ্যাই ছুঁড়ি, এটা নাটকের মঞ্চ নয়!' হিংস্র ভঙ্গিতে বলল আকরাম। 'যাবি না মানে? তোর বাপ যাবে! তুই শালী...'

হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলল রানা, ধাঁই করে প্রচণ্ড এক ঘুসি বসিয়ে দিল আকরামের নাকের ওপর। আকরামের মাথাটা আচমকা ঝাঁকি খেল পিছন দিকে। ঘুসির সাথে পা-ও চালিয়েছে রানা। কনুইয়ে লাথি খেয়ে পিস্তলটা ছেড়ে দিল আকরাম। টলমল করতে করতে পিছু হটল সে। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেল। দু'হাত দিয়ে চেপে ধরে আছে নাকটা।

'এটা দিয়ে তিনটে খুন করা হয়েছে,' বলল রানা, তারপর পা দিয়ে ঠেলে দিল পিস্তলটা আকরামের দিকে। 'তোমার কাছেই রাখো। কিন্তু মনে রেখো, ফের যদি টিনার সাথে খারাপ ব্যবহার করতে দেখি, হাত ভেঙে দেব আমি তোমার!'

পকেট থেকে রুমাল বের করে নাকের রক্ত মুছল আকরাম। ধীরে ধীরে ঝুঁকে পড়ে পিস্তলটা কুড়িয়ে নিল। তাক করল রানার দিকে নয়, টিনার দিকে। 'ওর মুখের ভেতর থেকে রুমালটা বের করো,' বলল সে। গলার আওয়াজ এতই শান্ত, অবাক হয়ে গেল রানা। 'বাইরে বেরুলে কারও চোখে পড়ে যেতে পারে। চিৎকার করলে, আমি গুলি করব, তখন আমাকে দোষ দিতে পারবে না কেউ। একটু একটু ঠাণ্ডা পড়েছে, ওকে একটা চাদর জড়িয়ে নিতে বলো, তা না হলে হাত দুটো দেখা যাবে। শাহেদ, চাদর আছে কিনা দেখো।' শাহেদ ওয়ারড্রোবের দিকে এগোল। টিনার দিকে আবার তাকাল আকরাম। 'চালাকি করতে গেলেই গুলি করব আমি। একজন বেঈমানের বোনকে গুলি করে মারতে একটুও হাত কাঁপবে না আমার।'

টিনার মুখ থেকে রুমালটা বের করে নিল রানা। শাহেদের হাত থেকে গরম একটা চাদর নিয়ে তার কাঁধে ফেলল, রশি দিয়ে বাঁধা হাত দুটো তাতে ঢাকা পড়ে গেল। টিনার একটা হাত ধরল রানা। 'চলুন, প্লীজ!'

'তুমি শালা এখনও দাঁড়িয়ে আছ কেন?' শাহেদের দিকে ফিরে খেঁকিয়ে উঠল আকরাম।

ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল শাহেদের চেহারা। সাথে সাথে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সে। তাকে অনুসরণ করল রানা আর টিনা। পিছনে থাকল আকরাম। মাঝে মধ্যে রুমাল দিয়ে নাকের রক্ত মুছছে সে।

সরাফত আলি একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির মালিক। ছুটির দিন, কর্মচারী বা কারিগররা নেই কেউ। অফিস কামরার ভেতরও খান কয়েক সেলাই মেশিন বসানো রয়েছে। মাথার ওপর সারি সারি হ্যাঙ্গার ঝুলছে। ডেস্কের ওপর রাজ্যের কাপড়। একটা সেলাই মেশিনের পিছনের সীটে বসল রানা। ওর সামনে একটা চেয়ারের হাতলে বসে আছে কেয়া, চোখে চঞ্চল দৃষ্টি, চেহারায় তিক্ততা। বারবার জানালা আর রানার দিকে তাকাচ্ছে সে।

ওদের সবার জন্যে লাঞ্চ তৈরি করতে বসেছে শাহেদ, কিচেন থেকে তার কাজের আওয়াজ ভেসে আসছে। আলু পটল ভাজার গন্ধে খিদেটা চাঙা হয়ে উঠল রানার।

অফিস কামরার পাশেই আরেকটা কামরা, কারিগররা সেখানে বসেই কাজ করে। তার পাশে সরাফত আলির বেডরুম। ওখানে রাখা হয়েছে টিনা আর সরাফত আলিকে। ওদের ওপর নজর রাখছে আকরাম। হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার কাজটা নিতে চায়নি সে, কিন্তু কেয়ার মারমুখো ভাব দেখে কথাও বাড়ায়নি।

সরাফত আলির অফিসে টিনাকে নিয়ে রানা ঢুকতেই কেয়ার সামনে পড়ে গিয়েছিল ওরা। মুহূর্তের জন্যে কেয়া আর টিনা পরস্পরের দিকে তাকিয়েছিল। তারপরই ঘৃণার সাথে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল কেয়া। তাকে পাশ কাটিয়ে ঘরের ভেতর দিকে টিনাকে নিয়ে সরে এসেছিল রানা।

হঠাৎ করে নিস্তব্ধতা ভাঙল কেয়া, 'তুমি বরং এখুনি টিনার সাথে কথা বলো। দ্বীপটা কোথায় জানতে চেষ্টা করো। সাথে করে ওকেও সেখানে নিয়ে যেতে হবে।'

সাথে না নিয়ে যে উপায় নেই সেটা এরই মধ্যে রানাও উপলব্ধি করতে শুরু করছে। মনে মনে উদ্বেগ বোধ করছে ও। কোন অবস্থাতেই কেয়ার কাছে একা রাখা যায় না টিনাকে, মুহূর্তের জন্যেও নয়। আবিদের ওপর এতই ঘৃণা তার, তার বোনকে একা পেলে নিজেকে সামলাতে পারবে না, ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটিয়ে বসবে। দ্বীপটা কোথায় তা একমাত্র টিনাই বলতে পারে। বলার পর ওকে এখানে রেখে যাওয়া সম্ভব নয়। পুলিসকে ইনফর্ম করতে পারে।

'হ্যাঁ, ওকে বোধহয় সাথে করে নিয়েই যেতে হবে,' বলল রানা। তোবড়ানো সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা ধরাল ও। 'কিন্তু সরাফতকে নিয়ে কি করব আমরা?'

'এখানে রেখে যাব। আমাদের সম্পর্কে কিছুই জানে না সে। তাছাড়া, আমরা যে টিনাকে নিয়ে গেছি সেটা অন্তত একজনের হলেও জানা উচিত। খবরটা রটলে আবিদের কানেও ঢুকবে। ঢুকলে বোনকে উদ্ধার করার জন্যে আসবে সে। তাকে ধরার জন্যে টিনাকে আমি টোপ হিসেবে ব্যবহার করতে চাই।'

'বোনকে উদ্ধার করতে আসবেই, তা ভাবছ কেন?'

'তাকে আমি চিনি, ভয়-ডর কাকে বলে জানে না। একমাত্র বোন, একমাত্র আপনজন, আসবে না মানে?' হাত দুটো শক্ত মুঠো হয়ে গেল কেয়ার। আগুনের মত জ্বলে উঠল চোখ।

'তার আগে অনেক কাজ সারতে হবে আমাদের। দ্বীপটা কোথায় জানলেই চলবে না, সেটাকে খুঁজে বের করতে হবে। বেশ লম্বা হবে জার্নিটা। ট্রেন আছে, বাস আছে, পায়ে হাঁটা আছে, বোধহয় ফেরিও আছে—খুব সহজে সেখানে পৌঁছানো যাবে বলে মনে হয় না। তার ওপর, দেশের সবক'জন পুলিস আমাদেরকে খুঁজছে।'

'ওসব আমি কেয়ার করি না,' দৃঢ় ভঙ্গিতে বলল কেয়া। 'খান-সেনাদের ফাঁকি দিতে পেরেছি, এদেরকেও পারব।'

'টিনা বলছে, ওর ভাই আবিদ মারা গেছে। ঠিক জানো, বেঁচে আছে সে? তোমরা কোথাও ভুল করছ না তো?'

'মারা গেছে? তুমি কি বলতে চাও জাফর আর মনসুরকে তারপর শামিমাকে আবিদের ভূত খুন করে রেখে গেছে?' বিদ্রূপের সুরে জানতে চাইল কেয়া। 'আমরা যদি মনে করি সে মারা গেছে, তাহলে তার খুব সুবিধে হয়ে যায়। এক এক করে নির্বিঘ্নে আমাদেরকে শেষ করতে পারে। বোনকে আগেই শিখিয়ে রেখেছে, সেই শেখানো বুলি আওড়াচ্ছে বোন। অথবা এমনও হতে পারে, টিনা জানে তার ভাই মারা গেছে। নিজের মৃত্যু সাজানোর ঘটনা এদেশে আগেও অনেক ঘটেছে।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'তা ঘটেছে। ঠিক আছে, টিনার সাথে কথা বলে দেখি। প্রথমে জানতে হবে দ্বীপটা কোথায়।' উঠে দাঁড়াল ও। 'আবিদের প্রসঙ্গ যখন উঠলই, কথাটা তাহলে তোমাকে এই সুযোগেই জানিয়ে দিই।'

'কি কথা?' ভুরু কুঁচকে উঠল কেয়ার।

'আবিদের ব্যাপারে তোমাদের আগের সিদ্ধান্ত পাল্টাতে হবে। তাকে যদি ধরতে পারি আমরা, পুলিসের হাতে তুলে দিতে হবে। আমার কথা পরিষ্কার বুঝতে পারছ তো? সে নিজেই এখন খুনী, কাজেই তাকে শাস্তি দেবার কথা তোমাদেরকে ভাবতে হবে না। পুলিস যদি তাকে হাতে পায়, তবেই শামিমার খুনের দায় থেকে রেহাই পাব আমি। তুমি বা আকরাম তাকে ছুঁতে পারবে না। সে এখন আমার। পরিষ্কার?'

ঠাণ্ডা একটুকরো হাসি দেখা গেল কেয়ার ঠোঁটে। 'এখনও তাকে আমরা ধরতে পারিনি। কে জানে, শেষ পর্যন্ত হয়তো নাগালের বাইরেই থেকে যাবে সে। এসো, চেষ্টা করে দেখা যাক কি হয়।'

ভাবভঙ্গি দেখেই বুঝে নিল রানা, কেয়াকে বিশ্বাস করা যায় না। ধরতে পারলে নিজের হাতে খুন করবে ওরা আবিদকে। ডিউকের কি হবে না হবে সে-ব্যাপারে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই ওদের। দ্রুত চিন্তা করে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছুল রানা। যেভাবেই হোক, দেরি করিয়ে দিতে হবে ওদেরকে। সবার আগে নাগালের মধ্যে পেতে হবে আবিদকে, আর কেউ ধরে ফেলার আগে ধরে ফেলতে হবে তাকে। আর ধরার পর, ওদের দু'জনের কাছ থেকে যত দূরে সম্ভব সরিয়ে ফেলতে হবে। আবিদকে পুলিসের হাতে তুলে না দেয়া পর্যন্ত খুব সাবধানে থাকতে হবে

ওকে। চিন্তায় পড়ে গেল রানা। বড় পিচ্ছিল আর জটিল রাস্তায় পা বাড়াচ্ছে সে।

কথা আর না বাড়িয়ে বেডরুমে চলে এল রানা। বোঝাপড়া করার সময় পড়ে আছে অনেক। কাঠের চেয়ারে বসে আছে টিনা আর সরাফত আলি, হাতদুটো পিছমোড়া করে বাঁধা। বিছানায় শুয়ে সিগারেট ফুঁকছে আকরাম, পাশেই পড়ে আছে মাউজারটা। মুখ তুলে তাকাল সে রানার দিকে, গম্ভীর হয়ে উঠল চেহারা।

'সরাফতকে নিয়ে বেরিয়ে যাও এখান থেকে,' বলল রানা।

বিছানা থেকে নেমে দাঁড়াল আকরাম। মাউজারটা হাতে চলে এসেছে। 'কারণ?'

'টিনার সাথে কথা বলব আমি।'

কয়েক সেকেন্ড রানার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল আকরাম। রানার মনে হলো, ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে রাজি হবে না সে। কিন্তু না, সরাফতের দিকে ফিরে বলল, 'এই যে পেটমোটা, গতর তোল্।' পিস্তল নেড়ে নির্দেশ দিল সে।

সরাফত আলির খোলা, ঝুলে পড়া মুখ দেখে রানার মনে হলো, লোকটার গলার ভেতর যেন আস্ত কই মাছ আটকে গেছে। ভাষা হারিয়ে ফেলেছে সে, চোখে বোবা দৃষ্টি। উঠে দাঁড়াতেই, হাঁটু দুটো পরস্পরের সাথে বাড়ি খেতে শুরু করল। পড়েই যাচ্ছিল, হাত বাড়িয়ে ধরে তাকে সিধে করল রানা। 'ঘাবড়াবেন না। কথা শুনলে কেউ কিছু বলবে না আপনাকে। ঘণ্টা কয়েক পর চলে যাব আমরা। তারপরই তো আপনি লোকাল হিরো বনে যাবেন। গল্পটা সবাইকে ইন্টারেস্টিং করে বলতে হলে এখন থেকে গুছিয়ে নিন।' মৃদু একটা ধাক্কা দিয়ে লোকটাকে দরজার দিকে ঠেলে দিল ও।

চার

'এবার একটু আরাম পাবেন,' টিনার কব্জির বাঁধন খুলে দিয়ে বলল রানা। 'অনেক কথা জানার আর জানাবার আছে, আপনি রেডি তো?'

হাতের কব্জি ডলতে শুরু করল টিনা, তাকিয়ে আছে রানার দিকেই, কিন্তু উত্তর করল না।

'প্রথমেই একটা বিপদের কথা বলি,' শুরু করল রানা, কিন্তু টিনার অপলক, শান্ত দৃষ্টির সামনে আড়ষ্ট, অস্বস্তি বোধ করল ও। 'আমি চাই আমার প্রতিটি শব্দের গুরুত্ব বোঝার চেষ্টা করবেন আপনি। আপনার ভাইয়ের এক কালের বন্ধু আকরাম একটা খুনী। আর মেয়েটা একটা নিউরটিক, সেই সাথে মাথায় ছিট আছে। শাহেদটা নিরীহ টাইপের, কিন্তু দুর্বল, আর ওদের দু'জনকে যমের মত ভয় করে। ওদের তিনজনকেই খুনের অভিযোগে খুঁজছে পুলিস। আমি এদের কেউ নই, গুণ্ডা-পাণ্ডা মানুষ—আমাকে ভাড়া করেছে ওরা টাকার বিনিময়ে। খুন-খারাবি আকরামের কাছে ডাল-ভাত, এ-ব্যাপারে তার কোন বিকার নেই। দু'জন পুলিস এবং নঈম বলে একজন লোককে খুন করেছে সে। আমরা, আমি এবং আপনি, কিছু করি বা

না করি, আকরাম যদি মনে করে ওদের বিরুদ্ধে কিছু করতে যাচ্ছি, কোন প্রমাণের জন্যে অপেক্ষা করবে না সে, প্রথম সুযোগেই আমাদেরকে খুন করার চেষ্টা করবে। এত কথা আপনাকে বলার কারণ হলো, পালিয়ে যাবার চেষ্টা করা কতটা বিপজ্জনক সেটা বোঝানো।'

'এসব যদি সত্যি হয়,' বলল টিনা, 'আপনি তাহলে ওদের সাথে আছেন কেন?'

'আমাকে ফাঁসিয়ে দেয়া হয়েছে—আটকা পড়েছি ফাঁদে। বলেছি, নঈমকে খুন করেছে আকরাম, তাই না? লোকটা গুলি খাবার কিছুক্ষণ আগে তার বাড়িতে ছিলাম আমি। ওখান থেকে আমাকে বেরিয়ে যেতে দেখেছে দারোয়ান। পুলিস তার কাছ থেকে আমার চেহারার বর্ণনা পেয়েছে। তাদের ধারণা, নঈমকে আমিই গুলি করেছি। এমনিতেও পুলিসের খাতায় অনেক খারাপ খারাপ কথা লেখা আছে আমার নামে। এই অবস্থায় আমি যদি ধরা পড়ি, অভিযোগ থেকে খালাস পাওয়া কঠিন হবে। হয়তো আটকে যাব। সেজন্যেই ওদের সাথে থাকতে হচ্ছে আমাকে। সময় এবং সুযোগ পেলে আমি প্রমাণ করতে চাইব, আমি নই, নঈমকে গুলি করেছে আকরাম।'

ধীরে ধীরে কজি ডলছে টিনা, চোখে অবিশ্বাস। 'বিশ্বাস করা তো দূরের কথা, আপনার কথা আমি বুঝতেই পারছি না। গাঁজাভরা ডিটেকটিভ নভেলেও এ-ধরনের গল্প পড়িনি কখনও। আপনার কথা বিশ্বাস করব কোন্ যুক্তিতে?'

'ও-ঘর থেকে আসছি আমি,' বলল রানা। 'পালাবার চেষ্টা করবেন না।' অফিস কামরায় ফিরে এল রানা। কেয়া আর আকরাম ফিসফিস করছে, ওকে দেখেই চুপ করে গেল। বিস্ফারিত চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে ছিল এতক্ষণ সরাফত আলি, রানাকে দেখে কাঁদ কাঁদ হয়ে উঠল চেহারাটা।

'আমি অন্যায় করেছি, আমাকে মাফ করে দিন!' ফুঁপিয়ে উঠল সরাফত আলি। 'আমার মাসুম বাল-বাচ্চারা দেশে আছে, আমাকে আপনারা মেরে ফেললে...'

'চোপ!' হুঙ্কার ছাড়ল আকরাম।

শিউরে উঠে মুখের সামনে কাঁপা হাত তুলে নাড়তে শুরু করল সরাফত আলি। আকরামের এক ধমকেই বোবা বনে গেছে সে।

গুছিয়ে রাখা পুরানো খবরের কাগজের থাক ঘেঁটে একটা সংখ্যা বেছে নিল রানা, ফিরে এল বেডরুমে। 'এই যে, পড়ে দেখুন এটা।' টিনার হাতে ধরিয়ে দিল কাগজটা। 'নঈম হত্যার বিবরণ। আমার চেহারার বর্ণনাও ছাপা হয়েছে।'

দ্রুত, ব্যস্ততার সাথে রিপোর্টটা পড়ল টিনা। তারপর হাত থেকে ছেড়ে দিল কাগজটা। পায়ের কাছে পড়ল সেটা। চেহারায় আগের সেই শান্ত ভাব নেই, ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছে। 'বুঝব কিভাবে লোকটাকে আপনি খুন করেননি?'

'আমাকে আপনি বিশ্বাস করুন বা না করুন, তাতে আমার কিছু আসে যায় না,' বলল রানা। 'আপনাকে নয়, আমি পুলিসকে বিশ্বাস করাতে চাইছি।'

মুখের চেহারা সামান্য একটু লাল হয়ে উঠল টিনার। তারপর হঠাৎ করে জানতে চাইল, 'এসবের সাথে আমার ভাইয়ের সম্পর্ক কি জানতে পারি?'

'কোন সম্পর্ক আছে তা কি আমি বলেছি একবারও?'

'সম্পর্ক যদি না-ই থাকবে, আপনি আমার কাছে এলেন কেন? আবিদের এত রকম কথা জানতে চাইলেন কেন? আপনি যে তার বন্ধু নন, সে আমি আগেই সন্দেহ করেছিলাম। আর ওই লোকটা, আকরাম, সে কেন আমার ভাইকে বেঈমান বলল? কি বোঝাতে চাইল সে?'

'আপনার ভাই মারা গেছে, এসবের মধ্যে তাকে জড়িয়ে লাভ নেই।'

'আমি বলছি মারা গেছে, কিন্তু ওরা কি তা বিশ্বাস করে?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইল টিনা।

'না। কিন্তু তাতে কি? বিশ্বাস না করলে মরা মানুষ তো আর জ্যান্ত হবে না।'

'শুধু ওরা নয়, বিশ্বাস আপনিও করেন না। শামিমাও করেনি।' দ্রুত, ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছে টিনা, চেহারায় সন্ত্রস্ত একটা ভাব ফুটে উঠল। 'এসবের মানে কি? তবে কি···তবে কি আবিদ মারা যায়নি? বেঁচে আছে জানে বলেই কি এখানে এসেছে ওরা? আবিদ কি কোন অন্যায় করেছে ওদের ওপর? প্রতিশোধ নিতে চায় ওরা? প্লীজ, সব কথা খুলে বলুন আমাকে! বেঁচে আছে সে?'

'এটা আপনার কি ধরনের প্রশ্ন হলো?' চটে উঠে বলল রানা। 'বেঁচে আছে কিনা জানতে চাওয়ার মানে? আপনিই তো বললেন আমাকে, ক্যান্সারে মারা গেছে সে।'

'চিঠিতে আমাকে তাই লেখা হয়েছিল···'

'চিঠিতে?' বাধা দিয়ে বলল রানা। 'কিসের চিঠি? কোত্থেকে, কে লিখেছিল? আপনি তার লাশ দেখেননি?'

'না। চিকিৎসা করাতে গিয়ে আমেরিকায় মারা যায় আবিদ,' বিড় বিড় করে বলল টিনা। 'চোখ, কিডনি এই সব ওখানকার হাসপাতালে দান করে যায় ও। ক্ষতবিক্ষত লাশটা ওরা আর ফেরত পাঠায়নি। নিউ ইয়র্ক সিটি হাসপাতাল থেকে ওদের ডিরেক্টর আমাকে একটা চিঠি লিখে জানিয়েছিল মৃত্যু সংবাদ।'

'ওটা একটা ফলস্ চিঠিও হতে পারে, পারে না?'

ঝট্ করে মুখ তুলে তাকাল টিনা। রাগের সাথে জানতে চাইল, 'আপনি বলতে চাইছেন আবিদ মরেনি, সে নিজেই নিজের মৃত্যুর সংবাদ তৈরি করেছিল?'

'ঠিক কি ঘটেছে বলা মুশকিল,' বলল রানা। 'তবে লাশ যখন দেখেননি, তার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা প্রচুর। অন্তত পাশের ঘরের ওরা বিশ্বাস করে, আবিদ মরেনি।'

'ওরা কি এখন আর তার বন্ধু নয়?'

এক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল রানা, 'না।'

'কেন?'

'কারণ অবশ্যই আছে। কিন্তু সে-সব কথা আপনার না জানাই ভাল।'

'আমার ভাই যদি বেঁচে থাকে, তাহলে কি কারণে ওরা তার শত্রু হয়ে গেল সেটা আমাকে জানতেই হবে,' দৃঢ় ভঙ্গিতে বলল টিনা। 'প্লীজ, সব কথা বলুন আমাকে। আমার কাছে আসার কারণ কি আপনাদের? আমাকে নিয়ে কি ভাবছে ওরা?'

'আপনাকে ওরা সাথে করে নিয়ে যেতে চায়। ওদের ধারণা, আবিদকে ধরা তাহলে সহজ হবে। আপনাকে টোপ বানিয়ে ফাঁদ পাতবে ওরা, আবিদ আপনাকে উদ্ধার করতে এসে ধরা পড়বে। এর বেশি আমি কিছু জানি না…'

'জানেন, অবশ্যই জানেন!' আবেদনের সুরে বলল টিনা। 'প্লীজ! আপনার দুটো পায়ে…'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'বেশ। পরে জানলেও জানবেন, এখন জানলেও জানবেন। তবে কথাটা আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা সন্দেহ আছে আমার। ওদের তিনজন, কেয়া, আপনার ভাই এবং শাহেদ পাঞ্জাবী সেনাদের হাতে ধরা পড়েছিল। পাঞ্জাবীদের কাছে ওদের কোন গুরুত্ব ছিল না, ছিল ওদের নেতা ফিরোজ ভাইয়ের। কেয়া আর শাহেদের ওপর অত্যাচার চালানো হয়, কিন্তু তবু ওরা ফিরোজ ভাইয়ের আস্তানার হদিস জানায়নি। অথচ আপনার ভাইকে পাঞ্জাবীরা ছোঁয়ওনি, আগেই গড় গড় করে সব কথা ফাঁস করে দেয় সে। ফিরোজ ভাই ধরা পড়ে, তাকে মেরে ফেলা হয়। সে জন্যেই ওরা আপনার ভাইকে খুঁজছে।'

বসে পড়ল টিনা। কাগজের মত সাদা হয়ে গেছে মুখের চেহারা। কিন্তু চোখ দুটো বাঘিনীর মত জ্বলছে। চোখের কোণে চিক চিক করে উঠল পানি। 'না! এ আমি বিশ্বাস করি না! এ হতে পারে না! মিথ্যে কথা। জঘন্য মিথ্যে কথা! আপনি আবিদকে চেনেন না তাই এ-কথা উচ্চারণ করতে পারলেন! না, অসম্ভব! আবিদ বেঈমানী করতে পারে না! কোথাও ভুল করছে ওরা, না হয় এর পিছনে অন্য কোন কারণ আছে। আবিদকে আমার চেয়ে ভাল কেউ চেনে না। আমি জানি, আমার ভাই এ কাজ করতে পারে না!'

একটা সিগারেট ধরাল রানা। টিনার দিকে তাকাল না। বলল, 'আমাকে যা বলা হয়েছে, আমি তাই আপনাকে শোনালাম। প্রশ্ন হলো, মিথ্যে কথা বলে লাভ কি ওদের? আবিদ যদি বেঈমানী নাই করে থাকবে, ওরা তাহলে এত বছর পর প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে তাকে ধরতে এসেছে কেন?'

'নিশ্চয়ই কোথাও ভুল করেছে ওরা! আবিদ বেঈমানী করেছে এ আমি বিশ্বাস করি না!'

'কেউ আপনাকে বিশ্বাস করতে বলছেও না,' নীরস সুরে বলল রানা। 'ওরা বিশ্বাস করে, ওদের কাছে সেটাই যথেষ্ট।'

'আপনিও বিশ্বাস করেন, আবিদ বেঈমানী করেছে, তাই না?'

'আবিদ কি করেছে না করেছে তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।'

'তা না থাকুক, কিন্তু আপনি বিশ্বাস করেন, তাই না।'

করি, মনে মনে বলল রানা। শাহেদের মুখ থেকে শোনা ঘটনাটায় ফাঁক-ফোকর নেই কোথাও, অন্তত তার চোখে পড়েনি। কাজেই প্রশ্ন করে ফুটো খোঁজার চেষ্টা চালায়নি সে। মেয়েটা দুঃখ পাচ্ছে দেখেও প্রভাবিত হলো না ও, আসলে শাহেদের কাহিনীটাই বিশ্বাস করে সে। বলল, 'এমন একটা পরিস্থিতিতে গোপন তথ্য ফাঁস করে দিয়েছে আবিদ, দোষ দেয়া যায় না তাকে…'

'দোষ দেয়া যায় না?' হাতের মুঠো শক্ত করে মুখের সামনে তুলল টিনা, রানার মনে হলো এই বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। 'কিন্তু আমি দিই! আবিদ যদি তার

বন্ধুদের সাথে বেঈমানী করে থাকে, নরকে পচে মরলেও আমার তাতে কিছু আসবে যাবে না। কিন্তু আমি জানি, সে বেঈমানী করেনি।' অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল টিনা, চোখের পানি আটকে রাখার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে। 'আবিদ আমার ভাই বলে বলছি না, সে কখনোই এ-ধরনের কাজ করবে না! নিজের প্রাণের প্রতি কোনও মায়া ছিল না ওর।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'শান্ত হোন! কথাটা আপনাকে জানানোই উচিত হয়নি আমার।'

ঝট্ করে রানার দিকে ফিরল টিনা। 'আবিদ বেঁচে আছে?'

'হ্যাঁ। বেঁচে আছে। কোন সন্দেহ নেই।'

চেয়ারের ওপর টিনার শরীরটা যেন নেতিয়ে পড়ল। ধীর পায়ে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা, তাকিয়ে থাকল উল্টোদিকের বাংলোর দিকে। অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না।

তারপর জানতে চাইল টিনা, 'ওর কি খুব বিপদ?'

'বলা মুশকিল,' বাইরে তাকিয়ে থেকেই বলল রানা, 'কোণঠাসা করতে পারলে তাকে ওরা গুলি করবে। কিন্তু তার সম্পর্কে ওদের মুখে যা শুনেছি, তাতে মনে হয় সে একাই একশো। নিজেকে কিভাবে রক্ষা করতে হয় তা তার জানা আছে।'

আবার কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার মধ্যে কাটল, তারপর টিনাই প্রথম কথা বলল, 'আমাকে নিয়ে কি করতে যাচ্ছে ওরা?'

জানালার দিকে পিছন ফিরল রানা। 'খুলনার ওদিকে আবিদের একটা দ্বীপ আছে নাকি?'

বিস্মিত দেখাল টিনাকে। 'হ্যাঁ, আছে। আপনি জানলেন কিভাবে?'

'দ্বীপটা কোথায় জানেন আপনি?' পাল্টা জানতে চাইল রানা।

'অবশ্যই! দ্বীপটা তো এখন আমার। কেন জানতে চাইছেন?'

'ওখানেই যাচ্ছি আমরা। আপনাকেও আমরা নিয়ে যাব ওখানে।'

'ও, বুঝেছি! আপনাদের ধারণা, ওখানে গেলে আবিদকে পাবেন?'

'আমার কোন ধারণা নেই। তবে ওদের বিশ্বাস, আপনার পিছু পিছু সেখানে যাবে আবিদ।'

চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল টিনার। 'তা যাবে। আমি আছি জানলে অবশ্যই যাবে।'

ভাইয়ের ওপর টিনার অগাধ বিশ্বাস লক্ষ্য করে অস্বস্তি বোধ করল রানা। 'এত জোর দিয়ে বলছেন কিভাবে? আঠারো মাস আপনাকে দেখা দেয়নি সে।'

টিনার চেহারায় অদ্ভুত একটা বিশ্বাসের জ্যোতি ফুটে উঠল, বিড়বিড় করে বলল, 'আপনি তাকে চেনেন না। ওখানে আমি আছি শুনলে সে আসবেই। বিপদের ভয়ে পিছিয়ে থাকবে, ভুলেও একথা ভাববেন না। ভয় কাকে বলে জানা নেই আবিদের।' কি যেন একটা গভীর চিন্তায় ডুবে গেল টিনা। তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ করে মনে হলো রানার, আরে! প্রথম দর্শনে একেবারে আটপৌরে, অতি সাধারণ বলে মনে হয়েছিল মেয়েটাকে, কিন্তু এখন সেই

মেয়েকেই এত আকর্ষণীয় লাগছে কেন?

হঠাৎ কথা বলে উঠল টিনা। 'আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব, দয়া করে মিথ্যে উত্তর দেবেন না। উত্তরটা আমার জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ! আমি জানতে চাই: আপনি ওদের দলেই থেকে যাবেন, নাকি আমার দলে আসবেন?'

এ-ধরনের কিছু আশা করেনি রানা, বোকার মত তাকিয়ে থাকল ও। 'মানে?'

'আমার ওপর বিশ্বাস রাখুন—এই কথাটা বারবার বলেছেন আপনি। কেন?'

'কেন আবার, আপনাকে বিপদের মধ্যে টেনে নিয়ে এসেছি বলে। আপনাকে সাহায্য করতে চাই বলে। আপনার এই বিপদের জন্যে আমিই দায়ী...'

'অবশ্যই,' বলল টিনা। 'এখনও কি আপনি আমাকে সাহায্য করতে চান?'

'নিশ্চয়ই চাই,' একটু বিরক্ত হয়ে বলল রানা। 'আপনার যাতে কোন ক্ষতি না হয় সেদিকটা দেখব আমি।'

'আপনি আমাকে বলেছেন, ওদের সাথে আছেন শুধুমাত্র একটি কারণে—মিথ্যে খুনের দায় থেকে রেহাই পাবার জন্যে। এর মানে দাঁড়ায়, আপনি ওদের বিরুদ্ধে। আমিও তাই। কাজেই দু'জনে মিলে জোট বাঁধাটাই কি বুদ্ধিমানের কাজ নয়?'

অবাক হয়ে টিনার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর মৃদু হাসল রানা। বলল, 'আপনার তো সাংঘাতিক বুদ্ধি!'

'এবং আপনি দেখতে পাবেন, আমার চেয়েও অনেক বেশি বুদ্ধি রাখে আবিদ,' বলল টিনা। 'সে যদি বেঁচে থাকে, তার যদি বিপদ হয়, কোন সন্দেহ নেই, আমি তাকে সাহায্য করব। আমি চাই, আপনিও তাকে সাহায্য করুন। তার বিরুদ্ধে আপনার কোন অভিযোগ নেই, নাকি আছে?'

ইতস্তত একটা ভাব দেখা গেল রানার চেহারায়। কিন্তু আবিদ যে খুনী, কথাটা টিনার মুখের ওপর বলতে পারল না ও। 'আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করব ওরা যাতে তাকে গুলি করতে না পারে।'

'ফিরোজ চৌধুরীর সাথে বেঈমানী করেনি সে,' জোর দিয়ে বলল টিনা। 'ফিরোজ চৌধুরী তার বন্ধু ছিল, বন্ধুর জন্যে প্রাণ দিতে পারত সে। জানি আপনি বিশ্বাস করছেন না। কিন্তু সময় আসুক, নিজেই বুঝতে পারবেন। নিরিবিলি দ্বীপে তার সাথে দেখা হলে বুঝবেন।'

'দ্বীপের নাম নিরিবিলি?'

'হ্যাঁ। পশুর নদী আর বঙ্গোপসাগরের মোহনায়, সুন্দরবনের গা ঘেঁষে ওটা একটা নির্জন দ্বীপ। কোন লঞ্চ বা নৌকোর পথে পড়ে না। লঞ্চ ভাড়া নিয়ে পশুর নদীর তীরে নামতে হয়, তারপর খানিকটা হেঁটে পৌঁছুতে হয় আমাদের নিজস্ব জেটিতে, সেখান থেকে দ্বীপে যাবার ব্যবস্থা আছে।'

'আপনি ওখানে নিয়ে যেতে পারেন আমাদের? গেছেন কখনও?'

মাথা ঝাঁকাল টিনা।

'নিয়ে যাবেন?'

সাথে সাথে, কোন রকম ইতস্তত না করে বলল টিনা, 'যাব।'

ভুরু কুঁচকে উঠল রানার। 'ব্যাপারটা কি বলুন তো? কি মনে করে রাজি হয়ে গেলেন?'

'আবিদ ঢাকায় মানুষ হয়েছে বটে, কিন্তু ওর ছেলেবেলা কেটেছে ওই নিরিবিলি দ্বীপে। আমি চাই ওরা তিনজন ওখানেই দেখা করুক তার সাথে। দ্বীপটা যে কি ভয়ঙ্কর, যে না গেছে তার পক্ষে ধারণা করাও সম্ভব নয়। দু'পা এগোলেই লুকোবার জায়গা। হঠাৎ কোথাও কিছু নেই, ঘন কুয়াশায় সব ঢাকা পড়ে যায়, বিশেষ করে এই নভেম্বরের দিকে। তারপর ধরুন, চোরাবালি। আমরা, আমি আর আবিদ, দ্বীপের প্রতিটি ইঞ্চি চিনি।' টিনার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'কেন নিয়ে যাব না, একশো বার নিয়ে যাব! মজাটা টের পাবে ওরা! আই ক্যান প্রমিজ ইউ দ্যাট!'

পাঁচ

কখন রাত নামবে তার অপেক্ষায় সরাফত আলির অফিসে অপেক্ষা করছে ওরা।

জানালার পাশে, দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আকরাম, নিজের ব্যাগ থেকে কোট বের করে পরেছে সে, হাত দুটো পকেটের গভীরে ঢুকে আছে। ঠোঁটে ঝুলছে তোবড়ানো একটা সিগারেট। তার কাছেই, একটা আর্মচেয়ারে বসে ঝিমোচ্ছে কেয়া। তন্দ্রা একটু গভীর হলেই, আচমকা সারা শরীর ঝাঁকি খাচ্ছে তার, ঘুমের মধ্যে আঁতকে আঁতকে উঠছে। ওদের উল্টোদিকে বসে আছে শাহেদ। চেয়ারের হাতলে কনুই, হাতের ওপর মাথা। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে মেঝের দিকে। বিষণ্ণ চেহারা। সারাটা বিকেল চুপচাপ আছে সে।

অফিস কামরার শেষ মাথায় একটা লম্বা বেঞ্চিতে বসে আছে টিনা আর রানা। নোংরা একটা পর্দা ঝুলছে রশির সাথে, তিনজনের দলটা থেকে ওদেরকে আলাদা করে রেখেছে সেটা। কেউ কিছু বলছে না বা করছে না, কিন্তু উত্তেজনায় টান টান হয়ে আছে কামরার পরিবেশ। টিনা যাতে কেয়ার সামনে পড়ে না যায় সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে রানা। জানে, আবার যদি দু'জন মুখোমুখি হয়, একটা অঘটন ঘটে যেতে পারে।

টিনার সাথে পরামর্শ করে নিরিবিলিতে পৌঁছুবার একটা রুট তৈরি করে নিয়েছে রানা। শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়েছে, খুলনা পর্যন্ত ট্রেনে যাবে ওরা। ওখান থেকে নিয়মিত লঞ্চ সার্ভিস ধরে পৌঁছুবে সুন্দরবনে। তারপর পায়ে হেঁটে জেটি, সেখান থেকে টিনাদের পারিবারিক মোটরবোট নিয়ে দ্বীপে। মেইনল্যান্ড থেকে দ্বীপে যাবার জন্যে জেটিতে ওটা সব সময় থাকে।

রাত না নামা পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই ওদের। পুলিস দু'জন আর ফিরে আসেনি। রানা ধরে নিয়েছে, কাগজে ছাপা ওর চেহারার বর্ণনা এখনও হয়তো পড়েনি তারা। কিংবা পড়লেও, মিলটা ধরতে পারেনি।

ঘড়ি ধরে আধ ঘণ্টা পর পর জানালার কাছ থেকে সরে যাচ্ছে আকরাম, কারিগরদের বসার ঘর পেরিয়ে বেডরুমে ঢুকছে, দেখে আসছে সরাফত আলিকে। বিছানার সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে তাকে। যাবার সময় প্রতিবার রানা আর টিনাকে পাশ কাটাতে হচ্ছে, প্রতিবার টিনার দিকে কটমট করে তাকাচ্ছে আকরাম।

যতবার তার সাথে চোখাচোখি হলো ততবার শিউরে উঠল টিনা। অভয় দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা করল রানা, কিন্তু উত্তরে বড় বড় চোখ মেলে ওর মুখের দিকে বোবার মত তাকিয়ে থাকল শুধু, কিছু বলল না।

সাতটার দিকে অন্ধকার বেশ জমাট বাঁধল। কেউ কিছু বলার আগেই জানিয়ে দিল কেয়া, 'এখুনি নয়। আরও রাত হোক।'

অলস ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল শাহেদ। 'খেয়েদেয়ে বেরুনোই ভাল,' বলে কিচেনে গিয়ে ঢুকল সে।

বেঞ্চি ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানাও। বসে থাকতে থাকতে আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে হাত-পা। আড়মোড়া ভাঙল ও। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে জানালার সামনে, ঠিক আকরামের পাশে এসে দাঁড়াল। আবার একবার আঁতকে উঠে চোখ মেলল কেয়া। খাড়া হয়ে গেল শিরদাঁড়া।

'কতক্ষণ ঘুমিয়েছি? ক'টা বাজে? রওনা হবার সময় হলো?' দ্রুত, উত্তেজিত কণ্ঠে জানতে চাইল সে।

'সোয়া সাতটা। দেরি আছে।' বলার সময় সরাসরি না তাকিয়েও টের পেল রানা, চোখে সন্দেহ নিয়ে ওকে লক্ষ করছে আকরাম। 'আরও অন্তত এক ঘণ্টা।'

জানালা দিয়ে আকাশ দেখল রানা। ঘন কালো মেঘে ঢাকা পড়ে আছে। রীতিমত শীত শীত করল ওর। বৃষ্টি নামবে। 'বৃষ্টি হলে ভালই হয়,' বলল ও। 'রাস্তা পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

'লোকজন হয়তো থাকবে না, কিন্তু পুলিস থাকবে,' বলল কেয়া। 'খুব সাবধানে বেরুতে হবে আমাদের।'

'দেরি করে বেরুতে চাইছ,' কঠিন সুরে জানতে চাইল আকরাম, 'তোমার কোন মতলব নেই তো?'

'নিশ্চয়ই আছে,' কঠোর কণ্ঠে বলল রানা, 'কিন্তু তোমাকে জানাব কেন?' বলে আর ওখানে দাঁড়াল না, চলে এল কিচেনে। রান্নার কাজ শুরু করে দিয়েছে শাহেদ।

'কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো?' জানতে চাইল রানা। 'বললে আমি সাহায্য করতে পারি তোমাকে।'

'ওরা দু'জন আমার সাথে কথাই বলছে না!' ফিসফিস করে বলল শাহেদ। ভয়ে আর উদ্বেগে দুর্বল হয়ে পড়েছে সে। 'আমার এখন যেমন লাগছে, নঈমেরও বোধহয় ঠিক এমনি লেগেছিল! যে-কোন মুহূর্তে কিছু একটা ঘটিয়ে বসতে পারে ওরা, এই আশঙ্কাটা মন থেকে কোন মতে সরাতে পারছি না। এই রকম চলতে থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব।'

'মনকে বোঝাও, দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই,' বলল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে খোলা দরজার দিকে তাকাল ও, ওর দিকে পিছন ফিরে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে আকরাম। 'দু'জনের বিরুদ্ধে আমরা এখন তিনজন। টিনা আমাদের দলে।'

'ওদের বিরুদ্ধে কিই-বা করার ক্ষমতা রাখে টিনা!' হতাশ ভঙ্গিতে বলল শাহেদ।

'দ্বীপে পৌঁছে আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবে ও।'

'যদি পৌঁছাই! তোমার চেয়ে ওদের দু'জনকে বেশি চিনি আমি। এমন নিষ্ঠুর জুটি দুনিয়ায় আর দ্বিতীয়টি আছে কিনা সন্দেহ। আমি ওদের শত্রু হয়ে গেছি, এক বিন্দু বিশ্বাস করে না...' আচমকা অস্পষ্ট একটা চাপা গোঙানি শুনে থেমে গেল শাহেদ। দেখল, লম্বা পা ফেলে এরই মধ্যে দরজার কাছে পৌঁছে গেছে রানা।

রানার কাছে আসার জন্যে পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়েছে টিনা, এই সময় কিচেনের দিকে আসছিল কেয়াও। সামনে টিনাকে দেখতে পেয়েই হিংস্র বাঘিনীর মত হয়ে উঠল কেয়ার চেহারা। আঁতকে উঠে পিছিয়ে যাবার চেষ্টা করল টিনা, কিন্তু খপ্ করে তার একটা হাত ধরে ফেলেছে কেয়া। দ্রুত ওদের পাশে এসে দাঁড়াল রানা, একটা হাত রাখল কেয়ার কাঁধে, হ্যাঁচকা টান দিয়ে সরিয়ে আনল তাকে। কেয়ার হাত থেকে ছুটে গেল টিনা। দু'চোখে রাজ্যের ঘৃণা নিয়ে টিনার দিকে তাকিয়ে থাকল কেয়া।

'যথেষ্ট হয়েছে,' কঠিন সুরে বলল রানা, 'বাড়াবাড়ি করলে ভাল হবে না!'

ধীরে ধীরে রানার দিকে ফিরল কেয়া। তার চোখের দৃষ্টি দেখে অবাক হয়ে গেল রানা। মনে হলো, রানাকে যেন চিনতে পারছে না কেয়া। পরমুহূর্তে বিদ্যুৎ খেলে গেল তার শরীরে। দু'হাতের দশটা আঙুল বাঁকা করে রানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সে।

তৈরিই ছিল রানা, খপ্ করে কেয়ার কব্জি দুটো ধরে ফেলে সামনের দিকে ঠেলে দিল তাকে। টলতে টলতে পিছিয়ে গেল কেয়া, পিঠ ঠেকল দেয়ালে।

'শান্ত হও, কেয়া!' সাবধান করে দেবার সুরে বলল রানা। 'টিনার গায়ে হাত দিলে আমি তা সহ্য করব না!'

দেয়ালে হেলান দিল কেয়া, বিড়বিড় করে কি যেন বলার চেষ্টা করল, কিন্তু গলার ভেতর থেকে কোন আওয়াজ বেরুল না। ভারী আর অনিয়মিত হয়ে উঠল নিঃশ্বাস, মনে হলো শ্বাস কষ্ট শুরু হয়েছে তার। ধীরে ধীরে অদ্ভুত একটা পরিবর্তন ঘটতে শুরু করল তার মধ্যে। কোটরের ভেতর চোখ দুটো দ্রুত ঘুরপাক খাচ্ছে। মুখের পেশী কেমন যেন আড়ষ্ট, টান টান হয়ে উঠল। পরস্পরের সাথে সেঁটে থাকা দাঁতের ফাঁক দিয়ে হিসহিসে নিচু একটা আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে তিন বার প্রচণ্ডভাবে মাথা ঝাঁকি দিল সে। এলোমেলো হয়ে গেল মাথার চুল। সম্পূর্ণ উন্মাদিনীর চেহারা।

'সরে যাও!' চিৎকার করে বলল শাহেদ। 'সাবধান! ওর কোন হুঁশ নেই! এই রকম আগেও হতে দেখেছি আমি...'

দ্রুত এক পা পিছিয়ে এল রানা। মাঝপথে টিনার নিঃশ্বাস বন্ধ করার আওয়াজটা কামরার সবাই পরিষ্কার শুনতে পেল। কেয়ার চোখ জোড়া আগের চেয়ে দ্রুত ঘুরছে, দেখে হতভম্ব হয়ে পড়েছে সবাই। দেয়াল থেকে পিঠ তুলে রানার দিকে এগোল সে। মুখের দু'পাশে তোলা হাতের দশটা আঙুল বাঁকা হয়ে আছে। খুব সাবধানে, একটু একটু করে এগিয়ে আসছে কেয়া। যেন তাড়াহুড়ো করলে শিকার পালাবে।

চুপচাপ সব লক্ষ করছিল আকরাম। হঠাৎ রানা আর কেয়ার মাঝখানে এসে

দাঁড়াল সে। কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে, ইতস্তত না করে, হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কেয়ার চোয়ালে আঘাত করল, ঠাস করে শব্দ হলো একটা। পড়ে যাচ্ছিল কেয়া, আকরামই তাকে ধরে ফেলল। ধীরে ধীরে তাকে মেঝেতে শুইয়ে দিল সে। জ্ঞান হারিয়েছে কেয়া। আশ্চর্য মমতার সাথে তার একটা চোখের পাতা সরিয়ে ভেতরটা দেখল আকরাম। পালস রেট পরীক্ষা করল। তারপর সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে তাকাল রানার দিকে।

বলল, 'শাহেদকে বলো একটা বালিশ নিয়ে আসুক।' শাহেদ নয়, হাত বাড়িয়ে বিছানা থেকে রানাই একটা বালিশ তুলে নিয়ে ধরিয়ে দিল আকরামের হাতে। নড়াচড়া করবে, শাহেদ যেন সে শক্তিও হারিয়ে ফেলেছে। দু'চোখে আতঙ্ক, তাকিয়ে আছে অচেতন কেয়ার মুখের দিকে।

রানা দেখল, অত্যন্ত যত্নের সাথে কেয়ার মাথার নিচে বালিশ রাখল আকরাম। এই প্রথম আকরামকে ম্লান, বিষণ্ণ দেখল ও। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছল রানা। সামান্য হলেও, নার্ভাস হয়ে পড়েছিল ও। উপলব্ধি করল, কেয়া সম্পর্কে ওর প্রথম ধারণাটাই ঠিক ছিল। মেয়েটা সুস্থ নয়, মেন্টাল কেস। পাগল হতে খুব বেশি দেরি নেই আর।

'আমার ব্যাগে ব্র্যান্ডি আছে, ওর জন্যে আনব একটু?' খানিক ইতস্তত করে জানতে চাইল রানা। অসুস্থ কাউকে দেখলে অস্বস্তি বোধ করে ও।

'ঠিক হয়ে যাবে, আর কিছু করবে না ও,' মৃদু কণ্ঠে বলল আকরাম। লোমশ, নিষ্ঠুর হাত জোড়া আশ্চর্য কোমল ভঙ্গিতে ঠিকঠাক করে দিল বালিশটাকে। 'এখন কিছুক্ষণ ঘুমাবে ও।' উঠে দাঁড়িয়ে রানার দিকে তাকাল সে। 'এর আগেও বেশ ক'বার এই রকম অ্যাটাক হয়েছে। আশ্চর্য হবার কিছু আছে কি?' চোখের কোণ দিয়ে টিনার দিকে তাকাল সে। পিছিয়ে গিয়ে দূর থেকে কেয়ার দিকে তাকিয়ে আছে সে। সন্ত্রস্ত, ফ্যাকাসে। 'কেয়ার ওপর যে ধরনের অত্যাচার চালানো হয়েছে তার কোন তুলনা হয় না। ও যে আজও বেঁচে আছে সেটাই তো আশ্চর্য!'

'কিন্তু রোগটা সাংঘাতিক,' টিনার পাশে সরে এসে বলল রানা। 'এর চিকিৎসা হওয়া দরকার।'

'দরকার তো অনেক কিছু,' বলল আকরাম। 'কিন্তু সময় পেতে হবে তো? ভাল কথা, যা ঘটে গেল তা যেন বলা না হয় কেয়াকে। ঘুম থেকে ওঠার পর কিছুই মনে করতে পারবে না ও। রোগটা সাংঘাতিক বলছ, আসলে তা নয়। নার্ভগুলো অস্থির হয়ে ওঠে, তার বেশি কিছু না।'

'বোকার মত কথা বলো না,' বলল রানা। 'বদ্ধ উন্মাদের মত লাগল ওকে। ওর চিকিৎসা দরকার। দেরি করলে রোগটা সারানো যাবে না।'

'আমি তা মনে করি না,' বিদ্রূপের হাসি দেখা গেল আকরামের ঠোঁটে। 'আর চিকিৎসার কথা যদি বলো, কি ওষুধে ভাল হবে কেয়া আমি সেটা বলে দিতে পারি।'

'তুমি আবার ডাক্তারীও জানো নাকি?'

'ওষুধটার নাম আবিদ। আমরা আবিদকে পেলেই আবার সুস্থ হয়ে উঠবে কেয়া।' ঠাণ্ডা হাসি দেখা গেল আকরামের ঠোঁটে। তার সেই হাসি দেখে

শিরদাঁড়ার কাছে ভয়ের শীতল একটা অনুভূতি হলো টিনার।

চোখ মেলে কেয়া দেখল, পাশে বসে আছে আকরাম, নরম হাতে নাড়া দিচ্ছে তাকে।

'এই তো!' বলল আকরাম। 'কেমন লাগছে এখন?'

কেয়ার মনে হলো, অনেক দূর থেকে কথা বলছে আকরাম। কিছু বলতে গিয়ে হঠাৎ করে অনুভব করল, তার মাথা ব্যথা করছে। কেন, মাথাব্যথা করছে কেন? কোন উত্তর খুঁজে না পেয়ে চঞ্চল হয়ে উঠল কেয়া। আকরামের দিকে তাকাল সে। চারকোনা মুখটা পরিষ্কার দেখতে পেল না সে, কিন্তু কাঠামোটা অচেনা নয়। উঠে বসার চেষ্টা করল সে। পিঠে আকরামের হাত অনুভব করল, তাকে সাহায্য করতে চাইছে।

'লাগবে না, হাত সরাও,' বলল বটে কেয়া, কিন্তু সেই সাথে একটা হাত উঠে গেল মাথায়। বসতে গিয়ে মাথার ব্যথাটা আরও যেন তীব্র হয়ে উঠল। তারপরই বুঝতে পারল, শুয়ে আছে মেঝেতে। শক্ত করে আকরামের একটা হাত চেপে ধরল সে। চোখে ভয় নিয়ে তাকাল। 'কি হয়েছে বলো তো? কি করেছি আমি?'

'জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলে,' হালকা সুরে বলল আকরাম। 'ভাল না লাগলে উঠো না। ব্যস্ততার কিছু নেই। বেরুবার সময় এখনও হয়নি আমাদের। ডিউক গাড়ি যোগাড় করতে গেছে, কিন্তু ফিরতে তার দেরি হবে বলে মনে হচ্ছে।'

'জ্ঞান হারিয়েছিলাম? জীবনে কখনও জ্ঞান হারাইনি আমি। মিথ্যে কথা বলছ তুমি।' আকরামের মাংসের ভেতর ডেবে গেল কেয়ার নখ। 'কি হয়েছে বলো আমাকে!'

'বললাম তো, অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে। আতঙ্কিত হবার মত কিছু ঘটেনি।'

কিন্তু আকরাম যে মিথ্যে কথা বলছে বুঝতে অসুবিধে হলো না কেয়ার। ধীরে ধীরে বিকৃত হয়ে উঠল তার চেহারা। মনে হলো, কেঁদে ফেলবে। 'লুকিয়ো না, আকরাম। জানতে দাও আমাকে! বলো, কি হয়েছিল? ফের বুঝি অ্যাটাক হয়েছিল?' ধরে থাকা আকরামের হাতটা ঝাঁকি দিল সে। তীক্ষ্ণ চোখে তার মুখের রেখা দেখে মনের কথা পড়ার চেষ্টা করছে। 'সেই আগেরটার মত? বলো, চুপ করে থেকো না!'

আকরামকে ইতস্তত করতে দেখে যা বোঝার বুঝে নিল কেয়া।

'মাগো!' দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল সে। 'আমি কি তাহলে শেষ পর্যন্ত পাগলই হয়ে যাব?' হাত সরিয়ে আকরামের দিকে তাকাল। 'কতক্ষণ ভুগেছি? সিরিয়াস টাইপের অ্যাটাক? খারাপ কিছু করেছি? সব বলো আমাকে!'

'আরে না, সিরিয়াস কিছু না,' হালকা সুরে বলল আকরাম। 'আমরা তো কিছু টেরই পাইনি। মনে করেছিলাম, তুমি বোধহয় জ্ঞান হারিয়েছ।' কেয়ার চেহারায় অসুস্থতার লক্ষণ ফুটে উঠতে দেখে আবার তাড়াতাড়ি বলল সে, 'মনটাকে শক্ত করো, মনে করো আর কখনও এ-ধরনের কিছু ঘটবে না। তাছাড়া, দুশ্চিন্তা করার মত কিছু ঘটেওনি।'

বোধহয় নিজের অজান্তেই, চোয়ালের কাছে উঠে গেল কেয়ার হাত, ব্যথা

লাগতেই উহ্ করে উঠল। 'ব্যথা লাগছে কেন? আমাকে মারতে হয়েছে তোমার?'

'আরে না!' অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে হাত নেড়ে বলল আকরাম। 'ব্যাপারটা ভুলে যাও। বললাম তো, সিরিয়াস কিছু না।'

'মারতে হয়েছে,' ম্লান হয়ে গেল কেয়ার চেহারা, 'অথচ বলছ কিছু না।' আবার আকরামের হাত চেপে ধরল সে। 'শেষ পর্যন্ত আমার কি হবে বলো তো, আকরাম? আমি বুঝতে পারি, মাথাটা ঠিক থাকছে না। হঠাৎ হঠাৎ এমন প্রচণ্ড ব্যথা হয়, মনে হয় দা দিয়ে কেটে ফেলি ওটা। আকরাম, আমার বোধহয় ভাল চিকিৎসা দরকার। তা না হলে আমি পাগল...'

'যত সব অলক্ষুণে কথা! একটানা অনেক দিন টেনশনে থাকলে সবারই এই রকম হতে পারে। তাছাড়া, তোমার ওপর যা অত্যাচার করা হয়েছে... তোমার আসলে বিশ্রাম দরকার, বুঝলে? তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

আকরামের হাত ছেড়ে দিয়ে বিড়বিড় করে বলল কেয়া, 'শেষ পর্যন্ত কি হবে আমার? আমি কি...?'

আকরামের চেহারা থেকে কোমল ভাবটা মুছে গেল, কঠোর হয়ে উঠল চোখ দুটো। 'আবিদকে পাবার পর আর কি চাওয়ার থাকতে পারে আমাদের? ওকে যদি শাস্তি দিতে পারি, আমার আর বেঁচে না থাকলেও চলবে। তোমার চিন্তাভাবনা আমার চেয়ে আলাদা কিছু?'

আকরামের হাতে মাথা রাখল কেয়া, আঙুল দিয়ে কপালের দু'পাশ টিপে ধরল। 'কিন্তু সত্যিই কি তাকে পাব আমরা? যদি পাই, আমরা সবাই শেষ হয়ে যাব। আবিদকে খুন করার পর বেঁচে থাকার জন্যে লড়াই করার আর কোন উদ্দেশ্য থাকবে না আমাদের।'

'সাজিয়া মারা যাবার পর থেকে আমার জীবন শেষ হয়ে গেছে!' বিড়বিড় করে বলল আকরাম। 'কিন্তু এসব কথা এখন থাক। হাতে অনেক কাজ।'

আবার আকরামের একটা হাত ধরল কেয়া। 'তুমি না থাকলে কি যে হত, ভাবতেও পারি না। তোমার সাথে ঝগড়া করি, মাঝে মধ্যে পরস্পরকে ঘৃণা করি আমরা, কিন্তু প্রয়োজনের সময় দেখি তুমি ঠিকই আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছ।'

চেহারায় এবং মনে কোমল ভাবটা এখন আর ধরে রাখতে পারছে না আকরাম। কাজের কথা ভুলতে পারছে না ও। কেয়ার সাথে বিশ মিনিট কাটিয়ে ওর মধ্যে যেটুকু কোমলতা ছিল তা নিঃশেষ হয়ে গেছে। কেয়া সুস্থ বোধ করুক, নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াক, মনে মনে এখন সেটাই চাইছে। কেউ অসহায় বোধ করলে তাকে সহ্য করতে পারে না আকরাম।

একটু চড়া গলায় বলল, 'আমাদের একটা কমন শত্রু আছে। তাছাড়া, যেখানে নিখাদ বন্ধুত্ব থাকে সেখানে ঝগড়াঝাঁটি হবেই। ওটাই তো বন্ধুত্বের পরীক্ষা।'

চেহারা দেখে মনে হলো, ব্যথা এবং দুর্বলতা ভুলে থাকার জন্যে নিজের সাথে যুঝছে কেয়া। আকরামকে সে ছেড়ে দিলেও, আকরাম তাকে ধরে থাকল। উঠে দাঁড়াল কেয়া। টলছে দেখে তাকে ধরে রেখে সিধে করার চেষ্টা করল আকরাম। তার হাত সরিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াল কেয়া। তারপর ধীরে ধীরে তার কাছ থেকে কয়েক পা সরে গেল।

'জ্ঞান হারাবার পর কি ঘটেছে বলো আমাকে!'

'মেয়েটাকে সাথে নিয়ে গেছে ডিউক, গ্যারেজে ঢোকার চেষ্টা করবে ওরা,' প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল আকরাম। 'স্টেশনে যেতে হলে প্রাইভেট কার দরকার আমাদের। ট্যাক্সি হয়তো পাওয়া যাবে, কিন্তু ড্রাইভার আমাদের কাউকে চিনে ফেলতে পারে। বেবী ট্যাক্সিতে এত লোকের জায়গা হবে না। গ্যারেজে গাড়ি আছে, সেটা বের করতে পারলেই হয়। আর শাহেদ খাবার-দাবার প্যাক করছে।'

রাগ এবং হতাশার একটা ঢেউ বয়ে গেল কেয়ার শরীরে। ভাবল, আকরামটা কোন কাজেরই নয়। ওর সব কাজেই খুঁত থাকে। তিক্ত সুরে জানতে চাইল, 'কোন্ আক্কেলে ওদেরকে তুমি একা ছেড়ে দিলে?'

ধৈর্য না হারিয়ে শান্ত ভাবে বলল আকরাম, 'শাহেদ কিচেনে কাজ করছে, সেই সাথে নজর রাখছে সরাফতের ওপর। তোমার কাছে একজনের থাকা দরকার ছিল! ওদিকে গাড়ির ব্যবস্থাও না করলেই নয়।'

শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল কেয়ার। 'বুঝলাম। কিন্তু গাড়ি নিয়ে কেটে পড়তে পারে ওরা, কথাটা ভেবে দেখেছ?'

নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল আকরাম। 'কিছু আসে যায় না। ওরা সাথে না থাকলেও চলবে আমাদের।'

'তোমার বুঝি তাই ধারণা?' তিক্ত কণ্ঠে বলল কেয়া। 'মাথা ভর্তি শুধু রাগ আর গোয়ার্তুমি আছে তোমার, এক ছটাক বুদ্ধি নেই। ডিউককে ছাড়া আবিদকে আমরা খুঁজে পাব না, এই সহজ কথাটা বুঝতে পারো না তুমি? ওই তো আমাদেরকে পথ দেখিয়ে আবিদের কাছে নিয়ে যাবে। কাজেই ওকে আমাদের হারানো চলে না।'

তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল আকরাম। 'এই এক কথা শুনতে শুনতে কান পচে গেছে আমার। ডিউক বুঝি ফেরেশতা? তার ওপর এত আস্থা কেন তোমার? আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারো না?'

'হ্যাঁ, ডিউকের ওপর আস্থা আছে আমার। কেন, জানি না। শুধু জানি, আবিদকে যদি কেউ খুঁজে বের করতে পারে তো সে ডিউক। এর আমি কোন ব্যাখ্যা দিতে পারব না। কিন্তু অনুভব করতে পারি, আমাদের আর আবিদের ভাগ্যের সাথে আশ্চর্যভাবে জড়িয়ে পড়েছে ও। আমি জানি, আবিদের সাথে ওরই দেখা হবে।'

'ঠিক আছে, ভাল কথা।' অনেক কষ্টে নিজেকে শান্ত করে রাখল আকরাম। 'দেখা যাবে। কিন্তু আমিও জানি, ডিউককে মোটেও বিশ্বাস করা যায় না।'

'বিশ্বাস করিও না,' বলল কেয়া। 'আমিও তাকে ঘৃণা করি। বুঝি, ওর সঙ্গে থাকাটা বিপজ্জনক। কিন্তু ওই যে বললাম, আমার মন গাইছে, ওর সাথে থাকলে আবিদকে পাব আমরা!'

'যাই, দেখে আসি কি করছে শাহেদ,' বলে কিচেনের দিকে এগোল আকরাম। জানে, ডিউক প্রসঙ্গে এই আলাপ চলতে থাকলে মাথা ঠিক রাখতে পারবে না সে। 'এখানে বসে একটু বিশ্রাম নাও তুমি। সব ঠিক হয়ে যাবে!'

কিচেনে চলে এল আকরাম। 'তোমার হলো, শাহেদ?'

আড়চোখে তাকাল শাহেদ। সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে সে, কিন্তু আকরামকে সেটা জানতে দিতে চায় না। বলল, 'হাতের কাছে যা পেয়েছি বেঁধে নিয়েছি সব। খুব বেশি কিছু না। কেয়া কেমন আছে?'

'ভাল। গাড়ির কোন আওয়াজ পেয়েছ?'

মাথা নাড়ল শাহেদ।

'সরাফতের খবর কি? ঠিক আছে তো?'

'তার আমি কি জানি!' অবাক হয়ে বলল শাহেদ। 'ওর ওপর নজর রাখার কথা বলেছ আমাকে?'

দাঁতে দাঁত চাপল আকরাম। খেঁকিয়ে উঠল। 'তুমি একটা চিরকেলে অকর্মা!' কিচেন থেকে দ্রুত বেরিয়ে এল সে। কারিগরদের কামরা পেরিয়ে ঢুকল বেডরুমে।

অফিস কামরা থেকে আকরামের আঁতকে ওঠার আওয়াজ পেল কেয়া। ছুটল সে।

দরজার কাছে পৌঁছুল কেয়া, এই সময় আধপাক ঘুরে তার মুখোমুখি দাঁড়াল আকরাম। 'পালিয়েছে! কুত্তার বাচ্চা শাহেদ ওর ওপর নজর রাখেনি! লোকটা···পুলিস ডাকতে গেছে!'

ছয়

'আলো জ্বালবেন না,' টিনার স্টুডিওতে ঢুকে বলল রানা। 'গ্যারেজে থাকার কথা আমাদের। শুনুন, এখানেই দাঁড়ান, আপনার সাথে কথা আছে আমার। সবই তো দেখলেন নিজের চোখে, সুস্থ বলে মনে হলো কেয়াকে? যে-কোন মুহূর্তে সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটিয়ে বসতে পারে। পাগলকে বিশ্বাস কি? তাছাড়া, আপনার ওপর···আপনাকে ঘৃণা করে ও। আমাদের সাথে গেলে আপনার বিপদ হতে পারে। না যাওয়াটাই ভাল বলে মনে করি আমি।'

বাইরে থেকে ক্ষীণ আলো এসে ঢুকেছে স্টুডিওর ভেতর, তাতে অন্ধকার দূর হয়নি। রানার একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে আছে টিনা, নড়লে চড়লে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যাবে। মুখটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে না রানা, শুধু আউটলাইন ঠাহর করতে পারছে। নিঃশ্বাসের আওয়াজও পেল ও, নিয়মিত এবং স্বাভাবিক।

'কথা দিতে হবে,' বলল রানা। 'আমরা কোথায় যাচ্ছি কাউকে সেটা বলবেন না। তাহলেই আপনাকে আমি ছেড়ে দিতে পারি। ওদেরকে বলব, আমাকে আপনি ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছেন।'

'আমি আপনাদের সাথে যাব,' শান্ত গলায় বলল টিনা। 'আপনাকে তো আগেই বলেছি, আবিদ যদি বেঁচে থাকে, তাকে আমার সাহায্য করা দরকার।'

'কিন্তু বিপদের কথাটা ভেবে দেখবেন না? কেয়া আপনাকে জখম করতে পারে। আমি আপনাকে সব সময় চোখে চোখে রাখব তা কি আর সম্ভব?'

'হ্যাঁ, সাবধানে থাকতে হবে আমাকে। কিন্তু বিপদের ভয়ে আবিদকে সাহায্য

করতে যাব না, তা কি করে হয়?' অন্ধকারে মৃদু হাসল টিনা। 'আমি মন ঠিক করে ফেলেছি। যাব।'

'বেশ। আপনি যা ভাল মনে করেন। মানি, আপনি গেলে অনেক সাহায্য হবে আমার। দ্বীপের সব আপনার জানা, অনেক সময় বাঁচবে। তবু, আমি চাই, আরেকবার ভেবে দেখুন আপনি।'

'আর কিছু ভেবে দেখার নেই।'

'বেশ। তাহলে যা যা নেবার তাড়াতাড়ি একটা সুটকেসে ভরে নিন। আপনি রেডি হোন, আমি ততক্ষণে একটা ফোন সেরে নিই।'

বেডরুমে চলে গেল টিনা। জানালার পাশে, ছোট একটা ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়াল রানা। রিসিভার তুলে ডায়াল করল থানা হেডকোয়ার্টারে। হেঁড়ে গলায় বলল কেরানী, 'থানা হেডকোয়ার্টার।'

'ইন্সপেক্টর ফয়েজ আহমেদের জন্যে একটা জরুরী মেসেজ। নোট করুন,' বলে কিছুক্ষণ সময় নিল রানা, তারপর জানতে চাইল, 'রেডি?'

'বলুন।'

'মেসেজ শুরু হলো—"নঈমকে যে বুলেটটা খুন করেছে তার সাথে হোটেল পুবালিতে নিহত পুলিস অফিসারদের শরীর থেকে উদ্ধার করা বুলেট দুটো মিলিয়ে দেখুন। মাউজার পিস্তলের মালিকের নাম আকরাম খান। ওর সাথে বৈধ কোন কাগজপত্র নেই, লাহোর থেকে জেল ভেঙে ইন্ডিয়া হয়ে মাত্র কিছুদিন আগে বাংলাদেশে এসেছে। একা নয়, সাথে আরও দু'জন আছে। তারাও হোটেল পুবালিতে ছিল, সন্ধান করলেই জানা যাবে। চেষ্টা করলে আরও জানতে পারবেন, এরা নঈমের ফ্ল্যাটেও ছিল তিন দিন। গুলি ছোঁড়ার এই দুটো ঘটনার সাথে আমাকে জড়াবেন না। আবার বলছি, আমাকে জড়াবেন না। ডিউক"। কিছু বাদ পড়ল না তো?' জানতে চাইল ও। 'বেশ, পড়ে শোনান আমাকে।' শোনার পর বলল, 'ফাইন। এখুনি ওটা ইন্সপেক্টরের হাতে পৌঁছে দিন।' অপরপ্রান্ত থেকে কেরানী লোকটা কিছু বলার আগেই রিসিভার রেখে দিল ও

জানালার কাছ থেকে সরে আসতে যাবে রানা, চোখের কোণে ধরা পড়ল উঠানে ক্ষীণ একটু নড়াচড়া। প্রায় আঁতকে উঠল ও, দ্রুত জানালার সামনে থেকে পিছিয়ে এল এক পা। মাথা নিচু করে স্বচ্ছ পর্দার ভেতর দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল বাইরে। উত্তেজনায় টান টান হয়ে আছে মুখের পেশী। গেটের দিক থেকে চার কি পাঁচটা ছায়ামূর্তি সরাফত আলির বাংলোর দিকে গুটি গুটি এগোচ্ছে। আবছায়ায় পিতলের বোতাম চিকচিক করে উঠল। নিঃশব্দে লাফ দিয়ে ছুটল ও বেডরুমের দিকে।

'টিনা!' চাপা গলায় বলল ও। 'কোথায় আপনি?'

ত্রস্ত পায়ে ছুটে এল টিনা, অন্ধকারে ধাক্কা খেল রানার বুকের সাথে। তাকে ধরে ফেলে সিধে হতে সাহায্য করল রানা। 'কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল টিনা। 'আমার হয়ে এসেছিল...'

'বাইরে পুলিস। কিছু নিতে হবে না। পিছন দিয়ে বেরিয়ে যাবার রাস্তা আছে কিনা জানেন?'

'আছে,' ফিসফিস করে বলল টিনা। 'আসুন।' টিনার হাবভাব দেখে মনে মনে আশ্চর্য হয়ে গেল রানা। এতটুকু ঘাবড়ায়নি, কোন ইতস্তত ভাব নেই। গলার আওয়াজে শুধু যা একটু উত্তেজনার ছোঁয়া। অন্ধকারে হাতড়ে রানার একটা কব্জি চেপে ধরল সে। পিছন দিকের দরজা খুলে বেরিয়ে এল সরু একটা প্যাসেজে।

'দাঁড়ান,' প্যাসেজের শেষ মাথায় পৌঁছে থমকে দাঁড়াল রানা। 'ব্যাপারটা বুঝতে দিন আমাকে। প্যাসেজ থেকে কোথায় বেরুচ্ছি আমরা?'

'গ্যারেজে,' বলল টিনা।

'গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় এখন আর,' বলল রানা। 'গ্যারেজ থেকে বাড়ির পিছন দিকে বেরুনো যায়?'

'যায়। রাস্তাটার নাম শিব শংকর লেন। ওখান থেকে বাসাবো মেইন রোডে বেরুনো যায়।'

'ঠিক আছে। আমাকে আগে থাকতে দিন। পুলিস যদি দেখতে পায়, সাথে সাথে রাস্তার ওপর শুয়ে পড়বেন। রাইফেল, রিভলভার সব আছে ওদের কাছে। মনে থাকবে?'

'হ্যাঁ।'

দরজা খুলে সন্তর্পণে গ্যারেজে ঢুকল ওরা। আরেকটা দরজা খুলে উঁকি দিল বাইরে। আকাশে মেঘ, ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, এরই মধ্যে ফাঁকা হয়ে গেছে রাস্তা। কাউকে দেখল না রানা। কিন্তু রাস্তায় পা ফেলতেই বাড়ির সামনের দিক থেকে গুলির আওয়াজ ভেসে এল। পরপর তিনবার গর্জে উঠল একটা পিস্তল।

'নিজের পায়ে কুড়োল মারছে আকরাম,' ফিসফিস করে বলল রানা। 'দেখি, আপনার হাতটা ধরতে দিন আমাকে। নিন, তাড়াতাড়ি পা চালান।'

অন্ধকার রাস্তা ধরে হন হন করে এগোল ওরা। টিনার বাংলোর সামনের দিক থেকে আরও গুলির আওয়াজ ভেসে এল। ভারী, উত্তেজিত গলায় চিৎকার করে কি যেন বলল ক'জন লোক। 'রাস্তার মাথায় পুলিস থাকতে পারে। দাঁড় করানো হলে সব আমার ওপর ছেড়ে দেবেন।'

দূর থেকেই বাসাবো মেইন রোড দেখতে পেল ওরা। শিব শংকর লেনে আলো নেই, কিন্তু মেইন রোডে আছে। অন্ধকার গলিতে থাকতেই নিঃসঙ্গ একজন পুলিসকে দেখতে পেল ওরা। কিন্তু হাঁটার গতি কমাল না রানা। টিনার হাতটা আরও জোরে চেপে ধরে যেমন এগোচ্ছিল তেমনি এগিয়ে চলল।

'থামতে নাও বলতে পারে,' ঠোঁটের কোণ দিয়ে বলল রানা। 'যদি বলে, ছুটে পালাবার জন্যে তৈরি হয়ে যাবেন। ওই একজনই তো, নাকি আর কাউকে দেখতে পাচ্ছেন?'

উত্তেজনায় কাঁপা কাঁপা শোনাল টিনার গলা। 'না-না!'

রাস্তার ওপার থেকে এপারে আসতে শুরু করল পুলিস। তারপর দিক বদলে সোজা ওদের দিকে এগোল। অনুরোধের সুরে বলল সে, 'একটু দাঁড়ান।' থামতে ইশারা করল হাত তুলে।

'বললেই দৌড়াতে শুরু করবেন!' নিচু গলায় বলল রানা। তারপর গলা চড়িয়ে জানতে চাইল, 'কাকে বলছেন? আমাকে?' দ্রুত একবার ঘাড় ফিরিয়ে

দেখে নিল টিনাকে। এক পা পিছিয়ে পড়েছে সে। দাঁড়িয়ে পড়েছে পুলিস, তার সামনে এসে থামল রানা। লোকটা সামনের দিকে একটু ঝুঁকে ভাল করে লক্ষ্য করার চেষ্টা করল রানাকে। দুম করে তার নাকের ওপর একটা ঘুসি বসিয়ে দিল রানা। ছিটকে পড়ল লোকটা, খপ করে টিনার একটা হাত ধরে বলল রানা, 'ছুটুন!'

আলামতগুলো এক নজর দেখেই বুঝতে পারল আকরাম, সরাফত পালিয়েছে। বিছানার চাদর এলোমেলো হয়ে আছে, দু'প্রস্থ রশি পড়ে রয়েছে মেঝেতে, পর্দা সরানো, জানালার কবাট খোলা হা হা করছে। কতক্ষণ আগে পালিয়েছে সরাফত? দশ, পনেরো, বিশ মিনিট আগে? নাকি তারও বেশি? থানার পথে রয়েছে, নাকি পুলিস নিয়ে ফিরে আসছে?

আকরামের পিছনে, দোর-গোড়ায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে কেয়া আর শাহেদ। দু'জনেই হতভম্ব, বোকার মত তাকিয়ে আছে খালি বিছানার দিকে।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল আকরাম। কেয়ার চোখে আচ্ছন্ন, শূন্য দৃষ্টি দেখে উদ্বেগ বোধ করল সে। এমন একদিন ছিল, বিপদের সময় ভরসা রাখা যেত কেয়ার ওপর। সেদিন গত হয়েছে। সন্দেহ নেই, অস্থির স্নায়ুর যে আক্রমণটা হয়েছিল তার ধকল এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি ও। ওকে দিয়ে এখন কোন কাজই হবে না। ঝট করে শাহেদের দিকে তাকাল সে। মনে মনে সাহস পেল। হতভম্ব হয়ে গেছে শাহেদ, কিন্তু নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছে। সম্পূর্ণ শান্ত দেখাচ্ছে তাকে। শুধু যে সাহস পেল আকরাম তাই নয়, স্বস্তিও বোধ করল। সেই পুরানো দিনের, যুদ্ধের সময়কার স্মৃতি মনে পড়ে গেল তার। শত বিপদেও মনোবল অটুট রাখা। মুখ ফুটে কিছু বলার আগেই ইতিকর্তব্য স্থির করে ফেলা। পরস্পরের জন্যে ত্যাগ স্বীকারের জন্যে উদগ্রীব হয়ে থাকা।

'পুলিস হয়তো বাইরে অপেক্ষা করছে,' বলল শাহেদ। বিপদের গুরুত্ব বুঝতে সময় নেয়নি সে। 'টেলিফোন করে থাকলে এতক্ষণে পৌঁছে যাবার কথা ওদের।'

'হ্যাঁ,' গম্ভীর স্বরে বলল আকরাম। 'এবার ওদের কাছে অস্ত্র থাকবে। পুবালির মত অত সহজে এখান থেকে কেটে পড়া যাবে না।' এক মুহূর্ত কি যেন চিন্তা করল সে, তারপর আবার বলল, 'কেয়ার কাছে থাকো। বাইরেটা দেখে নিই। কেয়া, শাড়ি পাল্টে শার্ট পরো। ওরা জানে আমাদের সাথে মেয়ে আছে, পুরুষের বেশ নিলে রাস্তায় সুবিধে হবে।'

'জানালা দিয়ে দেখো,' বলল শাহেদ। 'ওরা হয়তো দরজা খোলার অপেক্ষাতেই বাইরে ওত্ পেতে আছে।'

এ যেন সেই পুরানো শাহেদ, ভাবল আকরাম। হঠাৎ বিপদ আর উত্তেজনা দেখা দেয়ায়, ধরা পড়ার আশঙ্কা থাকায় ধনুকের টান টান ছিলার মত শক্ত হয়ে গেছে শাহেদের নার্ভ। ঘড়ির কাঁটা যেন উল্টো দিকে ঘুরতে শুরু করেছে। এ-ই তো সেই শাহেদ যে পাঞ্জাবী সেনাদের সাথে অকুতোভয়ে লড়েছে। এই শাহেদই তো অমানুষিক টরচার সহ্য করেছে, কিন্তু মুখ খোলেনি। এই শাহেদই তো সেই অজেয় নয় জনের একজন। অদ্ভুত একটা একতা বোধ ফিরে এল আকরামের মধ্যে, শাহেদের প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করল। সেই সাথে মনে পড়ল বারো ঘণ্টা আগে এই

শাহেদকেই মেরে ফেলার প্ল্যান আঁটছিল সে। ছোট, নীচ মনে হলো নিজেকে তার।

শাহেদের কথাটা শুনে আকরাম বুঝল, পুরানো দিনের টেকনিকগুলো তার চেয়ে আগে মনে করতে পারছে শাহেদ। হোলস্টার থেকে মাউজারটা বের করে শক্ত করে ধরল সে। কেয়াকে বলল, 'ডিউকের অটোমেটিকটা শাহেদকে দাও।' কিন্তু কেয়া নড়ল না, কিছু বললও না। ওরা দু'জনেই তার দ্রুত নিঃশ্বাসের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে।

'টেক ইট, আলি,' বলল আকরাম, অনেক দিন পর শাহেদের নামের প্রিয় অংশটা উচ্চারণ করল সে। ও চাইছে শাহেদ জানুক তার ওপর ওর আগের বিশ্বাস ফিরে এসেছে।

কেয়ার কোমরে হাত দিয়ে আলগোছে অটোমেটিকটা বের করে নিল শাহেদ। কেমন যেন শিউরে উঠে তার কাছ থেকে সরে গেল কেয়া। পাশের কামরায় চলে গেল শাহেদ, একটু পরই ফিরে এল আবার। হাতে কেয়ার প্যান্ট শার্ট। দেখল, ওদের দিকে পিছন ফিরে জানালার সামনে ঝুঁকে আছে আকরাম। 'তাড়াতাড়ি পরে নাও!' তাগাদা দিল শাহেদ।

'আমার মাথা! ব্যথায় ছিঁড়ে পড়ে যেতে চাইছে!' দেয়ালে হেলান দিল কেয়া, দু'হাতের আঙুল দিয়ে টিপে ধরল কপালের দু'পাশ।

কেয়ার শার্টটা কাঁধে ফেলে প্যান্টটা তার দিকে বাড়িয়ে দিল শাহেদ। 'ভুলে থাকার চেষ্টা করো। পরে নাও এটা।'

জানালার সামনে এক চুল নড়ছে না আকরাম।

'কি হলো?' কেয়াকে তাগাদা দিল শাহেদ। তার হাত থেকে প্যান্টটা নিল কেয়া। শার্টটা চেয়ারের ওপর রাখল শাহেদ, বলল, 'বাংলোর পিছনটা দেখে আসি। আমি না ফেরা পর্যন্ত এখান থেকে নোড়ো না। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

শাহেদ বেরিয়ে যেতেই অফিস কামরায় ফিরে এল আকরাম। জানালার সামনে ঝুঁকে আধ ইঞ্চি সরাল পর্দাটা। বাইরে অন্ধকার, কিছুই দেখতে পেল না সে। কিন্তু সজাগ, প্রখর হয়ে ওঠা অনুভূতি সাবধান করে দিল তাকে। আঙুল দিয়ে গ্রিলের স্ক্রুগুলো স্পর্শ করল সে। পর্দা না ছুঁয়ে ধীরে ধীরে স্ক্রুর প্যাঁচ খুলতে শুরু করল। সবগুলো খোলা শেষ হলো, ইতিমধ্যে বাইরের অন্ধকার সয়ে এসেছে চোখে। গ্রিলটা আস্তে আস্তে সরাল সে, মেঝেতে নামিয়ে দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখল সেটা। কিছু দেখতে পেল না, কিন্তু রাস্তা থেকে ভেসে আসা গাড়ির আওয়াজ, রিকশার টুং টাং বেল শুনতে পেল। শব্দগুলোকে কান থেকে বের করে দেবার চেষ্টা করল সে। একটু পরই আরও অস্পষ্ট, আরও ক্ষীণ একটা আওয়াজ পেল। কংক্রিটের ওপর বুট জুতোর নরম শব্দ। তারপরই একটা লোকের ফিসফিস গলা। সেই সাথে ধাতব কিছুর সাথে পাথরের ঘষা। পাঁজরের গায়ে হৃৎপিণ্ড বাড়ি খেতে শুরু করল। চোখে সয়ে আসা অন্ধকারে কয়েকটা ছায়ামূর্তি দেখতে পেল সে। বাংলোর সামনে পজিশন নিচ্ছে। আর কোন সন্দেহ নেই, পৌঁছে গেছে পুলিস। বোঝাই যায়, কোনরকম তাড়াহুড়ো করছে না তারা। জানে, জাল বিছানো হয়ে গেছে, এখন শুধু গুটানো বাকি।

পাশে এসে দাঁড়াল শাহেদ। 'পৌঁছে গেছে ওরা,' চাপা কণ্ঠে বলল সে। 'পেছন সাইডে চারজন পাহারা দিচ্ছে।'

'এখন পর্যন্ত এদিকে আটজনকে দেখেছি আমি,' বলল আকরাম। 'আরও আছে। মেইন রোডটা নিশ্চয়ই সীল করে দিয়েছে ওরা। ফুঁড়ে বেরিয়ে যাওয়া কঠিনই হবে।' গলার আওয়াজে কোনরকম উত্থান-পতন নেই, সুরে কোন বিকার নেই। কিন্তু অনুভব করল, গলার ভিতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। ধড়ফড় করছে বুক, হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত উঠে এসে দুই কানে কলকল শব্দ করছে।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকল দু'জন। পরস্পরের দিকে মুখ করে আছে ওরা। অবাক হয়ে আরেকবার উপলব্ধি করল আকরাম, শাহেদের মধ্যে কোনরকম অস্থিরতা নেই। তুলনা করতে গিয়ে নিজেকে ধিক্কার দিল সে। ভীতু শাহেদ শান্ত থাকতে পারছে, অথচ দুঃসাহসী বলে পরিচিত আকরাম নিজেই মনে মনে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে!

'আমরা তিনজনই পালাব, সেটা হবার নয়, আকরাম,' বলল শাহেদ। 'কেয়াকে নিয়ে পেছন দিক দিয়ে পালাতে পারো কিনা দেখো। আমি তোমাদেরকে কাভার দেব।'

আকরামের মনে হলো, শুনতে ভুল করছে সে। 'কি বললে? তুমি কাভার দেবে? মানে?'

'তর্ক না করে যা বলছি করো,' দ্রুত বলল শাহেদ। শুধু গলার স্বরে নয়,হাত নাড়ার ভঙ্গিতেও আবেদনের ভাব ফুটে উঠল। 'বাঁচতে হলে আর কোন উপায় নেই তোমাদের। দু'জন পারলেও পারতে পারো, কিন্তু তিনজন অসম্ভব। ওকে নিয়ে চলে যাও।'

'ভেবেচিন্তে বলছ?' অবিশ্বাসে কেঁপে গেল আকরামের গলা। 'তোমাকে ওরা মেরে ফেলবে।'

'জানি।' নিজের ভেতর অনুভূতির ধরনটা লক্ষ্য করে আশ্চর্য হয়ে গেল শাহেদ। রাগ নয়, দুঃখ নয়, প্রচণ্ড একটা অভিমান বোধ করছে সে। নির্দিষ্ট কারও উপর নয়, গোটা জগৎ-সংসারের ওপর। কিন্তু সেই অভিমান বোধটা সম্পূর্ণ চেপে রাখতে পারল সে। 'এমনিতেই আমার আর কোন আশা নেই। তারচেয়ে এই ভাল। যাও, আকরাম, কথা বলে দেরি কোরো না। আমি কাভার দিলে ওকে নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে তুমি।'

'হ্যাঁ, তা পারব।' কুত্তার বাচ্চা, বেজন্মা—মনে মনে নিজেকে গালাগাল করছে আকরাম—অ্যাদ্দিন দেখেও চিনলি না ওকে? ও মানুষ নয়, ফেরেস্তা! আর সেই মানুষকেই কিনা তুই গুলি করে মারার প্ল্যান করেছিলি! ধিক! বলল, 'কিন্তু শাহেদ, তা হয় না। আমার মত তোমারও বেঁচে থাকার অধিকার আছে...'

বাধা দিয়ে তাকে থামিয়ে দিল শাহেদ। আকরামের বুকে মৃদু ধাক্কা দিল সে। 'যাও! ওকে নিয়ে পালাও! আমি গুলি করছি শুনতে পেলেই বেরিয়ে পড়বে তোমরা!'

অন্ধকারে হাতড়ে শক্ত করে শাহেদের হাত ধরে ফেলল আকরাম। শাহেদের কাছ থেকে নিজের জীবন ভিক্ষা নিতে মরমে মরে যাচ্ছে সে। 'শাহেদ, লক্ষ্মী ভাই

আমার!' বিড় বিড় করে বলল সে। 'যদ্দিন বেঁচে থাকব ভুলব না…' পরমুহূর্তে শাহেদকে একা রেখে ছুটে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সে।

কয়েক সেকেন্ড পাথরের মত স্থির হয়ে থাকল শাহেদ, আত্মত্যাগের মধ্যে কড়া একটা নেশা আছে, সেই নেশায় বুঁদ হয়ে আছে সে। হালকা তুলো হয়ে গেছে তার শরীর, সেখানে যেন কোন অপবিত্রতা নেই, সে যেন একজন মহৎ-প্রাণ বীরপুরুষ।

আকরামের কথা মনে পড়ল। আকরাম বলেছিল, তার যুদ্ধ নাকি এখনও শেষ হয়নি। যুদ্ধে একজন বন্ধু বন্ধুর জন্যে নিজের প্রাণ দিতে পারে। এটাকে একজন অসমসাহসী বীরের আচরণ বলা যেতে পারে। না, বরং তার এই আচরণ আরও অনেক বেশি মহত্ত্বের পরিচায়ক, ভাবল শাহেদ। বন্ধুর জন্যে নয়, তার এই আত্মত্যাগ একজন শত্রুর জন্যে। মহত্ত্বটাই তো সেখানে।

আগে বা পরে, আকরামের হাতে তাকে মরতেই হত। মাথায় একটা বুলেট অথবা পিঠে ছোরার একটা ঘা। কিভাবে মারত সেটা বড় কথা নয়। কিন্তু মারত তাতে কোন সন্দেহ নেই।

তারচেয়ে শতগুণ ভাল হলো এটা। যদ্দিন বাঁচবে, ওরা দু'জন ভুলতে পারবে না তাকে। এর সাথে অবসান ঘটল সমস্ত উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তার। এখন আর আকরামের প্রতিটি নড়াচড়া লক্ষ্য করতে হবে না। আকরামের দিকে পিছন ফিরতে ভয় পেতে হবে না। তাছাড়া, আকরামকে নতুন জীবন দান করে প্রমাণ করা গেল, শেষ পর্যন্ত আকরামকে হারিয়ে দিয়েছে সে। 'লক্ষ্মী ভাই আমার' বলতে বাধ্য করেছে তাকে। নিজের অজান্তেই তিক্ত একটু হাসি ফুটল শাহেদের ঠোঁটে। নিজের জীবন দান না করলে আকরামের মুখ থেকে লক্ষ্মী ভাই আমার আদায় করা সম্ভব ছিল না।

অটোমেটিকের মাজল দিয়ে জানালার পর্দা খানিকটা সরাল শাহেদ। খোলা জানালা, ঠাণ্ডা হাওয়া এসে চোখে লাগল। মনে মনে নিশ্চিতভাবে জানে, গুলি ছুঁড়তে যা দেরি, পাল্টা গুলি এসে শেষ করে দেবে তাকে। ঝামেলা চুকতে খুব বেশি সময় লাগবে না। বাইরে ওরা যারা অপেক্ষা করছে, নিজেদের কাজ বোঝে তারা। কাজ দেখাবার জন্যে তাদের হাত নিশপিশ করেছে। নিজেদের দু'জন লোক মারা গেছে, কাজেই কোনরকম দয়া দেখাতে রাজি নয় তারা। ভাবল, তার এই আত্মত্যাগ সত্ত্বেও আকরাম আর কেয়া যদি পালাতে না পারে? তারপর ভাবল, আচ্ছা, আবিদের কি হবে? অন্তরের অন্তঃস্তল থেকে দুঃখ অনুভব করল আবিদের জন্যে। এমন মানুষ হয় না! যার সব ভাল, অথচ মাত্র একবার এমন একটা আচরণ করে বসল, যা তার ব্যক্তিত্বে সাথে কোনভাবেই মেলে না। ফিরোজ ভাইয়ের সাথে বেঈমানী করার সময় আবিদের কি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল? আবিদ যদি বেঈমানী না করত, এসব কিছুই আজ ঘটত না।

বাড়ির পিছন থেকে একটা আওয়াজ ভেসে এল। দরজার খিল আর হুড়কো খুলল আকরাম। মুহূর্তের জন্যে আত্মত্যাগের দৃঢ় মনোবলে চিড় ধরল, ঠকঠক করে কাঁপতে শুরু করল শাহেদ। অসম্ভব ভারী লাগল হাতের অটোমেটিকটা। উঁচু করার জন্যে ঝাড়া পাঁচ সেকেন্ড চেষ্টা করতে হলো তাকে। ঘামতে শুরু করেছে সে।

বাংলোর পিছন থেকে চাপা গলায় বলল আকরাম, 'আমরা রেডি।' সন্দেহ এবং অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পেল তার গলার সুরে, পরিষ্কার ধরতে পারল শাহেদ।

এক ঝটকায় পর্দা সবটুকু সরিয়ে ফেলল শাহেদ, বুক চিতিয়ে দাঁড়াল খোলা জানালার সামনে। বাইরের থেকে ওকে এখন পরিষ্কার দেখতে পাবে পুলিস। পাল্টা আঘাতের জন্যে মনে মনে সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে গেছে সে, তার শরীরের প্রতিটি লোমকূপ ঝাঁকি খাবার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠেছে। একের পর এক গুলি করতে শুরু করল সে।

সাত

চওড়া গলির মুখে রিকশা থেকে নামল ওরা। ঢুকলে এই পথ দিয়েই বেরুতে হবে, আর কোন মুখ নেই। শেষ মাথায় হোটেল জনপদ। ইতিমধ্যে বৃষ্টি শুরু হয়েছে, গলির ভেতর যতদূর দেখা যায় ফাঁকা। রিকশার হুডের নিচে অন্ধকার, সীটের ওপর বসেই ভাড়া মিটিয়ে দিল রানা। ইঙ্গিতে টিনাকে নামতে বলে কোন্ দিকে এগোতে হবে, হাত ইশারায় দেখিয়ে দিল ও। টিনা কয়েক পা এগিয়ে গেছে, এই সময় রিকশা থেকে মুখ নিচু করে নামল ও, যেন বৃষ্টি থেকে মুখটাকে বাঁচাতে চেষ্টা করছে। আসলে রিকশাওয়ালাকে চেহারা দেখাতে চায় না। ছুটে টিনার পাশে চলে এল ও, ছোটার গতি না কমিয়ে তার একটা হাত ধরল। তাল রাখার জন্যে রানার সাথে সাথে বাধ্য হয়ে টিনাকেও ছুটতে হলো।

জনপদের সামনের গেটটাকে ছাড়িয়ে পাশের প্যাসেজে চলে এল ওরা। সাইড ডোরটা খোলাই পেল, কারও চোখে না পড়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে। সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ নেমে গেছে নিচের দিকে। হোটেলের কিচেন গ্রাউন্ড ফ্লোর থেকে বেশ খানিকটা নিচে, লোহার গ্রিল দিয়ে ঘেরা। কম পাওয়ারের বালব্ জ্বলছে ছোট একটা করিডরে, টিনাকে নিয়ে সেখানে দাঁড়াল রানা।

'ভাগ্যটা ভালই বলতে হবে,' বলল ও। 'এখন পর্যন্ত কোন বিপদে পড়তে হয়নি। রুবিকে পেলে এখানে ঘন্টা কয়েক থাকতে অসুবিধে হবে না।' হাত ঝাপটা দিয়ে কোট থেকে বৃষ্টির পানি ঝরাল ও। 'কোথায় আছে ও দেখে আসি, আপনি এখানেই অপেক্ষা করুন। এই আসব আর যাব।'

'ঠিক আছে,' বলল টিনা। 'কিন্তু কেউ যদি কিছু জিজ্ঞেস করে?'

'বলবেন রুবির কাছে এসেছেন। তার দরকার হবে না, কেউ আপনাকে দেখার আগেই ফিরে আসব আমি।' হঠাৎ মৃদু হেসে টিনার একটা হাত ধরল রানা। 'আপনি কিন্তু অবাক করে দিয়েছেন আমাকে। হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, এসব যেন আপনার কাছে ডাল-ভাত, গায়েই মাখছেন না!'

'যান, রুবিকে খুঁজে বের করুন,' বলল টিনা। 'আমার প্রশংসা পরে করলেও চলবে।'

প্যাসেজ ধরে দ্রুত এগোল রানা। ভাবল, মেয়েটার নার্ভ আছে বটে! আবিদ

যদি টিনার কাছাকাছিও হয়, কেয়া আর আকরাম যে তাকে ভয় পাবে তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে!

কিচেনের দরজা খোলা দেখল রানা। বাইরে থেকে উঁকি দিয়ে ভেতরে তাকাল ও। রাতের খাবার তৈরি করছে বাবুর্চি আর তাদের সহকারীরা, সবাই খুব ব্যস্ত। আদা-রসুন, পিঁয়াজ আর মরিচের গন্ধ ঢুকল নাকে। কিন্তু রুবিকে কোথাও দেখল না।

পাশেই বড়সড় আরেকটা কামরা, তৈরি করা খাবার নিয়ে গিয়ে রাখা হয় ওখানে। সেখানেও রুবিকে পাওয়া গেল না। ছোট একটা প্যাসেজ ধরে আরেক কামরায় ঢুকল রানা। আলু-পিঁয়াজ ছিলছে রুবি। নিঃশ্বাসের সাথে গুন গুন করছে শুনতে পেয়ে বুঝল, মনটা আজ তার ভাল আছে। ঠোঁট সারানো হবে, বোধহয় সেই আনন্দেই বিভোর।

'রুবি!' দোর-গোড়া থেকে বলল ও। 'কাছে পিঠে আর কেউ আছে নাকি?'

রুবির হাত থেকে ছুরি পড়ে গেল, প্রায় বেরিয়ে আসা চিৎকারটাকে মুখে হাত চাপা দিয়ে ঠেকাল, তারপর উঠে দাঁড়াল লাফ দিয়ে। বিস্ফারিত চোখে রানার দিকে তাকিয়ে থেকে ঘন ঘন কয়েকবার ঢোক গিলল সে। 'ডিউক ভাই···আপনি? এখানে?'

ভেতরে ঢুকে দরজাটা পা দিয়ে ঠেলে ভিড়িয়ে দিল রানা। রুবির দিকে ফিরে মৃদু হাসল ও। 'আমার ব্যাপারটা তো জানো, রুবি—সময় নেই অসময় নেই, বিপদের মধ্যে জড়িয়ে পড়ি। এবারের বিপদটা একটু অন্য রকম, তোমার সাহায্য লাগবে। করবে না?'

শাড়ির আঁচলে হাত মুছতে মুছতে বলল রুবি। 'বলুন কি করতে হবে।' বড় বড় চোখ দুটো সতর্ক, উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল।

'তোমার ঘরে যেতে পারি না? সাথে একজন বন্ধু আছে। মানে, বান্ধবী। আমরা যে এখানে আছি আলি হোসেন যেন জানতে না পারে। কোথায় সে, জানো?'

'ক্লাবে। আপনি সোজা আমার ঘরে চলে যান। হাতের কাজটা শেষ না করলেই নয়। মিনিট দশেকের বেশি লাগবে না আমার।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'আচ্ছা, কি দরকার সেটা কাউকে না জানিয়ে একটা রেলওয়ে টাইম-টেবল যোগাড় করতে পারবে? কিছু খাবারও লাগবে। যা পাও তাতেই চলবে। কিন্তু সাবধান, আমরা এখানে আছি তা যেন ঘুণাক্ষরেও কেউ টের না পায়।'

'পাবে না। আমার ঘরে উঠে যান আপনারা। আমি আসছি।'

রুবির কাঁধে একটা হাত রেখে মৃদু ঝাঁকি দিল রানা। 'তুমি খুব ভাল মেয়ে, রুবি। আমি জানতাম চাইলে তুমি সাহায্য করবেই।'

'আপনার পিছনে কি, ডিউক ভাই···পুলিস লেগেছে?' খানিক ইতস্তত করে জানতে চাইল রুবি। তার কাঁধে হাত থাকায় অনুভব করল রানা, একটু একটু কাঁপছে রুবি।

'ভয়ে ভয়ে বলছি, হ্যাঁ।' নিঃশব্দে হাসল রানা। 'কিন্তু চিন্তার কিছু নেই।

সামলে নেব। তোমার দেরি হবে না তো?'

'না-না!'

টিনার কাছে ফিরে এল রানা। নোংরা দেয়ালে হেলান দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে সে। চেহারায় অস্থিরতার কোন ছাপই নেই।

'ওপর তলায় যেতে হবে,' বলল রানা। 'রুবি তার ঘরটা ধার দিয়েছে আমাদের।'

'রুবি কে?' রানাকে অনুসরণ করে জানতে চাইল টিনা।

'কে?' যেন চিন্তায় পড়ে গেল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে টিনার চোখে তাকাল। 'এক কথায় এর উত্তর দেয়া সম্ভব নয়। আমার কেউ হয় না। ছিল কাঙালিনী, হাড্ডিসার, এখন তাকে দেখে লোকে বলে মেরিলিন মনরো। আমাকে ডিউক ভাই বলে ডাকে।' একটু বিরতি নিল ও, তারপর বলল, 'আমার কোন বোন নেই। কিছুটা হলেও ওকে দিয়ে সেই অভাবটা পূরণ করার চেষ্টা করি, এই আর কি!'

কোন মন্তব্য করল না টিনা। রুবির ঘরে আসার পথে কারও সাথে দেখা হলো না ওদের। ঘরে ঢুকে আলো জ্বালল না রানা, আগে জানালার পর্দাগুলো টেনে দিল, তারপর টিপল সুইচ। যে যার গা থেকে কোট নামাবার কাজটা প্রায় একই সাথে শেষ করল ওরা। টিনার কাছ থেকে তারটা চেয়ে নিয়ে দুটোই দরজার পিছনে লাগানো হুকের সাথে ঝুলিয়ে দিল রানা। 'আপনি বিছানায় বসুন। চেয়ারে বসার চেয়ে আরাম পাবেন।'

'আরাম করার জন্যে আপনার সাথে বেরুইনি,' বলে কাঠের একটা শক্ত চেয়ারে বসে পড়ল টিনা। 'আমি একজন আর্টিস্ট, কিন্তু কোন কালেই ঘরকুণো ছিলাম না। সব কিছু অভ্যেস আছে আমার। ওই তিনজনের কথা ভুলতে পারছি না। ওদের বোধ হয় পালাবার কোন উপায় নেই, কি বলেন?'

'একেবারে উপায় নেই তা বলা যায় না। কোণঠাসা অবস্থা থেকে কর্ডন ভেদ করে বেরিয়ে যাবার ট্রেনিং আছে ওদের। আমরা বরং ধরে নিই, পালাতে পেরেছে। এবং যেখানে যাবার কথা ছিল সেখানে পৌঁছুবেও। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমার সাথে আপনাকে থাকতেই হবে। শুনুন, আপনি বরং ধারণাটা বাতিল করে দিয়ে ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরে যান। এখনও আমাদের সাথে জড়িয়ে পড়েননি, কিন্তু আমার সাথে থাকলে জড়িয়ে পড়তে সময় লাগবে না। আর একবার জড়িয়ে পড়লে নরক হয়ে উঠতে পারে জীবনটা।'

'আমাকে ভাগাবার জন্যে একেবারে উঠেপড়ে লেগেছেন দেখছি। শুনুন, আমি বিপদে জড়িয়ে পড়তে ভালবাসি, আর নিজেকে কিভাবে বিপদ থেকে রক্ষা করতে হয় তাও আমার জানা আছে। আবিদের ব্যাপারটা ভালমত না জেনে ঘরে ফিরছি না।'

'বেশ, বুঝলাম,' শুকনো গলায় বলল রানা। 'কিন্তু পুলিসের সাথে বিরোধ হতে পারে এমন কাজ না করলেও তো পারেন? যেতেই যদি হয়, নিরিবিলি দ্বীপে আপনি একা যান।'

'আপনার কথাবার্তা শুনে আমার ধারণা হয়েছিল জোট বাঁধার ব্যাপারে আমরা একমত হয়েছি।' চোখের মণি হঠাৎ ঝিক করে উঠতে দেখে বোঝা গেল টিনা

সিরিয়াস।

'সেটা পুলিস মঞ্চে আসার আগের ব্যাপার ছিল,' শান্ত সুরে বলল রানা। 'পুলিস এখন আমার আর ওদের পিছু ধাওয়া শুরু করেছে। এখনকার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা। আপনাকে যদি আমাদের সাথে পায় ওরা, আপনার জন্যে সেটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে।'

'এরই মধ্যে আপনাদের তিনজনকে হারিয়ে ফেলেছি,' শান্ত কিন্তু কঠিন সুরে বলল টিনা। 'এখন আর আপনাকে হারিয়ে ফেলা চলে না।' খানিক চুপ করে থেকে মৃদু শব্দে হাসল সে। তারপর বলল, 'তাছাড়া, আমি সাথে না থাকলে দ্বীপটা আপনি খুঁজে পাবেন বলে মনে করি না। শেষ পর্যন্ত ওরা তিনজন ওখানে যদি পৌঁছুতে পারে, আমি ওদের আগেভাগে পৌঁছুতে চাই।'

ভুরু কুঁচকে টিনার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। তারপর বলল, 'স্বীকার করছি, আপনাকে বোঝার সাধ্য আমার নেই। অবশ্য কথাতেই আছে, মানুষ তো কোন্ ছার, দেবতারাও নাকি আপনাদের রহস্য ভেদ করতে পারে না। আর সব মেয়েরা যেমন আচরণ করে বা করতে পারে, আপনার আচরণ তার সাথে মিলছে না। কেমন যেন গণ্ডগোল লাগছে আমার। ভয়ে কুঁকড়ে থাকবেন, সেটাই প্রত্যাশিত ছিল। আমাকে আপনি একদম চেনেন না, অথচ আমার সাথে দিব্যি বেরিয়ে এলেন। নাহ্, আপনাকে বোঝার সাধ্য নেই আমার।'

'কিছু তথ্য দিচ্ছি, দেখুন তারপরও আমার ব্যাপারটা গোলমেলে ঠেকে কিনা।' মৃদু হাসল টিনা। 'স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমার বয়স ছিল সতেরো। একে বয়স কম, অবিবাহিতা, তার ওপর মেয়ে, কাজেই যুদ্ধে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। কিন্তু তাই বলে হাত-পা গুটিয়ে ঘরে বসে ছিলাম, সেটা ধরে নেয়া ঠিক হবে না। প্যান্ট-শার্ট পরে ছেলে সাজা, সাইকেল চালানো, গাছে চড়া, বনে-বাদাড়ে ছুটোছুটি করা এসব ছোটবেলা থেকেই অভ্যাস ছিল আমার। যুদ্ধের সময় আবিদের ঢাকার বন্ধুরা ইন্ডিয়া থেকে ট্রেনিং নিয়ে ফিরল, তাদের সাথে যোগাযোগও হলো আমার। তারাই আমাকে উৎসাহ দিয়ে খবর আদান প্রদানের কাজে নামায়। বললে বিশ্বাস করবেন না, আমি একবার পাঞ্জাবী পাষণ্ডদের ছাউনির ভেতর ঢুকে একটা মেসেজ পৌঁছে দিয়েছিলাম ওদের হাতে বন্দী একজন মুক্তিযোদ্ধার কাছে। ঢাকার কাছেপিঠে বিচ্ছুদের ক্যাম্প কোথায়, এই তথ্যটা জানালে বেচারার ওপর অত্যাচার কমবে মনে করে কমান্ডার তাকে মেসেজ পাঠিয়ে জানাতে চেয়েছিল, তথ্যটা তুমি ফাঁস করে দাও। তার আগেই অবশ্য ক্যাম্প গুটিয়ে নিয়েছিল ওরা। মেসেজটা তার হাতে পৌঁছে দিতে গিয়ে আমি যে ঝুঁকিটা নিয়েছিলাম, পরে ভাবতে গিয়ে নিজেকে আমার পাগল বলে মনে হয়েছিল। ছেলেদের কাপড় পরে ছিলাম বলে! যদি জানত আমি মেয়ে, পাষণ্ডদের ছাউনি থেকে আর বেরিয়ে আসতে হত না। তথ্যটা ফাঁস করে দেয় সে, এবং জানেন, দু'দিন পর তাকে ছেড়েও দেয়া হয়। আরও শুনবেন?'

'বুঝলাম, আপনি খুব দুঃসাহসী মেয়ে,' বলল রানা। 'একজন মুক্তিযোদ্ধার জন্যে এতটা করতে পেরেছেন, নিজের ভাইয়ের জন্যে যে আরও বেশি করতে চাইবেন তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে।'

'ঠিক ধরেছেন।' গম্ভীর দেখাল টিনাকে।

'বেশ!' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল রানা। 'থাকুন আপনি আমার সাথে।' আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল ও, কিন্তু এই সময় ঠক ঠক করে দু'বার নক করে ঘরে ঢুকল রুবি।

বেশ শান্তভাবেই ঢুকছিল রুবি, কিন্তু টিনাকে দেখে কেমন যেন গম্ভীর হয়ে উঠল চেহারা। সেটা অনেক কারণে হতে পারে। পুলিসী ঝামেলায় একটা মেয়ে জড়িয়ে পড়েছে, হয়তো এটা ভাল চোখে দেখছে না সে। আবার এটাও ভেবে থাকতে পারে, ডিউক ভাইয়ের কাছ থেকে যে স্নেহটুকু পেয়ে আসছে সে তাতে বুঝি ভাগ বসাতে এসেছে মেয়েটা।

'এসো, রুবি,' বলল রানা। 'দাঁড়িয়ে পড়লে কেন? এসো, টিনা রহমানের সাথে পরিচয় করিয়ে দিই তোমার। টিনা, এর কথা আপনাকে আগেই বলেছি—এই সেই রুবি।'

মাথা নিচু করে নিঃশব্দে এগিয়ে এল রুবি। হাতের ট্রেটা নামিয়ে রাখল টেবিলের ওপর।

টিনা বলল, 'হ্যাঁ, ডিউক সাহেব তোমার খুব প্রশংসা করছিলেন।' আর কিছু বলার মত খুঁজে পেল না সে।

'রেলের টাইম-টেবল যোগাড় হয়েছে?' জানতে চাইল রানা। হাতঘড়ি দেখল ও। সাড়ে আটটা বাজতে চলল।

'আনতে লোক পাঠিয়েছি, ডিউক ভাই,' মৃদু সুরে বলল রুবি। 'এখুনি এসে যাবে। আর কিছু লাগবে আপনাদের?'

'আর কিছু? না।'

নিঃশব্দে কামরা থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে দরজা ভিড়িয়ে দিল রুবি।

'খুব বিষণ্ণ লাগল মেয়েটাকে,' ট্রে থেকে স্যান্ডউইচ তুলে নিয়ে বলল টিনা।

'আমার শুভাকাঙ্ক্ষী কিনা, হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়ি সেটা চায় না।'

স্যান্ডউইচে কামড় বসিয়ে বলল টিনা, 'ওদের তিনজনের কি হলো না হলো জানতে পারলে হত। না জেনে নিরিবিলিতে যেতে চাই না।'

'চেষ্টা করলে জানা যেতে পারে। এখানে বসে সব খবর যোগাড় করা সম্ভব।'

ওদের খাওয়া শেষ হয়েছে, এই সময় রেলের টাইম-টেবল নিয়ে ফিরে এল রুবি। সেটা হাতে নিয়ে বলল রানা, 'মন দিয়ে শোনো, রুবি। আজই ঢাকা ছাড়তে হচ্ছে আমাকে। সব কথা খুলে বলছি না তোমাকে, কারণ তোমার নিরাপত্তার জন্যেই সব কথা জানা উচিত নয় তোমার। আমরা খুলনায় যাচ্ছি। সাথে নেবার জন্যে আমাদের কিছু খাবার দরকার, কারণ কিছু কেনার জন্যে কোথাও নামব না আমরা। আরেকটা কাজ করতে হবে তোমাকে। আমাদের সাথে কমলাপুর স্টেশনে যাবে তুমি, খুলনার দুটো টিকেট কিনে দেবে। স্টেশনে অবশ্যই পুলিস থাকবে, তাদের চোখে ধরা না পড়ে ট্রেনে উঠতে পারলে বিপদ অনেকটা কেটে যাবে আমাদের। পারবে তো?'

মেয়েটাকে নিয়ে খুলনায় চলে যাবে ডিউক ভাই, দুঃসংবাদটা যেন রুবির বুকে ছুরি হয়ে বিঁধল। তাহলে তার ঠোঁটের কি দশা হবে? কবে ফিরবেন ডিউক ভাই? আদৌ ফিরবেন তো? এই রকম অনেক চিন্তা খেলে গেল তার মাথায়। কিন্তু চেহারায় কোন ভাব ফুটতে দিল না। তার একান্ত ব্যক্তিগত দুঃখ অচেনা একটা

মেয়েকে বুঝতে দিতে চায় না সে। শান্ত সুরে বলল সে, 'পারব না কেন, ডিউক ভাই। আর কি করতে হবে বলুন?'

রেলের টাইম-টেবলটা খুলল রানা। 'খাবারগুলো প্যাক করো, আর রায়হানকে গিয়ে বলো আমি ডাকছি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল রুবি।

'বেচারী!' রুবি বেরিয়ে যেতেই বলল টিনা। 'ভেবেছে আমি ওর প্রতিদ্বন্দ্বী! আপনি ওর ভুলটা ভেঙে দিলেই তো পারেন। এবার এলে বুঝিয়ে বলে দিন, আমি আপনার কেউ নই।'

'ওকে কিভাবে বুঝাই বলুন তো, যেখানে আমি নিজেই ভাল বুঝতে পারছি না।'

মুহূর্তের জন্যে হতভম্ব দেখাল টিনাকে, কিন্তু চেহারায় রাগের কোন ভাব দেখা গেল না। তারপর অধৈর্যের সাথে একটা কাঁধ সামান্য একটু তুলল। 'কথাবার্তা বলার সময় আরও সাবধান হওয়া উচিত আপনার,' শান্ত ভাবে বলল সে। 'কথাটা না বললে খুশি হতাম আমি।'

টাইম-টেবলের খোলা পৃষ্ঠায় চোখ রাখল রানা। 'জানলাম খুশি হতেন। কিন্তু আমি কিছু মিথ্যে বলিনি। আপনার সাথে আমার সম্পর্কটা এখনও ঠিক ঠাক করে উঠতে পারছি না। আপনি এত ছোট নন যে আপনাকে স্নেহ করব। আবার এত বড় নন যে শ্রদ্ধা করা যায়। ভালবাসব, সে যোগ্যতা বোধহয় রাখি না আমি। বন্ধু বলে মনে করব, তাও সম্ভব নয়, কারণ ভালবাসা একতরফা হতে পারে, কিন্তু বন্ধুত্বের বেলায় সেটি হবার যো নেই। আবার, আপনি আমার কেউ নন, এটা মেনে নিতেও মন সায় দেয় না।' তারপর যেন কিছুই ঘটেনি, এমন ভাবে শুরু করল ও, 'খুলনার একটা ট্রেন ভোর তিনটেয় ছাড়বে। কাল সারাটা দিন থাকতে হবে ট্রেনে, রাতটাও, পরও দুপুরের দিকে খুলনায় পৌঁছুবে। এটাই ধরতে হয়, কি বলেন?'

'পুলিস কি সত্যিই স্টেশনে নজর রেখেছে?'

'ওরা তিনজন যদি পালিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে কোন সন্দেহ নেই। চোখ রাখতে কোথাও বাদ দেবে না পুলিস। সেজন্যেই রুবিকে দিয়ে টিকেট কাটাতে চাইছি। আমার চেহারার বর্ণনা সবখানে বিলি করা হয়েছে। ইতিমধ্যে আপনার চেহারার বর্ণনাও বিলি করার কাজ শুরু করে দিয়েছে।'

'ব্যাগটা নিয়ে আসা হলো না,' বলল টিনা। 'কাপড় পাল্টে ওদের চোখ ফাঁকি দেবার চেষ্টা করব তারও উপায় নেই।'

'আমার ব্যাগটাও ফেলে এসেছি,' সিগারেট ধরিয়ে বলল রানা। 'পুলিস জানবে, আকরামের সাথে ছিলাম আমি।' নিজের ওপর রাগে টেবিলের ওপর দুম করে একটা ঘুসি বসিয়ে দিল ও।

দরজার কবাট ফাঁক করে ভেতরে উঁকি দিল রায়হান গফুর। রানার দিক থেকে টিনার দিকে তাকাল সে, তারপর জিভ বের করে ঠোঁটটা ভিজিয়ে নিল। 'আমাকে দরকার, বস্?'

'ভেতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করো,' গম্ভীর সুরে বলল রানা। টিনাকে দেখিয়ে আবার বলল, 'পরিচয় করিয়ে দেব না। ওকে না চিনলে খুব কম মিথ্যে বলতে হবে

তোমার।'

টিনার চোখে চোখ রেখে মাথা নিচু করে সম্মান দেখাল রায়হান। 'আমার দুর্ভাগ্য, ম্যাডাম।'

'কমলাপুরে গোলাগুলি হয়েছে, কিছু জানো?' জিজ্ঞেস করল রানা।

রোগা-পটকা গিটারিস্টের চোখ জোড়া বড় বড় হয়ে উঠল। 'বারে সবাই তো ওটা নিয়েই আসর মাতিয়ে রেখেছে।'

'কি ঘটেছে?'

'হোটেল পুবালিতে পুলিস মেরেছে যারা, এই কাণ্ডটাও তাদেরই।' চেহারায় প্রশংসা ফুটে উঠতে দেখে বোঝা গেল, ওদের তিনজনের বীরত্ব মুগ্ধ করে ফেলেছে তাকে। 'কেউ শত্রুতা করে পুলিসকে জানিয়ে দেয়, বাসাবো এলাকার একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে গা ঢাকা দিয়ে আছে ওরা। সাথে সাথে এলাকাটা ঘিরে ফেলে পুলিস। ওদের মধ্যে একজনের হাত নেই। জানেন, সে একাই কিছুক্ষণ ঠেকিয়ে রাখে পুলিসকে, সেই ফাঁকে বাকি দু'জন পিছন দিয়ে কাট্টি মারে। শুনে মনে হলো, তুমুল গোলাগুলি হয়েছে। কাছে পিঠে থাকলে খুব মজা হত। কয়েক বছরের মধ্যে এ-ধরনের তুলকালাম কাণ্ড আর ঘটেনি।'

'হাত-কাটা লোকটা পালাতে পারেনি?'

'না। পুলিসের গুলি তাকে একেবারে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে।' চেহারা ম্লান হয়ে উঠল রায়হানের। 'বেচারা! যাই বলুন, লোকটার সাহসের প্রশংসা করতে হয়। বাকি দু'জন কাট্টি মারার সময় একজন পুলিসকে মেরে রেখে গেছে। আহতও করেছে কয়েকজনকে। লোকে বলাবলি করছে, ওদের মধ্যে যার নাম আকরাম সে নাকি মারাত্মকভাবে জখম হয়েছে। সত্যি কিনা বলা মুশকিল, নিজেদের নাম ফাটাবার জন্যে এটা পুলিসও রটিয়ে থাকতে পারে।'

রানা আর টিনা পরস্পরের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করল।

'ঠিক আছে, রায়হান, এইটুকুই জানতে চেয়েছিলাম। আর হ্যাঁ, আমার কথা কেউ যেন না জানে। আমি এখানে আছি আলি হোসেনকে সেটা জানাতে চাই না।'

'আমার কাছ থেকে জানবে না কেউ,' কথা দিল রায়হান। তার চোখের দৃষ্টি কেমন যেন সন্দিহান হয়ে উঠল। 'বাজারে গুজব, এই তিনজনের সাথে আপনার নাকি সম্পর্ক আছে, বস্। বাজে কথা, তাই না?'

'এই পরিস্থিতিতে কিছু জিজ্ঞেস করা ঠিক হচ্ছে না,' বলল রানা। ভাবলেশহীন চেহারা।

'না···মানে, ভুলে যান, বস্। ভাবলাম গুজবের কথাটা আপনাকে জানানো দরকার। ওদের দু'জনকে ধরার জন্যে আদাজল খেয়ে লেগেছে পুলিস। খাকী আর নীল ইউনিফর্ম একজনও চারদেয়ালের ভেতরে বসে নেই। ছোট মুখে বড় কথা হয়ে গেলে মাফ করে দেবেন—আপনাকে খুব কেয়ারফুল থাকতে হবে, বস্!'

'থাকব,' বলে মানিব্যাগ বের করে একশো টাকার দুটো নোট বের করে বাড়িয়ে দিল রায়হানের দিকে। 'ধরো, ভাল দেখে এক জোড়া জুতো কিনো।'

খানিক ইতস্তত করার ভান করে নোট দুটো নিয়েই পকেটে ভরে ফেলল

রায়হান। 'ঠেকা না থাকলে নিতাম না। ধন্যবাদ, বস্। আর কোন সাহায্যে আসতে পারি?'

মাথা নাড়ল রানা। 'এবার এসো, রায়হান।'

টিনার দিকে তাকাল রায়হান, মাথা নিচু করে আবার একবার সম্মান দেখাল, তারপর বলল, 'আবার যদি কখনও দেখা হয়, আপনার খেদমতে লাগতে পারলে খুশি হব, ম্যাডাম।' বলে আর দাঁড়াল না সে, কামরা থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল দরজা।

আট

মসজিদের ভেতর নিঃসঙ্গ একটা বাল্‌ব জ্বলছে। ওদের বেশ খানিকটা সামনে বসে নামাজ পড়ছেন মৌলবী সাহেব। সাড়ে আটটা বাজে, এত রাতে কিসের নামাজ পড়ছেন তিনি, বলতে পারবে না আকরাম। নামাজ শেষ করে কখন তিনি নিজের ঘরে ফিরে যাবেন, সেই অপেক্ষায় আছে সে। মসজিদের সাথেই একটা ঘর, দরজাটা হা হা করছে, ওখানে মৌলবী সাহেবই থাকেন বলে আন্দাজ করে নিয়েছে সে। কোটটা খোলার চেষ্টা করছিল, এই সময় ঘর থেকে বেরিয়ে ওদের পাশ দিয়ে হেঁটে সামনে গিয়ে বসলেন তিনি। ওদেরকে নামাজী বলে মনে করেছেন, কাজেই ভাল করে লক্ষ করার তাগাদা অনুভব করেননি। কোটটা আর খোলা হলো না আকরামের। হঠাৎ যদি নামাজ শেষ করে উঠে পড়েন বা পিছন ফিরে তাকান, ঝামেলা হতে পারে। ঝুঁকিটা নিতে মন চাইছে না আকরামের। বাঁ দিকের বাইসেপ চেপে ধরে আছে সে, শিরায় চাপ দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে রক্ত পড়াটা বন্ধ করার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। বাইসেপের যেখানটায় সবচেয়ে বেশি মাংস সেখানে ক্ষত তৈরি করেছে বুলেট। শার্টের বাঁ আস্তিন আর হাতটা রক্তে ভিজে গেছে। টপ টপ করে ঝরছে মেঝেতে। এখান থেকে বেশি দূরে নয়, রাস্তায় এখনও টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে পুলিস। অলিগলি, বাড়ি-ঘর কিছু আর দেখতে বাকি রাখছে না তারা। মৌলবী সাহেব শুধু একবার চিৎকার করে উঠলেই হলো, ঝাঁক বেঁধে মসজিদের ভেতর ঢুকে পড়বে তারা।

কোট প্যান্টের ওপর চাদর মুড়ি দিয়ে আকরামের পাশেই বসে আছে কেয়া। মাথা নিচু, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মেঝের দিকে। পাশে যে একজন আহত লোক রয়েছে, সেদিকে তার কোন খেয়ালই নেই। ব্যাপারটা লক্ষ্য করে রাগে হতাশায় মনে মনে পুড়ছে আকরাম।

ওদের পালানোটা স্রেফ একটা মিরাকল। কিভাবে যে পুলিসের কর্ডন ভেদ করে বেরিয়ে আসা সম্ভব হলো, ধারণাই করতে পারে না আকরাম। কেয়া কোন কাজেই আসেনি, নির্বোধ একটা পুতুল বললেই চলে। সাহায্যে তো আসেইনি, বিপদটা যে কতখানি সে-সম্পর্কেও তার কোন বোধ ছিল না। এমন ভয় পেয়েছিল, পারলে নর্দমার ভেতর লুকায়। বেশ কয়েকবার মৃত্যুর একেবারে কাছাকাছি চলে

গিয়েছিল ওরা, মনে হয়েছিল এবার আর ধরা না দিয়ে উপায় নেই। একবার একজন পুলিস কোণঠাসা করে ফেলেছিল ওদেরকে। লাঠি দিয়ে আকরামের ঘাড়ে মাথায় দমাদম পেটাতে শুরু করল, সেই সাথে ফুঁ দিয়ে বসল বাঁশিতে। মাথা বাঁচাবার চেষ্টা না করে হাতল ধরা ছুরিটা ওপর দিকে ঘ্যাচ করে ঠেলে দিয়েছিল ও। পাঁজরে ছুরির ফলা ঢুকে যেতে পুলিসটার হাত থেকে রেহাই পেল বটে, কিন্তু অন্ধকার থেকে ছুটে এল একটা গরম বুলেট। বাইসেপের একদিক দিয়ে ঢুকে আরেক দিক দিয়ে বেরিয়ে গেল সেটা। তবু কেয়ার হাত ছাড়েনি ও। অন্ধকারে কোথায় কে ওত পেতে আছে কিছু দেখা যায় না, তার ওপর তীব্র ব্যথায় অসুস্থ হয়ে পড়েছে, এই অবস্থায় কেয়াকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া কি যে কঠিন ব্যাপার, হাড়ে হাড়ে টের পেল সে। পুলিসের কর্ডন ছোট আর আঁটসাঁট হয়ে এল একসময়, সেই সাথে আকরামও বেপরোয়া মরিয়া হয়ে উঠল। বুঝল, কেয়াকে বাঁচাবার কথা মন থেকে মুছে ফেলতে না পারলে দু'জনের কারুরই কোন আশা নেই। কিন্তু তবু কেয়ার হাত ছাড়েনি সে। তার বদলে আবিদকে ভুলে থাকার চেষ্টা করল, এই সময় চোখে পড়ল মসজিদটা।

ভাগ্য সহায়তা করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। রাস্তায় আলো ছিল না, সোনায় সোহাগা হয়ে দেখা দিল সেটা। অন্ধকারে অনেক লোকের চেয়ে বেশি দেখতে পায় আকরাম, তার কানও অস্বাভাবিক প্রখর। চারদিকে সশস্ত্র ছায়ারা ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের আশপাশ দিয়ে কেয়াকে নিয়ে মসজিদের উঠানে ঢুকে পড়ল সে। মসজিদেও আসবে পুলিস, ভেবেছিল সে। তাই হাতে ছুরি নিয়ে অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ। কিন্তু আসেনি কেউ। এক দুই করে বেশ কয়েকজনকে মসজিদের সামনে এবং পাশ দিয়ে ছুটে যেতে দেখল ও। খানিক পর ফাঁকা হয়ে এল এলাকাটা। কিন্তু আকরামের সন্দেহ হলো, এলাকা ছেড়ে তারা সবাই চলে যায়নি। দু'একজন অতি সাবধানী নিশ্চয়ই ওত পেতে আছে কোথাও অন্ধকার রাস্তায়।

এতক্ষণে টের পেল আকরাম, জখমটা থেকে হুহু করে রক্ত গড়াচ্ছে। সম্ভবত অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলেই মাথার ভেতরটা শূন্য, ফাঁকা লাগল। কান দুটো ভোঁ ভোঁ করছে, বাইরের আর সব শব্দ অস্পষ্ট শোনাল। সন্দেহ হলো, খানিক পর নড়াচড়া করার শক্তি থাকবে না তার। কেয়ার হাত তখনও ছাড়েনি, তাকে নিয়ে ঢুকে পড়ল মসজিদের ভেতর। বসার সময় বুঝল, দুর্বল হয়ে পড়েছে সে। হাঁটুতে আগের সেই জোর পেল না। এবং বসার পরপরই কেমন যেন আচ্ছন্ন একটা ভাব গ্রাস করল তাকে। বিপদের কথা মনে থাকল না, কেয়ার কথা মনে থাকল না, মনে থাকল না ধরা পড়লে ফাঁসিতে ঝুলতে বা সারা জীবন জেল খাটতে হবে। এমন কি আবিদের কথাও ভুলে গেল সে।

কতক্ষণ এভাবে কেটেছে বলতে পারবে না আকরাম। ঠাণ্ডা বাতাসের ছোঁয়া লেগে আচ্ছন্ন ভাব খানিকটা দূর হলো। কান দুটো আগের মত এখন আর ভোঁ ভোঁ করছে না। বৃষ্টির ঝমঝম আওয়াজ পেল সে। তারপর দেখল, ঘরের দরজা খুলে মসজিদে বেরিয়ে এলেন মৌলবী সাহেব। ওদের পাশ দিয়ে এগোলেন তিনি।

একে একে আবার সব মনে পড়ে গেল আকরামের। প্রথমে মনে পড়ল

আবিদের কথা। তারপর কেয়ার কথা। সব শেষে বিপদের কথা। সচেতন, সতর্ক হয়ে উঠল সে। বুঝল, কেয়ার কাছ থেকে কোন সাহায্য পাওয়া যাবে না। পুলিসকে এড়াতে হলে যা কিছু নিজেকেই করতে হবে ওর।

মৌলবী সাহেব কখন নামাজ শেষ করবেন তার কোন ঠিক নেই। আর সময় নষ্ট করতে রাজি নয় আকরাম। সামনে একটা চোখ রেখে কোটটা খুলতে শুরু করল সে। ব্যথায় বিকৃত হয়ে উঠল চেহারা, কিন্তু মুখ দিয়ে কোন আওয়াজ বের হলো না। কোট খুলে লাল হয়ে ওঠা শার্টের আস্তিনের দিকে তাকাল সে। তারপর কেয়ার কানের কাছে মুখ সরিয়ে নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'আমার জন্যে কিছু করো। রক্ত থামাতে পারছি না। এই, শুনছ?'

ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে আকরামের দিকে তাকাল কেয়া। তাকে চিনতে পারল বলে মনে হলো না। তার কনুইয়ের কাছটা ধরে ঝাঁকি দিল আকরাম। নরম মাংসের ভেতর ডেবে গেল নখগুলো। চাপা গলায় বলল, 'রক্ত থামাতে না পারলে আমি মারা যাব। কিছু একটা করো।'

এতক্ষণে বোধহয় হুঁশ ফিরে এল কেয়ার। আকরামের মুখ থেকে চোখ সরিয়ে লাল আস্তিনের দিকে তাকাল সে। তারপর হাতটা ঝাড়া দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে নিচু গলায় বলল, 'ছুরিটা কোথায়?'

পরম স্তুস্তির সাথে দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলল আকরাম। পায়ের সাথে বাঁধা ছুরিটা বের করে ধরিয়ে দিল কেয়ার হাতে। লক্ষ করল, কেয়ার আচরণে কোন রকম আড়ষ্ট ভাব নেই আর। আগের সেই দক্ষতার সাথে শার্টের আস্তিনটা কেটে ফেলল সে। দু'জনেই গম্ভীর চেহারা নিয়ে তাকিয়ে থাকল কুৎসিত জখমটার দিকে।

'একটা প্যাড তৈরি করে বেঁধে দাও,' বলল আকরাম। 'যেভাবেই হোক রক্ত বন্ধ করতে হবে।'

'আস্তে!' চোখ ইশারায় সামনের মৌলবী সাহেবকে দেখাল কেয়া। দ্রুত হাতে রুমাল ভাঁজ করে একটা প্যাড তৈরি করল সে, বসাল ক্ষতের ওপর। ছুরি দিয়ে চাদরের একটা কোণ থেকে কিছুটা উলেন কাপড় কাটল, সেটা দিয়ে ভাল করে জড়িয়ে বাঁধল প্যাডটা।

'লক্ষ্মী মেয়ে!' জোর করে একটু হাসল আকরাম। 'কোটটা পরতে সাহায্য করো আমাকে। মৌলবী সাহেব দেখে ফেলতে পারেন।'

তারপর অপেক্ষা করা ছাড়া আর করার কিছু রইল না। নামাজ পড়ার ভঙ্গিতে বসে আছে আকরাম, দুই উরুর মাঝখানে ফেলে রেখেছে পিস্তলটা। পা আর হাঁটু দুটো দুর্বল লাগছে। কতটা শক্তি হারিয়েছে বুঝতে পেরে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল সে। জানে, এখন যদি তাড়া করে পুলিস, পালানোর সাধ্য তার নেই। তাই বলে অসহায় বোধ করল না। জানে, খুন হয়ে যাবার আগে যতগুলোকে সম্ভব মেরে রেখে যাবে সে। কেউ তাকে জ্যান্ত ধরতে পারবে না।

রিস্টওয়াচ দেখল সে। দশটা বাজতে চলল। আবিদের বোন আর ডিউকের কথা মনে পড়ল। ডিউকের কোন বিপদ হয়েছে বিশ্বাস করতে মন চাইল না। মেয়েটাকে নিয়ে নিরিবিলি দ্বীপে ঠিকই পৌঁছুবে সে। কিন্তু সেখানে কি সত্যিই

আছে আবিদ? হাত বাড়িয়ে পিস্তলটা ছুঁলো সে, যেন এটার স্পর্শ শক্তি ফিরিয়ে আনবে শরীরে। মনে মনে জানে, এভাবে বেশিদিন চলতে পারে না। পুলিস তাকে ধরে ফেলবে, শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র। আবিদকে যদি পেতেই হয়, এখুনি পেতে হবে। শেষ ভরসা নিরিবিলি দ্বীপ। আবিদ যদি ওখানে না থাকে, পরাজয় মেনে নেয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না। পুলিস পিছু লেগে থাকায় আবিদের সন্ধানে গোটা দেশ চষে বেড়ানো এখন আর তার পক্ষে সম্ভব নয়। যেভাবেই হোক দ্বীপে যেতে হবে তাকে। কিন্তু কিভাবে যাবে, জানে না, কোন ধারণাই নেই।

মাঝরাতের দিকে ঠিক করল আকরাম, মসজিদ থেকে বেরিয়ে যাওয়াটাই নিরাপদ। মৌলবী সাহেব নামাজ শেষ করে নিজের ঘরে ফিরে গেছেন। কিন্তু ঘরের দরজা বন্ধ করেননি। বোধহয় মসজিদের গেট বন্ধ করার জন্যে জেগে বসে আছেন তিনি, ওরা চলে না যাওয়া পর্যন্ত বন্ধ করতে পারছেন না। মৌলবী সাহেব নামাজ শেষ করার পর থেকে ওরাও নামাজ পড়তে শুরু করেছে। পড়া তো নয়, পড়ার ভান করা মাত্র।

ফিসফিস করে বলল আকরাম, 'এবার উঠতে হয়।' অসহ্য ব্যথায় তার চোখ দিয়ে পানি গড়াচ্ছে। 'পারবে তো?' কেয়া দ্রুত মাথা দোলাল দেখে স্বস্তি বোধ করল সে।

'পারব।' চাদরটা দিয়ে ভাল করে মাথাটা ঢেকে নিল কেয়া। 'কিন্তু তুমি? তোমার কি অবস্থা? কেমন লাগছে হাতটা?'

'ভাল না। কিন্তু হাঁটতে পারব।'

'আমি তোমার কোন কাজেই এলাম না,' হঠাৎ বিষণ্ণ সুরে বলল কেয়া।

মাথা নাড়ল আকরাম। ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে, দুশ্চিন্তায় কাহিল হয়ে পড়েছে, ভদ্রতা করে কিছু বলারও ধৈর্য হলো না।

'কি করতে চাও?' জানতে চাইল কেয়া।

'এখন থেকে কিন্তু তোমাকেই কাজ দেখাতে হবে,' বলল আকরাম। 'আমার ওপর ভরসা কোরো না।'

'কি করা হবে ভেবেছ কিছু?' আবার জানতে চাইল কেয়া।

'তোমারই কি সেটা জানার কথা নয়?' ঝাঁঝের সাথে জিজ্ঞেস করল আকরাম। 'অ্যাদ্দিন তো তুমিই সব প্ল্যান করে এসেছ।'

মাথা নিচু করে নিল কেয়া। গভীর মনোনিবেশের সাথে প্ল্যান তৈরি করতে গিয়ে আবিষ্কার করল, আগের মত বুদ্ধি খেলানো যাচ্ছে না। মাঝপথে খেই হারিয়ে ফেলছে চিন্তাগুলো। অনুমান করল, স্নায়ুর ওপর এবার যে অ্যাটাকটা হয়েছিল সেটা আগেরগুলোর চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি করে গেছে। এর আগে প্রতিবার অ্যাটাকের পর খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠেছিল সে। মাথাটাও এই রকম অচল হয়ে পড়েনি। তবু একটা প্ল্যান তৈরি করার চেষ্টা চালিয়ে গেল সে। তার মুখের ভাব দেখে আকরাম টের পেল, সমস্যার কোন সমাধান খুঁজে পাচ্ছে না কেয়া।

'নিরিবিলি,' ধৈর্য হারিয়ে বলল আকরাম। 'আবিদের দ্বীপ। যেভাবে হোক সেখানে আমাদের পৌঁছুতে হবে। বলো, কিভাবে যাওয়া যায়?'

'বাই রোড যাওয়া সম্ভব নয়। কমলাপুর থেকে ট্রেন ধরতে হবে।'
'কমলাপুরে যাব কিভাবে?'
'হাঁটতে হবে।'

থমথমে হয়ে উঠল আকরামের চেহারা। হাঁটতে হবে ভাবলেই ভয় করছে তার। বসে রয়েছে, তাতেই কাঁপছে পা। খানিক পরপরই জ্ঞান হারাবার মত অসুস্থ বোধ করছে সে। না, তার পক্ষে হাঁটা সম্ভব নয়।

'খুব বেশি দূর হাঁটতে পারব বলে মনে হয় না,' কথাটা ভেবেচিন্তে বলল আকরাম। হঠাৎ সন্দেহ হয়েছে, তার দুর্বলতা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পেয়ে গেলে কেয়া হয়তো তাকে ছেড়ে চলে যাবার কথা ভাববে। কেয়ার পক্ষে তা সম্ভব, অতীত অভিজ্ঞতা থেকে জানে সে। মনে মনে ঠিক করে রাখল, বেঈমানীর সামান্যতম লক্ষণও যদি দেখতে পায়, সাথে সাথে কেয়াকে খুন করবে সে। জখমটা ধীরে ধীরে অসাড় হয়ে আসছে, চিমটি দিলেও হাতে তেমন সাড়া পাচ্ছে না সে। ভয় হলো, শেষ পর্যন্ত হয়তো হাতটা কেটে ফেলেই দিতে হবে। কিন্তু সে-সুযোগও কি পাওয়া যাবে? কোথায় ডাক্তার? কোথায় ওষুধ? এই জখমই বোধহয় তার জন্যে কাল হয়ে দেখা দেবে, এতেই হয়তো তার মৃত্যু লেখা আছে। কিন্তু আবিদের ব্যাপারটা তাহলে কি হবে? হঠাৎ ইচ্ছে শক্তিটা প্রবল হয়ে উঠল। মরতে আপত্তি নেই, কিন্তু তার আগে প্রতিশোধ নিতে হবে। 'প্রচুর রক্ত বেরিয়ে গেছে, বুঝলে?'

ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে আকরামের দিকে তাকাল কেয়া। বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা যাচ্ছে আকরামের কপালে। হাঁপাচ্ছে সে। 'আকরাম,' হাত তুলে তার একটা কব্জি চেপে ধরল কেয়া। 'চিন্তা কোরো না। যেভাবে হোক সব ম্যানেজ করব আমরা। যদি ভেবে থাকো আমি তোমাকে ছেড়ে চলে যাব, মন থেকে মুছে ফেলো কথাটা। আমার জন্য কত কি করেছ তুমি। এত রাতে বেবী পাওয়া মুশকিল হবে। কিন্তু রিকশায় চড়ার ঝুঁকি নেব কি?'

জিভের ডগা দিয়ে শুকনো ঠোঁট স্পর্শ করল আকরাম। কেয়ার কাছ থেকে আর সব কিছু আশা করা যায়, কিন্তু সহানুভূতি নয়। ফিরোজ ভাইয়ের মৃত্যুর পর কোমল বৃত্তিগুলো হারিয়ে ফেলেছে ও। কেয়ার চেহারায় দায়িত্ববোধ এবং কৃতজ্ঞতার ভাব ফুটে উঠতে দেখে রীতিমত মুগ্ধ হলো সে।

'হাঁটা আমার জন্যে খুব কঠিন হবে,' বলল সে। 'রিকশা পেলে মন্দ হত না। কোটটা এখানে ফেলে যাব। ব্যাগ খুলে চাদরটা বের করো। গায়ে জড়িয়ে নিই।'

ব্যাগ খুলে চাদর বের করল কেয়া। গায়ে জড়িয়ে নিল আকরাম।

'ট্রেন কখন ছাড়বে জানা দরকার,' বলল কেয়া। 'তুমি এখানে বসো, বাইরে বেরিয়ে দেখি কোথাও থেকে স্টেশনে টেলিফোন করা যায় কিনা।'

দ্রুত মাথা নাড়ল আকরাম।

'কেন? চাদর মুড়ি দিয়ে আছি, কেউ চিনতে পারবে না আমাকে,' বলল কেয়া।

'না।' আবার ঘন ঘন মাথা নাড়ল আকরাম। 'গেলে একসাথেই যাব আমরা,

কেয়া।'

তাকে আকরামের প্রয়োজন, বুঝতে পেরে মনটা খুশি হয়ে উঠল কেয়ার। আকরামের ভয়টা কোথায়, তাও বুঝল সে। আহত হয়ে অসহায় বোধ করছে আকরাম, সন্দেহ করছে, তাকে একা ফেলে পালাবে সে। 'ঠিক আছে,' খানিক পর বলল। 'প্যাসেঞ্জার ট্রেন নয়, আমরা মালগাড়িতে চড়ব। স্টেশনে যাবার দরকার নেই, তাতে অনেক ঝুঁকি। চিন্তা নেই, আমি তো আছিই!'

ধীরে ধীরে, টলমল করতে করতে উঠে দাঁড়াল আকরাম। 'কিন্তু খুলনা অনেক দূরের পথ, কেয়া। আমার চিন্তা হচ্ছে। পৌঁছতে পারব বলে মনে করো?'

'পারব না মানে?' কেয়ার চেহারায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ভাব ফুটে উঠল। 'পারতেই হবে।' উঠে দাঁড়াল সে। 'চলো, দেরি করা উচিত হচ্ছে না।'

অন্ধকার উঠানে বেরিয়ে এল ওরা। বৃষ্টি কমে গেছে, কিন্তু থেমে যায়নি। গুটি গুটি পায়ে নির্জন রাস্তায় এসে দাঁড়াল ওরা দু'জন।

নয়

পরদিন সকাল দশটায় জামালপুর পৌঁছুল প্যাসেঞ্জার ট্রেন। মেঘে মেঘে ঢাকা পড়ে আছে আকাশ, সারারাত ঝমঝম করে ঝরার পর এখন একটু ধরে এসেছে বৃষ্টি। হিমেল বাতাস বয়ে যাচ্ছে প্ল্যাটফর্মে, শীতে হি হি করতে করতে কমপার্টমেন্টগুলোয় উঁকি দিচ্ছে প্যাসেঞ্জাররা, কোথাও যদি খালি একটা সীট পাওয়া যায়। তৃতীয় শ্রেণীর একটা কমপার্টমেন্টের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে রানা, ময়মনসিংহ থেকে কেনা সাদা একটা উলেন মাফলার দিয়ে গলা, কান, মাথা সব ঢেকে রেখেছে ও।

ময়মনসিংহ স্টেশনে বেশ ক'জন পুলিসকে দেখেছে ও। কিন্তু তাদের হাবভাব দেখে মনে হয়নি কাউকে খুঁজতে বেরিয়েছে তারা। তবু, কোন রকম ঝুঁকি নিচ্ছে না ও। রুবি ওদেরকে টিকেট কিনে ট্রেনে তুলে দেবার পর থেকে টিনাকে নিজের কাছ থেকে দূরে, পাশের কমপার্টমেন্টে পাঠিয়ে দিয়েছে। দুই কমপার্টমেন্টের মাঝখানে দরজা আছে, কিন্তু পই পই করে নিষেধ করে দিয়েছে তাকে, পরিস্থিতি যতই গুরুতর হোক, ওর কমপার্টমেন্টে ভুলেও যেন না আসে সে। সব যদি ভালয় ভালয় ঘটে, যশোরে পৌঁছে দেখা করবে রানা তার সাথে। ঢাকা থেকে উঠেছিল টিনা ট্রেন ছাড়ার দশ মিনিট আগে, আর রানা উঠেছে ট্রেন চলতে শুরু করার পর, শেষ মুহূর্তে। তারপর এক এক করে স্টেশনগুলো পেরিয়ে এসেছে ওরা, প্রায় প্রতিটি স্টেশনে পুলিস ছিল, কিন্তু কমপার্টমেন্টে ঢোকেনি একজনও।

কথা যাই হয়ে থাকুক, টিনা কেমন আছে, কি করছে দেখার জন্যে একটা তাগিদ অনুভব করল রানা। আজকের খবরের কাগজ এরই মধ্যে পৌঁছে গেছে জামালপুরে। একজন হকারকে ডেকে দুটো দৈনিক কিনল ও। পড়ল না, ভাঁজ করে

রেখে দিল ট্রাউজারের পকেটে। টিনার সাথে কথা বলার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠেছে মন। বিপদের কোন লক্ষণ নেই যখন, দু'জনে একই কমপার্টমেন্টে বসতে পারে ওরা। কিন্তু জায়গা পেলে হয়, যা ভিড়!

ট্রেন ছাড়তেই উঠে পড়ল রানা। পাশের কমপার্টমেন্টে ঢুকে কোথাও দেখল না টিনাকে। গেল কোথায়! আরেকবার ভাল করে খুঁজতে শুরু করল ও। প্রচণ্ড ভিড়, প্যাসেঞ্জারদের সবাইকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ সুটকেস আর ব্যাগ-ব্যাগেজের একটা দেয়ালের ওপারে টিনার মুখ দেখা গেল। ওর দিকেই তাকিয়ে আছে, চোখ পিট পিট করছে। চোখাচোখি হলো বটে, কিন্তু এমন ভাব করল ওরা, যেন কেউ কাউকে চেনে না। ঘুরে দাঁড়িয়ে কমপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে এল রানা, দাঁড়াল দুই কমপার্টমেন্টের মাঝখানে। ছোট একটা প্ল্যাটফর্ম, এটাই কমপার্টমেন্ট দুটোকে জোড়া লাগিয়েছে। কোন সীট নেই এখানে, কাজেই লোকজনও নেই। টিনার জন্যে অপেক্ষা করার সময়টা খবরের কাগজের হেডিংগুলোয় চোখ বুলাতে শুরু করল রানা। সামনের পৃষ্ঠায় নিজের ছবি দেখে শিরদাঁড়া বরাবর শীতল একটা স্পর্শ অনুভব করল ও। ছবির মাথায় বড় বড় হরফে একটা ক্যাপশন ছাপা হয়েছে: 'পুলিস একে খুঁজছে।'

নিজের ছবি, চিনতে অসুবিধে হলো না। বছর দুয়েক আগে ওর ডেরা থেকে চুরি হয়েছিল ফটোটা। তখনই সন্দেহ করেছিল ও, কাজটা পুলিসেরই। দু'বছর আগের চেহারার সাথে ওর এখনকার চেহারা হুবহু না মিললেও বেশ অনেকটা মেলে।

ফটোর নিচে ছাপা হয়েছে রিপোর্টটা, কিন্তু সেটা না পড়ে পকেট থেকে ব্যস্ত হাতে আরেকটা দৈনিক বের করল রানা। ভাঁজ খুলতেই নিজের চেহারা দেখতে পেল।

এটা আশা করেনি ও। যে-কোন মুহূর্তে ট্রেনের কেউ চিনে ফেলতে পারে ওকে। টিনার খোঁজে এক কমপার্টমেন্ট থেকে আরেক কমপার্টমেন্টে গেছে সে, অনেকেই দেখেছে তাকে, যে-কোন মুহূর্তে চেহারাটা তাদের মনে পড়তে পারে। ফটো জিনিসটা সাংঘাতিক। চেহারার বর্ণনা ক'জনই বা মনে রাখে, কিন্তু ফটো সবারই মনে গাঁথা হয়ে যায়।

রাজ্যের দুশ্চিন্তা নিয়ে রিপোর্টটা পড়তে শুরু করল রানা। সারাদেশ জুড়ে খোঁজা হচ্ছে ডিউক নামের এই ব্যক্তিকে। তাকে খুঁজে পাবার ব্যাপারে জনসাধারণ যেন পুলিসকে সাহায্য করে। ডিউককে খোঁজার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, পুলিসের ধারণা নঈম, শামিমা এবং দু'জন পুলিস অফিসারের খুন সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য জানেন ডিউক। পুলিস বিশ্বাস করে, ডিউক নামের এই ব্যক্তি তদন্ত কাজে তাদেরকে বিশেষ সাহায্য করতে পারবেন।

আকরামের কথা উল্লেখ করার সময় রিপোর্টাররা কোন রকম রাখাঢাকা করেনি। লিখেছে, আকরামই পুলিস অফিসারদেরকে খুন করেছে। তাকে গুলি করতে দেখেছে হোটেল পুবালির ম্যানেজার থেকে শুরু করে বয়-বেয়ারারা অনেকেই।

'আমাকে দেখতে দিন,' বলল টিনা। কাগজ দুটো রানা লুকিয়ে ফেলার আগেই কাছে এসে পড়ল সে।

কাগজগুলো দ্রুত ভাঁজ করে কোটের পকেটে ভরে ফেলল রানা। 'থামবেন না, হাঁটতে থাকুন! আমার কাছ থেকে সরে থাকতে হবে আপনাকে। কাগজে আমার ছবি ছেপেছে, যে-কোন মুহূর্তে লোকজন আমাকে চিনে ফেলতে পারে।'

বিপদের গুরুত্বটা সাথে সাথে বুঝল টিনা, কিন্তু রানাকে ছেড়ে চলে যাবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না তার মধ্যে। খপ্ করে রানার একটা হাত ধরে টয়লেটের দরজার দিকে এগোল সে। রানাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে দ্রুত হাতে বন্ধ করে দিল দরজা। 'অন্তত কিছুক্ষণ এখানে নিরাপদে থাকা যাবে,' শান্তভাবে বলল সে। 'আপনার ফটো ওরা পেল কিভাবে?'

বিরক্তির সাথে হাত ঝাড়া দিল রানা। 'এখন আর ওসব জেনে লাভ কি! দু'বছর ধরে ওদের কাছে ছিল ওটা। আসল কথা হলো, কেউ না কেউ আমাকে চিনে ফেলতে বাধ্য। হয়তো এরই মধ্যে চিনে ফেলেছে।'

'কই দেখি, ফটোটা দেখতে দিন আমাকে।'

ইতস্তত করতে লাগল রানা, শামিমা খুন হয়েছে সেটা টিনাকে জানতে দিতে চায় না। কিন্তু সেই সাথে উপলব্ধি করল আগে বা পরে খবরটা জানবেই টিনা। আর কারও কাছ থেকে জানার আগে তার কাছ থেকে জানাটা বরং ভাল। পকেট থেকে খবরের কাগজ দুটো বের করে টিনার হাতে ধরিয়ে দিল ও।

ফটোটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল টিনা। 'হ্যাঁ, আপনাকে চেনা যাচ্ছে। পুরানো ছবি, কিন্তু মিল খুঁজে পেতে অসুবিধে হয় না। খুলনায় পৌঁছুতে দেরি আছে আমাদের। কি করবেন বলে ভাবছেন?'

'পথে কোথাও নামব না,' গম্ভীর সুরে বলল রানা। 'ঝুঁকিটা নিতেই চাই আমি। কিন্তু আপনাকে আমার কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে হবে। সাধারণ মানুষের বুদ্ধিকে খুব বড় করে দেখার দরকার নেই। আমাকে তারা নাও চিনতে পারে।'

কেমন যেন অন্যমনস্ক দেখাল টিনাকে। রিপোর্টটা মন দিয়ে পড়ছে। তারপরেই শিউরে উঠল।

'একি! শামিমা...' ঝট্ করে তাকাল রানার দিকে। চোখে সন্ধানী, সপ্রশ্ন দৃষ্টি। 'লিখেছে খুন করা হয়েছে তাকে!'

'ঠিকই লিখেছে,' শান্ত ভাবে বলল রানা। 'পুলিসের বিশ্বাস, খুনটা আমি করেছি। ওর সাথে ছিলাম আমি, সিঁড়ির মাথা থেকে পড়ে যায় ও।'

ভয় আর অবিশ্বাসের ছাপ পড়ল টিনার চেহারায়। 'পড়ে গিয়েছিল? কিন্তু এখানে তাহলে লেখা হলো কেন, খুন করা হয়েছে? তারপর, আরেকজন, নঈম—এর কথা বলেছেন মনে হচ্ছে; এর সাথেও কি আপনি ছিলেন?'

'ছিলাম!' পকেটে হাত ভরে সিগারেটের প্যাকেট বের করে ধরাল রানা। ধরাবার সময় সরাসরি না তাকিয়েও লক্ষ্য করল, একটু একটু করে পিছিয়ে যাচ্ছে টিনা। কিন্তু ছোট্ট জায়গা, দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেল তার। ব্যাপারটা দেখেও না দেখার ভান করল রানা, সিগারেটে বড় করে টান দিল ও, তারপর বলল, 'আপনি

কি ভাবছেন জানি। সেজন্যে আপনাকে আমি দোষ দিতে পারি না। আপনাকে অন্য রকম কিছু ভাবতে সাহায্য করব, আমার পক্ষে তাও সম্ভব নয়। আসলে,' অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ও, '...আসলে কিছু আসে যায় না।' এটা তোমার মিথ্যে কথা ডিউক, মনে মনে বলল রানা। আসে যায় না মানে? নিশ্চয়ই আসে যায়। টিনা তাকে খুনী হিসেবে জানুক, তা কি চায় সে? না। 'আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাচ্ছে। প্রথমেই ভুল হয়েছে আমার। আপনাকে জড়ানো উচিত হয়নি।' আবার সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল রানা। 'আমার বুদ্ধি নিন, জগন্নাথগঞ্জে ট্রেন থামলে নেমে যান আপনি, ফিরতি ট্রেন ধরে ফিরে যান ঢাকায়। আমার কাছ থেকে দূরে থাকাই এখন আপনার জন্যে মঙ্গল।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকল রানা। সিগারেটের আগুনের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। টিনার দিকে তাকাতে সাহস হলো না। 'আমি আপনাদের নিরিবিলি দ্বীপে যাচ্ছি,' আবার বলল ও। 'আমার বিশ্বাস আপনার ভাই আছে ওখানে। তার সাথে আমার কথা হওয়া দরকার। আমার বুদ্ধি নিলে, আর আপনার ভাইকে সাহায্য করতে চাইলে, দয়া করে পুলিসকে জানাবেন না কোথায় যাচ্ছি আমি।'

'এসবের পেছনে কিছু একটা আছে, তাই না?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইল টিনা। 'সেই প্রথম থেকেই আমার মনে হয়েছে, কি যেন আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছেন আপনি। কি সেটা?'

ছাড়াছাড়ির এই মুহূর্তে হঠাৎ করে টিনার কাছে ভালমানুষ হবার প্রচণ্ড একটা তাগিদ অনুভব করল রানা, ঠিক করল সত্যি কথাটাই বলবে। 'হ্যাঁ, লুকিয়ে রেখেছি,' ধীরে ধীরে বলল ও। 'কথাটা আপনাকে বলতে খারাপ লাগছে আমার, কিন্তু না বললেও নয়। মনে আছে, ফিরোজ চৌধুরীর গেরিলা দলে মোট নয়জন ছিল ওরা? ফিরোজ চৌধুরী, রেন্টু, কেয়া, সাজিয়া, জাফর, আকরাম, শাহেদ, মনসুর আর আবিদ। ফিরোজ চৌধুরী, সাজিয়া আর রেন্টুকে মেরে ফেলে খান সেনারা। আপনার ভাই আবিদ গায়েব হয়ে যায়। বাকি থাকে পাঁচজন, ওদের প্রত্যেকের ধারণা হয়, ফিরোজ চৌধুরী এবং গোটা দলের সাথে বেঈমানী করেছে আবিদ। এতদিন ওরা পাকিস্তানে বিনা বিচারে আটক ছিল, জেল ভেঙে এখন বাংলাদেশে এসেছে বেঈমানীর প্রতিশোধ নেবে বলে। ওদের দু'জন, জাফর আর মনসুর, একটা করে ক্লু পায়। সেই ক্লু ধরে এগোতে গিয়ে দু'জনেই মারা পড়ে। একজন ট্রেনে কাটা পড়ে, আরেকজন পুকুরে ডুবে। আপনার ভাই সম্পর্কে তথ্য যোগাড় করার জন্যে শামিমার কাছে যাই আমি। আপনার ফোন নাম্বার নিয়ে আসার জন্যে দোতলায় উঠছিল সে, এই সময় তার চিৎকার শুনতে পাই। ছুটে গিয়ে দেখি সিঁড়ির মাথা থেকে একেবারে নিচে পড়ে গেছে সে। ঘাড় ভেঙে যাওয়ায় সাথে সাথেই মারা যায়।' দেয়ালে হেলান দিল রানা, ট্রেনের সাথে ঝাঁকি খেতে শুরু করল শরীরটা। 'মনসুর, জাফর আর শামিমা মারা গেল। হয় তারা আবিদ সম্পর্কে কোন তথ্য জানত, নয়তো হঠাৎ করে তার সামনে পড়ে যায়। কে খুন করল ওদেরকে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়, আপনি কি বলেন?'

আশ্চর্য শান্তভাবে বলল টিনা, 'ঠিক কি বোঝাতে চাইছেন, জানি না। আমার ভাই ওদেরকে খুন করেছে, এই রকম কিছু?'

'ব্যাপারটা কাকতালীয় হতে পারে না। একের পর এক তিনটে দুর্ঘটনা ঘটেছে এ আমি বিশ্বাস করতে রাজি নই। একটা হতে পারে, সম্ভবত দুটো, কিন্তু তিনটে হতে পারে না।'

'তাহলে এইজন্যেই আপনি আবিদকে খুঁজছেন?'

'হ্যাঁ। জানা কথা, আপনাকে সাইড নিতে হবে। আপনার জন্যে সবচেয়ে ভাল হবে, আমার ওপর সব ছেড়ে দিয়ে ঘরে ফিরে যাওয়া। কোথায় যাচ্ছি আমি তা যদি পুলিসকে বলে দেন, তাতে আবিদ কোথায় আছে সেটা তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে।'

'আপনি তাহলে আবিদের বিপক্ষে?'

টিনার ম্লান, ফ্যাকাসে চেহারার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল রানা, তারপর বলল, 'হ্যাঁ। আমাকে প্রমাণ করতে হবে আবিদ বা আর কেউ শামিমাকে খুন করেছে, তা না হলে এই খুনের দায়টা আমার ঘাড় থেকে নামবে না। পুলিসের সাথে আমার সদ্ভাব নেই, এই সুযোগ তারা ছাড়বে কেন? কাজেই, আপনার ভাইয়ের সাথে অবশ্যই আমার কথা হওয়া দরকার।'

'এসব কথা আপনি আমাকে আগে বলেননি কেন?'

'বলিনি কারণ আপনার সাহায্যে আবিদের সন্ধান পাব বলে আশা করেছিলাম।'

'হঠাৎ সে আশা ত্যাগ করছেন যে?'

সিগারেটে টান দিতে গিয়ে দেখল রানা, অনেক আগেই নিভে গেছে সেটা। মেঝেতে ফেলে সেটার ওপর জুতো চাপা দিল। 'তার কারণ বোধহয় এই যে, আগে আপনাকে জানার সুযোগ হয়নি, এখন হয়েছে। আগে আপনি ছিলেন স্রেফ একটা মেয়ে, যাকে ব্যবহার করা যেতে পারত। এখন আপনি অন্য কিছু।'

'আচ্ছা!'

বিদ্রূপের সুরটা গায়ে মাখল না রানা, বলল, 'আর কিছু বলার নেই আমার। নিজের সীটে ফিরে যান এবার। সামনের স্টেশনে ট্রেন থামলে নেমে যাবেন। আমার কথা ভুলে যান। কথা দিচ্ছি, আপনার ভাইকে আমি একটা সুযোগ দেব, নিজেকে যদি সে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারে, তার সাথে আমার কোন শত্রুতা থাকবে না।' হঠাৎ টিনার হাত ধরার প্রচণ্ড একটা ঝোঁক চাপল ওর, কিন্তু অনেক কষ্টে সেটাকে দমন করল। নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলল, 'আপনাকে এসবের মধ্যে টেনে নিয়ে এসেছি, সেজন্যে আমাকে মাফ করবেন। আর দেখা হবে না। বিদায়। আপনার সাথে সময়টা ভালই···মানে—আপনার সান্নিধ্য আমার ভাল লেগেছিল!' বলে আর দাঁড়াল না রানা, টয়লেটের দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। বেরিয়ে যাচ্ছে, এই সময় টিনার একটা হাত বাধা দিল ওকে। সেটা ধরে সরিয়ে দিল রানা। পিছন ফিরে তাকাল না।

একনাগাড়ে, একের পর এক ঝাঁকি খেতে শুরু করল গুডস্ ওয়াগনগুলো। সামনে

লালবাতি, ব্রেক করেছে ড্রাইভার। লাইনের সাথে চাকার ঘষায় তীক্ষ্ণ আওয়াজ উঠল, জ্ঞান ফিরে পেয়ে আকরামের মনে হলো, ঘুম ভাঙল তার। চোখ মেলে অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেল না সে। সাথে সাথে সতর্ক, সাবধান হয়ে উঠল। কিন্তু মাথাটা তুলতে গিয়েও নাড়া খেলো বাঁ হাত, অসহ্য ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল সে। ওয়াগনের ঠাণ্ডা মেঝেতে মাথা নামিয়ে ঘন ঘন আওয়াজ করে হাঁপাতে লাগল। মাথার ভেতর ভোঁতা হাতুড়ির বাড়ি অনুভব করল সে। এই রকম দুর্বল আর অসুস্থ আগে কখনও হয়েছে বলে মনে পড়ে না। ভয় করতে লাগল তার। চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে এল।

'কেয়া!' নিজের কানেই কর্কশ শোনাল গলার আওয়াজ, চিনতে পারল না। ঘাবড়ে গেল সে। 'কেয়া··· কোথায় তুমি?'

'এই যে, এখানে। কেন?' অন্ধকার থেকে জানতে চাইল কেয়া। ওয়াগনের খালি মেঝেতে তার জুতো ঘষা খেলো, উঠে বসল সে।

'আমার···হাতের অবস্থা ভাল নয়।' তীব্র যন্ত্রণা সহ্য করার জন্যে দাঁতে দাঁত চেপে রেখেছে আকরাম। গোটা হাতটায় যেন আগুন ধরে গেছে। 'গলাটা শুকিয়ে গেছে, পানি নেই, না?'

'নেই।'

কেয়া তার কাছে আসবে, দু'একটা সহানুভূতির কথা বলবে, সেজন্যে অপেক্ষা করতে লাগল আকরাম। কিন্তু নিজের জায়গা ছেড়ে নড়ল না কেয়া। কপালের দু'পাশ আঙুল দিয়ে চেপে ধরে মিনিট কয়েক পড়ে থাকল আকরাম, কিন্তু ভোঁতা হাতুড়ির বাড়িগুলো থামল না তাতে। নড়াচড়া না করেও বুঝল সে, ঘুমের মধ্যে অল্প যে-টুকু ছিল সে-টুকু শক্তিও ফুরিয়ে গেছে তার। অথচ তার মনটা, মাথাটা অস্বাভাবিক সচেতন হয়ে আছে। বুঝল, ভোজ্ঞ বাজির মত কিছু একটা না ঘটলে স্ট্রেচার ছাড়া এই মালগাড়ি থেকে নেমে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।

'অসম্ভব গুমোট লাগছে, দম বন্ধ হয়ে যাবে,' হঠাৎ বলল সে। 'একটু বাতাস পাওয়া যায় কিনা দেখো না একটু! কোথায় তুমি? আমাকে একটু দেখবে না?'

আওয়াজ শুনে বুঝল আকরাম, উঠে দাঁড়িয়ে সাবধানে এগোচ্ছে কেয়া। দরজায় শব্দ হলো। সকেট থেকে বারটা সরিয়ে নিতেই ধাতব আওয়াজ পেল আকরাম। দরজার ওপরের অর্ধেক খুলে গেল, সেই সাথে হিমেল বাতাস এসে লাগল চোখেমুখে। শান্তিতে গা যেন জুড়িয়ে গেল। আবছা আলো দেখে বুঝল সে, সকাল হতে আর বেশি দেরি নেই। সেদিকে তাকিয়ে কেয়াকেও দেখতে পেল সে। আবছা আলোর গায়ে ক্ষীণ একটা ছায়া। উঠে বসার চেষ্টা করল সে। কিন্তু সাথে সাথে হাতের জখমে ছুরির কোপ পড়তে শুরু করল। গুঙিয়ে উঠল সে।

গোঙানির আওয়াজটাকে সম্পূর্ণ ভুল বুঝল কেয়া। ঝাঁঝের সাথে বলল সে, 'বিরক্ত হয়ে কোন লাভ নেই। লালবাতি দেখে দাঁড়িয়ে পড়ছে ট্রেন।' হাতঘড়ি দেখল সে। 'মাত্র সাড়ে চারটে বাজে।'

পরস্পরের সাথে সেঁটে থাকা দুই সারি দাঁতের ফাঁক দিয়ে শব্দগুলোকে ঠেলে দিয়ে জানতে চাইল আকরাম, 'আমরা কোথায়, কেয়া? জানো?'

'ঠিক জানি না—সামনেই বোধহয় ঈমানপুর।' দরজা থেকে বাইরের দিকে ঝুঁকে এলাকাটা দেখার চেষ্টা করল কেয়া। কিন্তু ভোরের আলো ভাল করে ফোটেনি এখনও। 'যতদূর মনে হচ্ছে, পশ্চিম ঈমানপুর।'

ঈমানপুর? কেয়ার কি মাথা খারাপ হলো? ব্যথায় অস্থির হয়ে চোখ বুজল আকরাম। কোথায় আছে, কোথায় যাচ্ছে, হঠাৎ করেই এসব ব্যাপার তার কাছে গুরুত্বহীন হয়ে উঠল। অসহ্য কষ্ট মুখ বুজে হজম করার চেষ্টা করল সে। এভাবে কতক্ষণ কেটে গেছে বলতে পারবে না, তারপর হঠাৎ ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। বিস্ময়ের ধাক্কায় ঝাঁকি খেলো শরীরটা। সচেতন, সতর্ক হয়ে উঠল সে।

ট্রেন আবার চলতে শুরু করল।

ঈমানপুর? কি বলল কেয়া, ঈমানপুর? তা কি করে হয়? ঈমানপুর তো পাকিস্তানে! আর ওরা রয়েছে বাংলাদেশে। নাকি বাংলাদেশে নেই···ধ্যেৎ, পাগল নাকি! কিন্তু কেয়া তাহলে কথাটা বলল কেন? নিশ্চয়ই ওর মাথা খারাপ হয়ে যায়নি? তবে কি···? দ্রুত সব ঘটনা মনে করার চেষ্টা করল সে। মসজিদ থেকে কমলাপুর স্টেশনে রিকশায় এসেছিল ওরা, পরিষ্কার মনে আছে। ক'দিন আগের ঘটনা সেটা?

মনে করতে পারল না আকরাম। কমলাপুর স্টেশনে পৌঁছুবার পর কি কি ঘটেছে, ধীরে ধীরে মনে করার চেষ্টা করল সে। রিকশাওয়ালা লোকটা বুড়ো ছিল, ওদের দিকে ভাল করে তাকাবার উৎসাহই বোধ করেনি সে। তাকালেও পরে আর চিনতে পারত না। আর চিনতে পারলেও পুলিসের কাছে গিয়ে খবরটা পৌঁছে দেবার গরজ হত না তার। রিকশায় উঠেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলে আকরাম, অনেক চেষ্টা করে স্টেশনে পৌঁছুবার ঠিক আগের মুহূর্তে তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনে কেয়া। রিকশা থেকে নেমে কিভাবে যে সে গুডস্ ইয়ার্ডে পৌঁছেছিল, মনে নেই তার। শুধু অস্পষ্টভাবে মনে পড়ে, রেললাইনের ওপর দিয়ে অনেক, অনেকক্ষণ ধরে হাঁটতে হয়েছে তাকে, কেয়ার কাঁধে ভর দিয়ে। কোন্ ট্রেনে উঠতে হবে সেটা কিভাবে জানল কেয়া, বলতে পারবে না সে। প্ল্যাটফর্মের উল্টোদিকে, অন্ধকার জায়গায়, একটা তেলের ড্রামের ওপর তাকে বসিয়ে রেখে চলে গিয়েছিল ও। সময় সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না তার। তাকে অসুস্থ দেখে কেয়া সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে বলে স্বস্তি বোধ করেছিল। সম্ভবত ঘণ্টাখানেক পর ফিরে এসেছিল কেয়া। মনে পড়ে, ড্রাম থেকে অনেক কষ্টে নামায় তাকে। কিন্তু হেঁটে এসে ট্রেনে উঠবে, সে শক্তি ছিল না তার। কেয়া তাকে একরকম বয়েই নিয়ে আসে। কিন্তু ওয়াগনে তাকে তুলতে গিয়ে বিপদে পড়ে যায় কেয়া। নিজে চেষ্টা করতে গিয়ে দু'বার পিছলে পড়ে যায় আকরাম। শেষ পর্যন্ত কেয়ার পিঠে পা রেখে উঠতে হয় তাকে। ওয়াগনে ওঠার পর তেলের গন্ধ পেয়েছিল সে। তারপর আর কিছু মনে নেই।

এরপর কি ঘটেছে? কেয়া ঈমানপুরের কথা বলছে কেন? কতক্ষণ, ক'দিন ঘুমিয়েছে সে? ওরা কি তবে ইন্ডিয়া হয়ে পাকিস্তানে চলে এসেছে? না, তা কি করে হয়! নাকি শুনতে ভুল হয়েছে তার? হয়তো বাংলাদেশেরই কোন জায়গার নাম

বলেছে কেয়া, শুনতে অনেকটা ঈমানপুরের মত? কিংবা ঈমানপুর নামে কোন জায়গা বাংলাদেশেও আছে। অতীতে ফিরে গেল মনটা। ঈমানপুর! ওদের নয়জনের হেডকোয়ার্টার। ফিরোজ ভাইয়ের শেষ আস্তানা। যেখানে কবর দেয়া হয়েছে সাজিয়াকে। মন্দ হয় না! হঠাৎ সমস্ত ব্যথা ভুলে গিয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠল আকরাম। হয়তো ভাগ্যে আছে সাজিয়ার পাশে থাকা। সেই ভাগ্যেরই নির্দেশে কেয়া যাদুমন্ত্র বলে তাকে নিয়ে পাকিস্তানে চলে এসেছে। কিন্তু সহজ বুদ্ধিতে ব্যাপারটা খাপে খাপে মিলছে না। তাহলে নিশ্চয়ই শুনতে ভুল করেছে সে।

'কেয়া? জায়গাটার কি যেন নাম বললে তুমি?'

'ঈমানপুর,' ঘাড় ফিরিয়ে আকরামের দিকে তাকাল কেয়া, তীক্ষ্ণ গলায় জবাব দিল। 'বিশ্বাস না হলে উঠে এসে নিজের চোখেই দেখো না। ওখানে বসে আছ কি করতে? ওঠো! আর একটু পরই থামবে ট্রেন।'

'কিন্তু ঈমানপুরে আমরা এলাম কিভাবে? কবে এলাম?' জানতে চাইল আকরাম। বিস্ময়ে হতভম্ভ দেখাল তাকে। 'কি ঘটেছে সব বলো আমাকে, কেয়া। ইন্ডিয়া পেরিয়ে কিভাবে এলাম পাকিস্তানে?'

'চুপ করো তো! কি সব আবোল তাবোল বকছ!' তীব্র ঝাঁঝের সাথে খেঁকিয়ে উঠল কেয়া, আবার দরজা থেকে ঝুঁকে পড়ল বাইরের দিকে। ভোরের আলো আগের চেয়ে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে, আকরাম এখন আরও স্পষ্টভাবে দেখতে পেল কেয়াকে। তীব্র বাতাসে পতাকার মত উড়ছে তার চুল।

'আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, কেয়া!' আবেদনের সুরে বলল আকরাম। 'আমরা কোথায়? পাকিস্তানে, নাকি বাংলাদেশে?'

'পাগল নাকি? বাংলাদেশ বাংলাদেশ করছ কেন?' রাগে কেঁপে গেল কেয়ার গলা।

দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল আকরাম। খোদার কাছে হাজারো শোকর, সাজিয়ার কাছে চলে এসেছে সে! সন্দেহ নেই, ভোজবাজির মত কিছু একটা ঘটেছে। নিজের কি হবে এখন আর তা কেয়ার করে না সে। ঈমানপুরে মরতে পারলে তার আর কিছু চাওয়ার নেই। সাজিয়ার কাছে মাটি পেলে তৃপ্তি, সুখ আর আনন্দের সাথে মৃত্যুকে বরণ করে নেবে সে। কিন্তু আবার সহজ বুদ্ধি তাকে সচেতন করে তুলল। কিভাবে তারা পাকিস্তানে আসতে পারে? এ যে অসম্ভব ব্যাপার!

'কেয়া···এদিকে এসো,' ডাকল সে, ট্রেনের যান্ত্রিক আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল গলা। 'কেয়া!'

'দাঁড়াও!' পাল্টা চিৎকার করে জবাব দিল কেয়া। বাইরের দিকে আরও ঝুঁকে পড়ল সে। ভোরের আলোয় আকাশের আভাস টের পাওয়া যাচ্ছে এখন। 'গোলমাল কোরো না তো! নিশ্চয়ই কোথাও আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে ও।'

'কে···কার কথা বলছ?' অবাক হয়ে জানতে চাইল আকরাম।

'বুদ্ধু আর বলে কাকে!' বাইরে চোখ রেখে খেঁকিয়ে উঠল কেয়া। 'জানো না, অ্যাসাইনমেন্ট থেকে ফেরার সময় কে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে? জানো,

জানো! কিন্তু ভান করছ জানো না!'

'কেয়া! তোমার কি হয়েছে বলো তো?'

'আহ্, চোপ!' রাগে বিকৃত শোনাল কেয়ার গলা। 'তোমার সাথে কথা বলতে গেলে ফিরোজকে হয়তো দেখতেই পাব না। ও কি ভাববে বলো তো?'

'কেয়া! এসব কি বলছ তুমি? তোমার কি মাথা···কেয়া! এদিকে এসো!' হাতের ব্যথা, মাথার যন্ত্রণা সব ভুলে গিয়ে ডান হাতের ওপর ভর দিয়ে উঠে বসল আকরাম। 'কেয়া! শোনো! আমার কাছে এসো!'

কিন্তু তার কথায় কানই দিল না কেয়া। হঠাৎ হুইসেল বাজতে শুরু করল, সেই সাথে একটা ঝাঁকি খেয়ে বেড়ে গেল ট্রেনের স্পীড। ছোট্ট একটা স্টেশন, টিম টিম করে বাতি জ্বলছে, প্ল্যাটফর্মে কেউ নেই বললেই চলে, চোখের পলকে সেটাকে পাশ কাটিয়ে ছুটে চলল ট্রেন।

'সর্বনাশ! ট্রেন থামছে না!' উন্মাদিনীর মত চিৎকার জুড়ে দিল কেয়া। 'ঈমানপুর স্টেশন ছাড়িয়ে এলাম আমরা! কি হবে এখন?'

ছ্যাঁৎ করে উঠল আকরামের বুক। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো, ট্রেন থেকে লাফ দিয়ে পড়তে যাচ্ছে কেয়া। ট্রেন থেকে সম্পূর্ণ বাইরে নিয়ে গেছে শরীর, হাতলের সাথে আটকে আছে শুধু হাতটা। পিছনে ফেলে আসা স্টেশনটাকে দেখার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে সে।

'ছি, ছি! কি ভাববে ফিরোজ! নিশ্চয়ই পরের ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করবে ও! এখন উপায়? ওকে একটা খবর পৌঁছে না দিতে পারলে···'

'আমার কথা শোনো, কেয়া। এদিকে এসো। শান্ত হয়ে বসো দেখি।' আর কোন সন্দেহ নেই আকরামের, কেয়ার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। বেশ কিছু দিন আগে থেকেই লক্ষণগুলো ধরতে পারছিল আকরাম। থেকে থেকে নিষ্ঠুর, কখনও নির্লিপ্ত, মাঝে সাঝে বোবা, প্রায় সময়ই বিড়বিড় করা, তারপর হঠাৎ হঠাৎ নার্ভের অ্যাটাক—এসব দেখে আগেই আশঙ্কা হয়েছিল তার, কেয়া শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে যাবে। সেটাই স্বাভাবিক। পাঞ্জাবীরা ওর ওপর যে অত্যাচার চালিয়েছে! তার ওপর, ফিরোজ ভাই ছিল কেয়ার চোখের মণি, জানের জান। ফিরোজ ভাই মারা যাওয়ার পর থেকেই রগচটা, বদমেজাজী হয়ে ওঠে সে।

'কি বললে? বসব? এখন কি বসার সময়?' তীব্র ঝাঁঝের সাথে বলল কেয়া। 'দেখছ না, ট্রেন থামল না! আমরা লাহোরে চলে যাচ্ছি! এখুনি যদি একটা কিছু করা না হয়, বিপদ হবে। তুমি এমন হাবাগোবা হয়ে গেলে কিভাবে?'

'আমার কিছু করার নেই, কেয়া। এসে দেখো, আমি আহত হয়ে পড়ে আছি। মনে পড়ে না তোমার? গুলি খেয়েছি হাতে?'

এদিক ওদিক দোল খাচ্ছে ট্রেন, দ্রুত এগিয়ে আসতে গিয়ে বার বার টলে উঠল কেয়া। কাছে এসে আকরামের সামনে বসল সে। 'আহত হলে কিভাবে? আমাকে বলোনি কেন? কি ঘটেছিল? কখন?'

কেয়ার মুখ ভাল দেখতে পেল না আকরাম, কিন্তু লক্ষ্য করল চোখ জোড়া জ্বলজ্বল করছে। ঘন ঘন, সশব্দে নিঃশ্বাস ফেলছে সে। 'তুমি ঠিক সুস্থ নও,' বলল

আকরাম। কেয়ার কনুইয়ের কাছটা চেপে ধরল ও। 'মাথা ঠাণ্ডা করো। মনে করার চেষ্টা করো সব। তোমার সাহায্য দরকার আমার, কিন্তু নিজেই যদি অসুস্থ হয়ে পড়ো, তাহলে কি করে কি হবে! এবার মন দিয়ে শোনো কথাগুলো। ফিরোজ ভাই মারা গেছে। তাকে ধরিয়ে দিয়েছে আবিদ। আমরা বাংলাদেশে রয়েছি, ট্রেনে চেপে খুলনায় যাচ্ছি। ওখানে আবিদের একটা দ্বীপ আছে। বোধহয় আবিদও আছে সেখানে। তাকে পাবার জন্যেই যাচ্ছি আমরা। ভেবে দেখে তারপর বলো, এসব মনে পড়ে তোমার?'

আকরামের পাশে অনেক, অনেকক্ষণ হাঁটু গেড়ে বসে থাকল কেয়া। মুঠোর ভেতর তার হাত কাঁপছে, অনুভব করল আকরাম। অবশেষে নিস্তব্ধতা ভাঙল কেয়া। 'হ্যাঁ। মনে পড়ছে। কিন্তু এই খানিক আগে মনে হচ্ছিল ফিরোজ বেঁচে আছে···আমরা ঈমানপুরে যাচ্ছি। না, তা কি করে হয়! ফিরোজ তো কবেই মারা গেছে!'

সে কি তবে কেয়াকে সুস্থ করে তুলল? উত্তেজিত, ব্যাকুল হয়ে উঠল আকরাম। কেয়ার মুখ দেখার ইচ্ছে হলো, কিন্তু ওয়াগনের ভিতর আলো এখনও ভাল করে ঢোকেনি। কিছুটা অন্তত সেন্স ফিরে এসেছে কেয়ার, কিন্তু কতক্ষণের জন্যে? কতটা? কেয়া কি আবার তার দায়িত্ব নিতে পারবে? কারও সাহায্য ছাড়া ট্রেন থেকে নামতে পারবে না সে।

'ঠিক আছে, মাথাটাকে এবার একটু বিশ্রাম দাও,' বলল সে। 'কিছু চিন্তা করার দরকার নেই। এই রকম হতেই পারে, ভয় পাবার কিছুই নেই। ঘুম ভাঙার পর অন্ধকারে কিছু দেখতে না পেয়ে আমারও মনে হয়েছিল, অতীতে ফিরে গেছি। আমরা কোথায় এসেছি, ধারণা করতে পারো কিছু?'

'জানি না।' হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে নিল কেয়া। একটা হাত উঠে গেল কপালে। 'আমার মাথা ব্যথা করছে। আমাকে কিছু জিজ্ঞেস কোরো না।' ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল সে। অস্পষ্টভাবে শুনতে পেল আকরাম, বিড়বিড় করে কি যেন বকছে সে। আবার দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। প্রায় ফরসা হয়ে এসেছে আকাশ। দরজার কবাট ধরে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকল কেয়া।

কোন কাজেই আসবে না! হতাশায় মুষড়ে পড়ে ভাবল আকরাম তাহলে উপায় কি হবে এখন? আবিদকে খুঁজে বের করার পুরো দায়িত্বটা আবার তার ঘাড়ে এসে চাপল। কিন্তু আগের সেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ভাবটা এখন আর নেই। দুর্বল হয়ে পড়ার সাথে সাথে দ্বিধা আর সন্দেহ ঢুকেছে মনে। বল বল নিজের বল। এই অসুস্থতা নিয়ে কি আর প্রতিশোধ নেয়া সম্ভব? ব্রেনটা এখনও কাজ করছে, বড়জোর নেতৃত্ব দিতে পারে সে। কিন্তু উদ্যোগী হয়ে কিছু করার ক্ষমতা তার নেই। অগত্যা পরাজয় স্বীকার করে নেবে বলে ঠিক করল সে। এবং সেই সাথে অনুভব করল, চোখের পলকে আরও যেন দুর্বল হয়ে গেল শরীর। বমি পেল তার। মনে হলো, জ্ঞান হারাবে।

আচ্ছন্ন একটা ভাব অনুভব করল আকরাম। তারপর আর কিছু মনে নেই তার। তীক্ষ্ণ হুইসেল বাজিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে চলল মালগাড়ি।

দশ

পরদিন সকাল আটটা।

জগন্নাথগঞ্জে নেমে যাবার কথা ছিল টিনার, কিন্তু নামেনি সে। মেয়েটার আত্মবিশ্বাস আর জেদ লক্ষ্য করে খুশি হয়নি রানা, বরং বিরক্তি বোধ করেছে। কোন লাভ নেই জেনেও এই রকম বিপদের ঝুঁকি নেবার কি মানে থাকতে পারে? সিরাজগঞ্জ থেকে ফেরীতে ঈশ্বরদী জংশন, অনেক কষ্টে নিজেকে দমিয়ে রেখেছিল রানা, পাশের কমপার্টমেন্টে গিয়ে দেখা করেনি টিনার সাথে। তারপর কুষ্টিয়া, দর্শনা। মনে মনে আশা করল রানা, টিনার শুভ বুদ্ধির উদয় হবে, নেমে যাবে সে। কিন্তু না।

তারপর যশোরে পৌঁছুল ট্রেন। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না রানা। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে এগোল পাশের কমপার্টমেন্টের দিকে। দরজা খুলে ভেতরে তাকাতেই দেখল, সেই আগের জায়গাতেই, সুটকেস আর ব্যাগ-ব্যাগেজের দেয়ালের পিছনে বসে আছে টিনা, মাথা তুলে তাকিয়ে আছে তার দিকে। চোখাচোখি হতেই অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল সে। কথা বললে লোকে দেখবে, ঝুঁকিটা নিল না রানা। ফিরে এল নিজের কমপার্টমেন্টে।

খুলনায় পৌঁছুতে আর বেশি দেরি নেই। ছোট্ট একটা স্টেশনে থামল ট্রেন। চিন্তায় ভারী হয়ে আছে মাথা, বাইরে তাকাবার ধৈর্য হলো না ওর। কে উঠল, কে নামল, কিছুই লক্ষ্য করা হলো না।

এক মিনিট পরই আবার চলতে শুরু করল ট্রেন। চাদর মুড়ি দিয়ে জুবুথুবু হয়ে বসে আছে রানা, চোখ রয়েছে কমপার্টমেন্টের মেঝেতে। খালি মেঝেতে এক জোড়া ভারী বুট এসে থামল। ঝট্ করে মুখ তুলে তাকাল ও।

দশাসই ইন্সপেক্টর ফয়েজ আহমেদ হাসল একগাল। বলল, 'দেখো বাপু, শান্তিপ্রিয় মানুষ আমি, গণ্ডগোল করার চেষ্টা করলে আমি সেটা সহ্য করব না! যেমন বসে আছ তেমনি থাকো। চেয়ে দেখো, দরজায় পাহারা দিচ্ছে আমার সহকারী আলতাফ হোসেন। পালাবে, তার উপায় রাখিনি।'

মুখ শুকিয়ে গেল রানার। চট্ করে দরজার দিকে তাকাল একবার। মিথ্যে নয়, দোরগোড়ায় পাহারা দিচ্ছে সাব-ইন্সপেক্টর আলতাফ। ফয়েজ আহমেদের দিকে ফিরে শান্ত, স্বাভাবিক সুরে বলল ও, 'হ্যালো, ইন্সপেক্টর! এখানে আপনাকে দেখব বলে আশা করিনি। কিভাবে পৌঁছুলেন? আমার মেসেজটা পেয়েছিলেন তো?'

'ট্রেন তো দুনিয়া ঘুরে আসে,' বলল ফয়েজ আহমেদ। হাসিটা দেখে মনে হলো, খুব মজা লাগছে তার। 'বাসে করে আসা অনেক ভাল। হ্যাঁ, তোমার মেসেজ পেয়েছি।'

আড়চোখে সামনের খোলা জানালাটা একবার দেখে নিল রানা। ঝড়ের বেগে

ছুটছে ট্রেন, এই অবস্থায় লাফিয়ে পড়া মানে আত্মহত্যা করা।

'নঈমের ব্যাপারে তোমার কোন দুশ্চিন্তা নেই,' আবার বলল ইন্সপেক্টর। 'তোমার মেসেজ পাবার আগেই তার ব্যাপারটা জানা হয়ে গিয়েছিল আমাদের। তবু, মেসেজটা পাঠিয়ে আমাদেরকে সাহায্য করেছ বলে তোমার ওপর আমরা খুশি। ভাল কথা, তোমাকে সার্চ করতে চায় আলতাফ। আপত্তি করবে না, সে আমি জানি। তোমার কাছে আর্মস আছে, তাই না?'

ফয়েজ আহমেদ চিরকালই এই রকম। রসিয়ে কথা বলা অভ্যেস। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পেয়ে পালিয়েছে, এই রকম কয়েদীও ধরা পড়ে ফয়েজ আহমেদের কথা শুনে হেসে ফেলতে বাধ্য। আর সব পুলিস অফিসারকে যেমন মনে হয়, নিষ্ঠুর, বদমেজাজী, স্বার্থপর, ফয়েজ আহমেদকেও ঠিক তাই মনে হয়। কিন্তু রানা জানে, লোকটার মনটা সাদা, বোধ-বুদ্ধিও আর সব অফিসারের চেয়ে একটু কম। 'হ্যাঁ,' বলল ও। 'আছে। এসো, আলতাফ, প্যান্টের ডান পকেট থেকে বের করে নাও ওটা।'

চোখ দুটো আলতাফের পাথরের মত কঠিন, এগিয়ে এসে রানার পকেট থেকে পয়েন্ট টু-ফাইভ অটোমেটিকটা বের করে নিল সে।

'ওটা তো একটা খেলনা,' সহাস্যে বলল ফয়েজ আহমেদ। 'তোমার কাছে আরও বড় ধরনের, ভারি কিছু আশা করেছিলাম। দুঃখ হয়, এর জন্যে জেল খাটতে হবে তোমাকে। জানি, তোমার কাছে লাইসেন্স নেই।'

'আপনার জানার মধ্যে ভুল আছে,' পাল্টা হেসে বলল রানা। 'আমার ব্যাগটা খুলে ভেতরে তাকান, ভুল ভেঙে যাবে।'

'কি?' চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল ইন্সপেক্টরের। 'তোমার কাছে লাইসেন্স আছে?' সিলিঙের দিকে চোখ তুলে হতাশ একটা মুখভঙ্গি করল সে। 'খোদা, কি হবে এই দেশের! গুণ্ডাপাণ্ডাদের কাছে যদি এসব থাকে, নিরীহ মানুষগুলো বাঁচে কিভাবে!'

'ব্যাগটা বের করে দেখুন, ওটা জালও তো হতে পারে।'

'পরে, পরে। তার আগে দেখি, আর কোনভাবে তোমাকে চোদ্দ শিকের ভেতর ভরা যায় কিনা।'

'এই কেসে? আপনার মাথা খারাপ হয়েছে। আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই আপনি আনতে পারবেন না!'

'ধরা পড়ে সবাই অবশ্য তাই বলে,' গম্ভীর দেখাল ইন্সপেক্টরকে। 'তোমার কাণ্ডকারখানা দেখে আমি তাজ্জব বনে যাচ্ছি, ডিউক। পুলিসের কোন যোগ্যতাই নেই, বোধহয় এই রকম কিছু ভাব তুমি, তাই না?'

কম্পার্টমেন্টে আরও ক'জন পুলিস ঢুকল। প্যাসেঞ্জারদেরকে অনুরোধ করতেই একে একে উঠে দাঁড়াল সবাই, লাইন দিয়ে পাশের কম্পার্টমেন্টে চলে গেল তারা।

'কামরাটা খালি করা সবদিক থেকে ভাল, কি বলো?' রানাকে জিজ্ঞেস করল ফয়েজ আহমেদ। 'বলা যায় না, হঠাৎ তোমার মাথায় কোন কুবুদ্ধি ইন করতে

পারে।

'কাজের কথা কিছু বলার থাকলে তাড়াতাড়ি বলে কেটে পড়ুন,' বলল রানা। 'আমার মাথা ধরেছে, একটু ঘুমাতে চাই।'

'ঘুমাবে?' চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল ইন্সপেক্টরের। 'খুলনা তো সামনেই, নামতে হবে না? তোমার জন্যে ওখানে আমাদের গাড়ি অপেক্ষা করছে! সোজা ঢাকায় যাচ্ছ তুমি। সম্মানটার কথা চিন্তা করে দেখো একবার! পুলিসের গাড়িতে করে খুলনা থেকে ঢাকায়, ক'জনের ভাগ্যে এই রকম সুযোগ আসে?'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'কিন্তু ঢাকায় যাবার কোন ইচ্ছে আপাতত আমার নেই।'

'দুঃখিত, ডিউক,' এক গাল হেসে বলল ইন্সপেক্টর। 'ঢাকার ওঁরা তোমার সাথে কিছু আলাপ করতে চান। অর্ডার করেছেন, ডিউককে নিয়ে এসো। আমরা সেই হুকুম তালিম করছি মাত্র।' পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল সে। 'নাও, ধরাও একটা ক্যান্সার স্টিক।'

সিগারেট নিয়ে ঠোঁটে তুলল রানা। তাতে আগুন ধরিয়ে দিল ফয়েজ আহমেদ। 'তাহলে তো করার কিছু নেই,' বলল রানা।

ভাবল, ওর সাথে একই ট্রেনে টিনাও যে আছে সেটা ফয়েজ আহমেদ জানে কিনা। 'ভাল কথা, আপনারা কি সরাসরি ঢাকা থেকে আসছেন?'

'আরে না! যশোরে এসে অপেক্ষা করছিলাম। স্টেশন মাস্টারের কামরা থেকে তোমার সুদর্শন চেহারাটা দেখতে পায় আমাদের একজন। তাড়াহুড়ো না করে গার্ডস্ ভ্যানে উঠে পড়ি আমরা। তারপর সুযোগ মত এখানে এসেছি। তার আগে, জামালপুরে, আমাদের একজন ইনফরমার তোমাকে খবরের কাগজ কিনতে দেখে। তার মেসেজ পেয়েই যশোরে চলে আসি আমরা।'

অনেক কথা বলল ফয়েজ আহমেদ, কিন্তু টিনার উল্লেখ পর্যন্ত করল না। মনে মনে পরম স্বস্তি বোধ করল রানা। জানতে চাইল, 'টিকুক বা না টিকুক, নিশ্চয়ই আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে যাচ্ছেন?'

'না, তোমার বিরুদ্ধে এখুনি কোন অভিযোগ নেই আমার। কিন্তু তুমি যদি কথা না শোনো, অভিযোগ না এনে কোন উপায় থাকবে না। আমি তোমার সহযোগিতা চাই, পেলে সব ঠিক থাকবে, না পেলে তোমার বারোটা কিভাবে বাজাতে হয়, দেখব আমি। মোটকথা, তুমি গ্রেফতার হবে কি হবে না সেটা নির্ভর করছে তোমারই ওপর।'

'সেক্ষেত্রে অভিযোগটা কি হবে?'

'অভিযোগটা যদি বানোয়াটও হয়,' চেহারায় চ্যালেঞ্জের ভাব ফুটিয়ে বলল ফয়েজ আহমেদ, 'সেটা যাতে টেকে তার ব্যবস্থা আমরা করতে পারব, ডিউক। কাজেই সাবধান। তোমার সহযোগিতা চাই আমরা, পেলে সব ঠিকঠাক মত চলবে।'

'এই অধম আপনাদের জন্যে কি-ই-বা এমন করতে পারে?'

'আকরাম খানকে হাতে চাই আমরা। পুলিস মেরে পার পেয়ে যাবে সে,

আমরা তা হতে দেব না। প্রথম কাজ, আকরামকে আটকানো। তারপর আরেক দফা তোমার সাথে সিরিয়াস আলাপ করতে হতে পারে। হবেই তা বলছি না, হতে পারে।'

'তার মানে, আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার জন্যে যথেষ্ট এভিডেন্স আপনাদের হাতে নেই,' বলল রানা। দেঁতো হাসি দেখা গেল ওর মুখে।

কষে কয়েকটা টান দিল ইন্সপেক্টর সিগারেটে। সিগারেট ভিজিয়ে ফেলা তার একটা বদভ্যাস। দু'একটা টান দিলেই ভিজে যায় সেটা। ধেত্তেরী ছাই বলে সিগারেট ফেলে দিয়ে তাকাল রানার দিকে। বলল, 'এভিডেন্স আছে কি নেই সেটা সময় হলেই দেখতে পাবে। এখন বলো, কেমন লেগেছিল তোমার মেয়েটাকে? বোধহয় ভাল করে ভাব জমাবার সময়ই পাওনি, তাই না?'

'মানে? এর মধ্যে মেয়ে এল কোত্থেকে?'

দুই কমপার্টমেন্টের মাঝখানের দরজায় আরেকজন পুলিস এসে দাঁড়াল, লক্ষ করল রানা।

'দেখো ডিউক, সময় নষ্ট করলে কোন লাভ হবে না,' কঠোর হয়ে উঠল ইন্সপেক্টরের চেহারা। 'যা জিজ্ঞেস করছি সরাসরি উত্তর দাও। আমি শামিমা আখতারের কথা বলছি।'

'শামিমা আখতার? ওই নামের কোন মেয়েকে আমি চিনি না।'

'একটু সরে দাঁড়ান,' মেয়েলি গলা শোনা গেল।

সবাই তাকাল দুই কমপার্টমেন্টের মাঝ দরজার দিকে। পুলিস কনস্টেবল সরে গিয়ে পথ করে দিল, ভেতরে ঢুকল টিনা। তাকে দেখেই হার্টবিট বেড়ে গেল রানার। সর্বনাশ! টিনার কি মাথা খারাপ হয়েছে? এখানে কি করতে এসেছে ও?

দোরগোড়া থেকে মাত্র এক পা এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল টিনা। রানার দিকে নয়, তাকিয়ে আছে ইন্সপেক্টর ফয়েজ আহমেদের দিকে। এই টিনাকে সম্পূর্ণ অচেনা লাগল রানার। মিষ্টি হাসি ঝরছে তার সারা মুখে। বলল, 'মাফ করবেন, আমি কি ভেতরে ঢুকতে পারি?'

'দুঃখিত, ম্যাডাম,' নরম সুরে বলল ইন্সপেক্টর। 'এটা একটা রিজার্ভ কমপার্টমেন্ট। চেষ্টা করে দেখুন, পাশেরটায় সীট পেয়ে যাবেন।'

মুখের হাসি এতটুকু ম্লান হলো না টিনার। বলল, 'সীট তো ছিল, কিন্তু এখান থেকে লোকজন গিয়ে ঘাড়ে চাপতে চাইছে, তাই বেরিয়ে আসতে হলো। আপনি বোধহয় একটু বাড়িয়ে বললেন, তাই না? এটা রিজার্ভ কমপার্টমেন্ট নয় বলেই জানি আমি।'

'হ্যাঁ...' অপ্রতিভ দেখাল ফয়েজ আহমেদকে। 'না, ঠিক রিজার্ভ নয়। তবে, দেখতেই পাচ্ছেন, আমরা পুলিস—এবং জরুরী একটা কাজে ব্যস্ত রয়েছি। আপনাকে পাশের কমপার্টমেন্টেই একটা ব্যবস্থা করে নিতে হবে।'

কথা না বলে মুখে হাসি ধরে রাখল টিনা, তারপর বলল, 'ও! দুঃখিত! হ্যাঁ, তা তো দেখতেই পাচ্ছি, আপনারা পুলিস।' ইন্সপেক্টরকে ছাড়িয়ে রানার ওপর দৃষ্টি ফেলল সে। বোকার মত তার দিকে তাকিয়ে আছে রানা। 'ঠিক আছে, তাহলে

বরং ফিরেই যাই আমি।'

'দুঃখিত, ম্যাডাম,' বলল ইন্সপেক্টর। 'সম্ভব হলে আপনাকে বসতে দিতে আপত্তি করতাম না।'

'কিছু যদি মনে না করেন, আপনাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাই, ইন্সপেক্টর।'

'অবশ্যই!' চেহারা দেখে মনে হলো অবাক হয়েছে ফয়েজ আহমেদ।

'আমার ছোট ভাই বলে কি জানেন? বলে, অযথা ট্রেনের চেইন টানলেও নাকি ফাইন হয় না। কথাটা বলা হয় বটে, কিন্তু আসলে ব্লাফ। কিন্তু আমি বলেছি, উঁহুঁ, ফাইন হয়। কোন্‌টা ঠিক বলুন তো?'

'আপনিই রাইট,' গম্ভীর সুরে বলল ইন্সপেক্টর। 'আর কিছু?'

'না। আপনি আবার কিছু মনে করলেন না তো?'

রানার বুকের ভেতর হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে। টিনা যা বলল, তার একটাই অর্থ হতে পারে। ট্রেন থামাতে যাচ্ছে সে। সেই সুযোগটা কিভাবে কাজে লাগাবে ও, সেটা নির্ভর করছে ওরই ওপর।

'না-না, মনে করার কি আছে।'

'ধন্যবাদ!' বলে ঘুরে দাঁড়াল টিনা, শান্ত ভঙ্গিতে বেরিয়ে গেল কমপার্টমেন্ট থেকে। দরজার পাশে দাঁড়ানো কনস্টেবল হাত বাড়িয়ে বন্ধ করল কবাট।

'মিষ্টি একটা মেয়ে, তাই না?' আপনমনেই বলল ফয়েজ আহমেদ। 'ব্যবহারটাও ভারি মধুর।'

অনেক কষ্টে অট্টহাসিটা চাপল রানা।

এগারো

জোর ঝাঁকি খেলো ট্রেন, সাথে সাথে বুঝল রানা, চেইন টেনে দিয়েছে টিনা। ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল ও। 'কি হলো?'

'যাই হোক, তোমাকে অস্থির হতে হবে না,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল ফয়েজ আহমেদ। রানার দেখাদেখি জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সে। লাইনের পাশে সবুজ ঘাস মোড়া জায়গা, তারপরই শুরু হয়েছে ঢাল। অনেক নিচে দেখা গেল জলাভূমি আর খেত।

'সামনেই বোধহয় একটা ব্রিজ আছে,' বলল ফয়েজ আহমেদ। 'হয়তো মেরামতের কাজ চলছে, তাই ব্রেক করতে হয়েছে ড্রাইভারকে।'

মন্থর হয়ে এল ট্রেনের গতি। এখন যদি খোলা জানালা দিয়ে লাফ দেয়, হাত-পা ভাঙার কোন ভয় নেই, আশা করল রানা, কিন্তু একেবারে গায়ের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে ইন্সপেক্টর, লাফ দিয়ে জানালা গলে বেরিয়ে যেতে পারবে না ও, তার আগেই ওকে ধরে ফেলবে সে।

ব্রিজের ওপর উঠে এল ট্রেন। সেই সাথে পাশের কমপার্টমেন্ট থেকে উত্তেজিত কথাবার্তার গুঞ্জন ঢুকল ওদের কানে। সেদিকে তেমন মনোযোগ নেই ফয়েজ আহমেদের। মুচকি হেসে রানার দিকে তাকাল সে। জানালার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে বলল, 'দেখছ, নদীটা কত নিচে?'

আড়চোখে লক্ষ করল রানা, সহকারী ইন্সপেক্টর আলতাফ গোলমালের কারণ আবিষ্কার করার জন্যে পাশের কমপার্টমেন্টের দিকে পা বাড়াল।

'হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি,' বলল রানা।

'এই মুহূর্তে তোমাকে কিন্তু পাহারা দিচ্ছি না আমি,' মুচকি হাসিটা ফয়েজ আহমেদের ঠোঁটে লেগেই থাকল। 'কারণ জানি, লাফ দিয়ে নদীতে পড়বে, সে সাহস তোমার কোনদিনই হবে না।'

ঠিক সেই মুহূর্তে লাফ দিল রানা। হতভম্ব, স্তম্ভিত ইন্সপেক্টর ইচ্ছে করলেই হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলতে পারত রানাকে। কিন্তু সে কথা তার মনেই পড়ল না। জানালা গলে রানার শরীর বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে মুখটা ঝুলে পড়ল তার। শুধু গলার ভেতর থেকে দুর্বোধ্য একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল। হঠাৎ পাঁজরে গুঁতো খেলে এই রকম বিদঘুটে আওয়াজ বেরুতে পারে।

পাশের কমপার্টমেন্টে যাবার জন্যে এগোচ্ছে আলতাফ, ঘাড় ফিরিয়ে অবিশ্বাস্য দৃশ্যটা সে-ও দেখতে পেল। ছুটে ফয়েজ আহমেদের পাশে চলে এল সে। দু'জন জানালা দিয়ে মাথা বের করে সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল নিচের দিকে। অস্বাভাবিক বেশি সময় নিচ্ছে যেন রানা, ব্রিজ থেকে নদী—মাঝামাঝি দূরত্ব এখনও পেরোয়নি সে।

দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রেন। সেই সাথে পাশের কমপার্টমেন্ট থেকে কয়েকজন লোক একসাথে চিৎকার জুড়ে দিল, 'ধরুন! থামান! নেমে গেল!'

কিন্তু দরজা খুলে ততক্ষণে ট্রেন থেকে লাফিয়ে নিচে, ঘাসের ওপর পড়েছে টিনা। পড়েই স্প্রিঙের মত ঝট্ করে সিধে হয়ে গেল। ছুটল ব্রিজের দিকে।

ইতিমধ্যে ট্রেন থেকে নেমে এসেছে ইন্সপেক্টর আর তার সহকারীরা। ব্রিজে দাঁড়িয়ে আছে তারা, রেলিঙের ওপর ঝুঁকে তাকিয়ে আছে নদীর দিকে। এইমাত্র পানির নিচে অদৃশ্য হয়ে গেছে রানা, কোথায় মাথা তোলে দেখার জন্যে উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছে সবাই।

এতই মশগুল হয়ে অপেক্ষা করছে ওরা, শোরগোলটা কানেই ঢুকল না। ট্রেনের জানালা দিয়ে মাথা বের করে দিয়ে কয়েক ডজন লোক টিনার ছুটে পালিয়ে যাওয়া চাক্ষুষ করছে, সবাই মিলে হৈ-চৈ করছে বলে কারও কথা পরিষ্কার ধরা যাচ্ছে না।

ব্রিজে উঠে এল টিনা। দাঁড়াল ফয়েজ আহমেদের কাছ থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরে। রেলিঙের ওপর উঠছে সে, এই সময় খেয়াল হলো ইন্সপেক্টরের। প্রথমে হকচকিয়ে গেল, তারপরই ঝাঁপিয়ে পড়ে ধরার চেষ্টা করল টিনাকে। কিন্তু ততক্ষণে রেলিঙের ওপর উঠে লাফ দিয়ে বসেছে টিনা।

পানির ওপর মাথা তুলেই ওপর দিকে তাকাল রানা। দেখল, ব্রিজের

রেলিঙের ওপর দাঁড়িয়ে আছে টিনা। পরমুহূর্তে লাফ দিল সে, বুলেটের মত নেমে আসতে শুরু করল ওর দিকে। বিস্ফারিত চোখে দেখল, পানিতে মাথা দিয়ে নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল টিনা, ডাইভটা এমন নিখুঁত হলো যে পানি খুব সামান্যই ছলকাল।

একটু পরই পানির ওপর মাথা তুলল টিনা। দ্রুত তার দিকে সাঁতরে এল রানা। 'বোকা মেয়ে! ঘাড়টা যদি ভেঙে যেত?'

'তোমারটাও তো ভাঙতে পারত?' মাথা ঝাড়া দিয়ে কান থেকে পানি বের করার চেষ্টা করল টিনা। রানা তাকে বোকা মেয়ে বলায় ওকে সে তুমি বলে সম্বোধন করার অধিকার পেয়ে গেছে। 'আমাকে দোষ দিতে পারো না, আমি তোমাকে অনুকরণ করেছি মাত্র।'

'কোথাও লাগেনি তো?' উদ্বেগের সাথে জানতে চাইল রানা।

'আরে না!' বলে রানার দিকে পানি ছুঁড়ে দিল টিনা। 'এসব যে একেবারেই অভ্যেস নেই, তা নয়। নিরিবিলিতে থাকার সময় গাছের মগডাল থেকে প্রায়ই ঝাঁপ দিতে হত। তা না হলে আবিদ আমাকে খেলতে নিত না। সে যাক। তোমাকে কিন্তু মানতেই হবে, ট্রেন থামাবার জন্যে সময়টা একেবারে মোক্ষম বেছে নিয়েছিলাম। ভেবে দেখো, তোমার সাথে না এসে উপায় ছিল আমার? ইন্সপেক্টর সাহেব ঠিকই জানতে পারতেন, আমিই চেইন টেনেছি। কে চায় গ্রেফতার হতে?'

'এমন দস্যি মেয়ে বাপের কালেও দেখিনি,' বলল রানা। 'একের পর এক শুধু চমক দেখাচ্ছ। কিন্তু চেইন তুমি টানতে গেলে কেন? আমার সাথে থাকতে নিষেধ করিনি তোমাকে? এই যে জড়িয়ে পড়লে, এর পরিণতি কি হতে পারে জানো?'

হেসে উঠল টিনা। 'না, জানি না। তবে ওপরে থাকলে কি হত আন্দাজ করতে পারি।'

দু'জনেই মুখ তুলে ব্রিজের দিকে তাকাল। ট্রেনের প্রায় সব প্যাসেঞ্জারই নেমে পড়েছে, ব্রিজে দাঁড়িয়ে দেখছে ওদেরকে। ভিড়ের মধ্যেও ইন্সপেক্টর ফয়েজ আহমেদকে চিনতে অসুবিধে হলো না রানার। মাথার ওপর একটা হাত তুলে নাড়ল ও।

জবাবে কব্জির ওপর কব্জি রেখে একটা ভঙ্গি করল ফয়েজ আহমেদ, যার অর্থ: দাঁড়াও, তোমাকে হাতকড়া পরাচ্ছি আমি।

'বেচারা!' মুচকি হেসে বলল রানা। 'সন্দেহ নেই, চুটিয়ে অভিশাপ দিচ্ছে আমাকে। এসো, খানিকটা সাঁতরে ভাটির দিকে যাই আমরা, তারপর তীরে ওঠা যাবে। ব্রিজ থেকে ডাইভ না দিয়ে নদীতে নামার কোন উপায় আছে বলে মনে হয় না, তবু এখানে শুধু শুধু সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না।'

দু'জন পাশাপাশি সাঁতরাতে শুরু করল ওরা। বেশ ভাল স্রোত রয়েছে, অল্প সময়ে অনেকটা দূরত্ব পেরিয়ে এল। একসময় ট্রেনের হুইসেল ঢুকল কানে। দু'জনেই তাকাল পিছন দিকে। ব্রিজের ওপর খেলনার মত দেখাল ট্রেনটাকে। আবার চলতে শুরু করেছে।

'ইন্সপেক্টর কি করবেন এখন?'

'আমিও সে-কথা ভাবছি,' বলল রানা। 'হাল ছাড়ার বান্দা নয় লোকটা। খুলনায় পৌঁছে ফাঁদ পাতবে সে। কাজেই শহরের দিকে এখুনি যাওয়া উচিত হবে না আমাদের।'

'সরাসরি লঞ্চ ঘাটে পৌঁছুতে পারি আমরা,' বলল টিনা। 'পাড়ে উঠে খানিক বিশ্রাম নিই চলো, তারপর একটা নৌকা নিয়ে...'

'সেই ভাল। চালনা, তারপর মংলা হয়ে পশুর নদীর তীরে নামতে হবে, তাই না?'

'হ্যাঁ,' বলল টিনা। 'তিন চার ঘণ্টার পথ, তারপর পায়ে হেঁটে যেতে হবে খানিকটা।'

'তোমাদের বোট থাকবে তো?'

'অবশ্যই!'

'ক্লান্তি লাগছে?' জানতে চাইল রানা।

'একটু। কাপড়গুলো অসুবিধে করছে। আর কতক্ষণ পর পাড়ে উঠতে চাও?'

নদীর দু'পাশে গভীর বনভূমি, অনেকক্ষণ ধরে দেখে নিয়ে বলল রানা, 'এখন ওঠা যেতে পারে। বাঁ দিকে।'

গা ছেড়ে দিল ওরা, স্রোতের টানে এগিয়ে চলল পাড়ের দিকে। পাড়টা বেশ উঁচু আর খাড়া, প্রথমে নিজে উঠল রানা, তারপর হাত ধরে টেনে তুলল টিনাকে। সবুজ ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল টিনা, বুকটা ঘন ঘন ওঠা-নামা করছে। ভিজে কাপড় সেঁটে আছে শরীরের সাথে। সে দিকে তাকিয়ে ধক করে উঠল রানার বুকের ভেতরটা, চোখ বুজে আছে টিনা, ব্যাপারটা টের পেল না। প্রথম দর্শনে ঘরোয়া, সাধারণ মেয়ে বলে মনে হয়েছিল টিনাকে, তারপর তার হাসিতে অদ্ভুত একটা বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করেছিল। এই মুহূর্তে মুগ্ধ হয়ে আরেকটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করল ও। স্বাস্থ্য খুব ভাল নয় টিনার, রোগা-পাতলাই বলা যায়, কিন্তু ভিজে কাপড় লেপটে থাকায় আশ্চর্য এক ফিগার মাথাচাড়া দিয়ে উঁঠেছে! চেষ্টা করেও চোখ ফেরাতে পারছে না। একটা ঢোক গিলল রানা। মুখ থেকে সরে আবার চোখ পড়ল বুকে আবার একটা ঢোক গিলল রানা। দৃষ্টি নেমে এল বুক থেকে। পাঁজরের হাড় গোণা যায় না, কিন্তু শক্ত আভাস পাওয়া যায়। নাভিটা খুদে, তারপর চিকণ কোমর। তলপেটের দু'পাশে হাড় দুটো উঁচু হয়ে আছে। চিৎ হয়ে শুয়ে আছে টিনা, তবু টের পাওয়া যায় শরীরের তুলনায় নিতম্ব বেশ চওড়া। উরু দুটো মাংসল এবং শক্ত, পা দুটো অনেক লম্বা। হাত বাড়াল রানা। টিনার কপাল স্পর্শ করল ও। সাথে সাথে চোখ মেলল টিনা। কিন্তু তার চেহারায় ভয় বা রাগ কিছুই ফুটল না।

টিনার কপাল থেকে ভিজে ক'গাছি চুল সরিয়ে দিয়ে জোর করে, অপ্রতিভ একটু হাসল রানা। 'খুব হাঁপিয়ে গেছ বুঝি?'

'তোমার হাত এত গরম কেন?' জানতে চাইল টিনা। নিজের হাত দুটো বুকের ওপর ভাঁজ করে রাখল সে।

ইতিমধ্যে নিজেকে সামলে নিয়েছে রানা। 'গরম বুঝি? হয়তো রক্ত চলাচল বেড়ে গেছে হঠাৎ করে, তাই।'

'রক্ত চলাচল বেড়ে গেছে মানে?' উঠে বসল টিনা। চুল নিঙড়ে পানি ঝরাতে শুরু করল। ইঙ্গিতটা বুঝল কি বুঝল না, ধরতে পারল না রানা।

আরও স্পষ্ট করে বলল, 'আশপাশে জনমনিষ্যি নেই। আমরা কেউ বুড়োও নই। তার ওপর, ভিজে কাপড় পরে রয়েছ তুমি। তাও আবার শুয়ে আছ। রক্তের কোন দোষ দিতে পারো?'

টিনার চেহারায় কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা গেল না। এদিক ওদিক তাকাল সে, তারপর মুখ তুলল আকাশের দিকে। 'কাপড়গুলো কিভাবে শুকাই বলো তো? ছায়ায় না বসে, চলো, রোদে গিয়ে বসি।'

প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেলো রানা। সাবধান হয়ে গেল ও। সেক্স প্রসঙ্গে কথা পর্যন্ত বলতে রাজি নয় টিনা। ওকে অপমানও করেনি, উৎসাহও দেখায়নি। ইচ্ছে করলে রাগ করতে পারত, কিংবা ব্যঙ্গ করে কিছু বলতে পারত। সে-সব কিছু না করে স্রেফ অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। ব্যক্তিত্ব বোধহয় একেই বলে।

'তার দরকার হবে না,' বলল রানা। 'নৌকোর জন্যে কিছুটা তো হাঁটতেই হবে, তাই না? তাতেই শুকিয়ে যাবে সব।'

'কিন্তু কাপড়গুলো গায়ে শুকালে সর্দি লাগবে যে!' তাড়াতাড়ি বলল টিনা। 'যদি নিঙড়ে নিতে পারতাম।'

আর কোন মেয়ে হলে ঠাট্টা করে বলত রানা, খুলে ফেলো সব, আমি কিছু মনে করব না। কিন্তু টিনাকে বলল, 'ইচ্ছে করলেই পারো।' আঙুল দিয়ে একটা ঘন উঁচু ঝোপ দেখাল তাকে। 'ওখানে চলে যাও। কিন্তু বেশি দেরি কোরো না।'

উঠে দাঁড়াল টিনা। 'কেন, এত ব্যস্ততা কিসের?'

'বললাম না, হাল ছেড়ে দেবার বান্দা নয় ফয়েজ আহমেদ। নদী পথে নজর রাখবে সে। তার আগে লঞ্চ ঘাটে পৌঁছুতে চাই আমি।'

'তা যদি পৌঁছাইও, পেছন থেকে লোকটাকে খসানো যাবে কি?' উদ্বেগের সাথে জানতে চাইল টিনা। 'খোঁজ খবর করলেই জানতে পারবে কোন্ লঞ্চে কোন্ দিকে গেছি আমরা।'

'ধরা পড়ার ঝুঁকিটা সব সময়ই রয়েছে।' স্বীকার করল রানা। 'তার আগেই সমস্ত কাজ সেরে ফেলতে হবে আমাকে।'

সমস্ত কাজ বলতে কি বোঝাতে চাইল রানা, তা আর জিজ্ঞেস করল না টিনা। ধীর পায়ে, মাথা নিচু করে ঝোপের আড়ালে চলে গেল সে।

এই ফাঁকে নিজের কোট আর ট্রাউজার নিঙড়ে নিল রানা। 'টিনা,' কোমরে বেল্ট বাঁধতে বাঁধতে ডাকল ও। 'ট্রেনটা তুমি থামালে কেন বলো তো? ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিল আমাদের, তাই না? ট্রেন থেকে নেমে ঢাকায় ফিরে যাবার কথা ছিল তোমার। গেলে না কেন? তারপর, পুলিসের সাথে শত্রুতা করে আমাকেই বা পালাবার সুযোগ করে দিতে গেলে কেন?'

ঝোপের আড়াল থেকে মুখ বের করে রানার দিকে তাকাল টিনা। 'পুলিসের মাঝখানে ভীষণ বিষণ্ণ আর ম্লান দেখাচ্ছিল তোমাকে। আমার সহ্য হলো না।'

'ঠাট্টা নয়,' একটু মেজাজ দেখাল রানা। 'তুমি যতদূর জানো, আমি একজন

খুনী। জানো, আমি তোমার ভাইয়ের পেছনে লেগে আছি। আমি গ্রেফতার হলেই খুশি হবার কথা তোমার। অথচ···ব্যাপারটা কি?'

'স্টুডিওতে ওরা তিনজন আমার সাথে যখন খারাপ ব্যবহার করছিল, তুমি তখন ওদের হাত থেকে বাঁচিয়েছ আমাকে। তোমার তখনকার ব্যবহার ভুলে যাব, ততটা অকৃতজ্ঞ হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আসলে তোমার কাছে আমি ঋণী, সেটা কোন মতেই ভুলতে পারছিলাম না। তাছাড়া, আমার অন্তর পরিষ্কার জানে, শামিমার মৃত্যুর সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই। প্রথমে আমি একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু পরে তুমি চলে গেলে ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভাবনা-চিন্তা করি আমি। বুঝতে পারি, আর যাই হও, তুমি অসহায় কোন মেয়েমানুষকে খুন করতে পারো না। সম্পূর্ণ আলাদা, অন্য টাইপের মানুষ তুমি। তোমাকে গুণ্ডা বলে মানি না আমি।'

'বোকা! তুমি একটা বোকা মেয়ে!' অস্বস্তি এবং আড়ষ্ট বোধ করল রানা। 'আমার সাথে এভাবে জড়িয়ে না পড়ে নিজের চরকায় তেল দেয়া উচিত ছিল তোমার।'

'বুঝলাম, ধন্যবাদ জানাবার এটাই তোমার নিজস্ব ভঙ্গি,' বলেই খিলখিল করে হেসে উঠল টিনা।

বিকেল চারটের দিকে টের পেল রানা, পিছনে ফেউ লেগেছে। ওদের লঞ্চটা ছোট, কিন্তু দ্রুতগতি। দুপুর একটা থেকে যে লঞ্চটা পিছু নিয়েছে সেটা শুধু আকারেই বড়, স্পীড তেমন সুবিধের নয়। চেষ্টার কোন ত্রুটি করছে না সুকানি, কিন্তু মাঝখানের দূরত্ব কমাতে পারছে না সে, আগে যেমন মাইল দুয়েক সামনে ছিল ছোট লঞ্চ, বরাবর তাই থাকল। সুকানির ওপর কি রকম চোটপাট দেখাচ্ছে ইন্সপেক্টর ফয়েজ আহমেদ কল্পনা করতে গিয়ে আপনমনে হাসতে লাগল রানা।

কিভাবে পিছু নিতে পারল, অনুমান করতে অসুবিধে হলো না। কোথাও কোন ভুল করেছে ও, ব্যাপারটা তা নয়। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে নৌকা-ঘাটে যাচ্ছিল ওরা, পথে পড়ল একটা হাট। ঘুর পথে হাট এড়াতে হলে মূল্যবান একটি ঘণ্টা অপচয় হবে ভেবে হাটের ভেতর দিয়েই এল এরা। অনেকেই লক্ষ্য করল ওদেরকে, তার মানে ইন্সপেক্টরের জন্যে একটা সূত্র রেখে যাওয়া হলো। হাটের লোকজন যারা ওদেরকে দেখল, পুলিস প্রশ্ন করলে ওদের অবস্থা এবং চেহারার বর্ণনা দিতে তাদের কোন অসুবিধে হবার কথা নয়। শহুরে একটা মেয়ে, তার সাথে শার্ট-প্যান্ট পরা একটা লোক, হাতে ভিজে কোট, মাথার চুল এলোমেলো, দেখেই বোঝা যায় রোদে শুকিয়েছে, অত্যন্ত ব্যস্ততার সাথে ভিড় ঠেলে এগোচ্ছিল। এর বেশি কিছু জানতে হবে না ফয়েজ আহমেদের, যা বোঝার বুঝে নেবে সে।

হাট থেকে একটা চামড়ার ব্যাগ, চিরুনি, টুকটাক আরও কিছু জিনিস কিনেছিল ওরা। হাতের কোট ব্যাগে ভরে নৌকা-ঘাটে পৌঁছুল। এক ঘণ্টা লাগে লঞ্চ-ঘাটে পৌঁছুতে। ঘাটে পৌঁছেই টের পায় ওরা, অপেক্ষারত আরোহীদের মধ্যে ওদেরকে, সাংঘাতিক বেমানান লাগছে। সুন্দরবন হয়ে বঙ্গোপসাগরের মোহনা

পর্যন্ত যাবে লঞ্চ, প্রায় সব যাত্রীই হয় জেলে, নয়তো কাঠুরিয়া, কিংবা মৌয়াল, কারও পরনে ফতুয়া, কেউ শুধু গেঞ্জি পরে আছে, বেশির ভাগই উদোম গা। ঘাট থেকে লঞ্চে ওঠার সময় অনেক লোকই লক্ষ করল ওদেরকে, ওদেরকে ঘিরে রীতিমত একটা ভিড় জমে উঠল। তারমানে, ওখানেও একটা সূত্র রেখে এসেছে ওরা।

ইন্সপেক্টর যে পিছু নিয়েছে, কথাটা টিনাকে জানাল না রানা। কিন্তু, সম্ভবত ওর চেহারা দেখে কিছু একটা সন্দেহ করে থাকবে টিনা। বেশ কিছুক্ষণ থেকে মাঝেমধ্যে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাচ্ছে ওর দিকে। ছোট্ট একটা কেবিন পাওয়া গেছে বটে, কিন্তু সেটার আবার দরজা নেই। বাইরে বেরিয়ে খোলা ডেকে দাঁড়াতে চেয়েছিল টিনা, কিন্তু ঠাণ্ডা লাগবে বলে ভয় দেখাল রানা। তাতে বোধহয় টিনার সন্দেহ আরও বাড়ল।

'তোমার কি হয়েছে বলো তো?' সাড়ে চারটের দিকে জানতে চাইল টিনা। 'অমন গুম মেরে আছ কেন?'

'কই, না!' তাড়াতাড়ি বলল রানা।

'অস্বীকার কোরো না,' বলল টিনা। খানিকক্ষণ চুপ করে থাকল দু'জনেই। তারপর আবার বলল টিনা, 'ওতে যে ইন্সপেক্টর ফয়েজ আহমেদ আছেনই, তা তুমি জানলে কিভাবে?'

'মানে? ওতে মানে?'

'লক্ষ করছি, উঁকি দিয়ে বার বার পেছনের লঞ্চটার দিকে তাকাচ্ছ,' বলল টিনা। 'বুঝলাম, তোমার সন্দেহ হয়েছে। কিন্তু ইন্সপেক্টর ওতে আছেনই, জানলে কিভাবে?'

'কোন প্যাসেঞ্জার দেখতে পাইনি,' বলল রানা, 'তার মানে রিজার্ভ করে নিয়েছে ফয়েজ আহমেদ।' ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বলল ও, 'তোমার জন্যেই আসলে চিন্তা। আমার কাছ থেকে দূরে সরে থাকা উচিত ছিল তোমার, টিনা।'

'দেখো, অবলা ভেব না আমাকে। নিজেকে আমি রক্ষা করতে জানি।'

'তোমার তাই মনে হচ্ছে বটে, কিন্তু পুলিস যদি শামিমার খুনের দায় শেষ পর্যন্ত আমার ঘাড়ে চাপাতে পারে, তুমিও ফেঁসে যাবে। পুলিসের সাথে বেয়াদবি করেছ, খুনের আসামীকে পালাতে সাহায্য করেছ। শাস্তি একেবারে অল্প হবে তা ভেব না।'

'আগে বিপদটা আসুক তো, তখন কিভাবে কি করলে উদ্ধার পাওয়া যায় ভাবনা-চিন্তা করে দেখা যাবে,' বলল টিনা। 'মরার আগে মরতে ঘোর আপত্তি আছে আমার। আমি কিন্তু কোন দুশ্চিন্তা করছি না।'

আরও কিছুক্ষণ কথা হলো না। তারপর মৃদু কণ্ঠে বলল রানা, 'জানো, তোমাকে কিন্তু বেশ ভাল লাগতে শুরু করেছে আমার।'

'তাই নাকি?' বাইরে থেকে দ্রুত চোখ ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল টিনা। 'কিন্তু মনে হচ্ছে সেটা তোমার জন্যে আনন্দের না হয়ে বরং দুঃখের কারণ হয়ে

দাঁড়িয়েছে।'

'হ্যাঁ, তাই। কারণ জানি, আমার আর তোমার টাইপ এক নয়। সম্পূর্ণ আলাদা জগতের মানুষ আমরা। যতক্ষণ আমার সাথে আছ তুমি, বুঝে শুনে পা ফেলতে হবে আমাকে।'

কিছু বলল না টিনা, কিন্তু একটু অবাক হয়ে, খানিকটা ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকল রানার দিকে।

তারপর আবার বলল রানা, 'ডিউকের জীবনে ভাল মন্দ অনেক মেয়ে এসেছে, কিন্তু তারা কেউ আমাকে ইন্টারেস্টেড করে তুলতে পারেনি। তুমি পারছ, সেখানেই আমার ভয়, টিনা।'

এবারও কিছু না বলে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল টিনা।

তারপর রানাই আবার কথা বলল, 'তোমার ব্যাপারটা কি জানতে পারি? কাউকে কথা দিয়ে রেখেছ, মানে, এনগেজড?'

'হ্যাঁ, ধরে নিতে পারো,' বলে হাসল টিনা। 'নেভিতে আছে ও। ছ'মাসে একবার দেখা হয়।'

'তাহলে ঠিক আছে,' পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল রানা।

'সিরিয়াস কিছু, তা নয়। পরস্পরকে ভাল লাগে আমাদের, এই পর্যন্ত।' টিনার বলার ভঙ্গিতে অজুহাতের সুর বাজল।

'ব্যাপারটাকে এখন থেকে বরং সিরিয়াসলি নাও,' বলল রানা। 'অনেক উটকো ঝামেলা থেকে রেহাই পাবে।'

'মানে? হেঁয়ালি করছ কেন? পরিষ্কার করে বলো।'

'অস্বীকার করতে পারবে, যে তোমারও ভাল লাগতে শুরু করেছে আমাকে? এই ভাল লাগালাগি শেষ পর্যন্ত সাংঘাতিক জটিলতার সৃষ্টি করে। আমার জন্যে ব্যাপারটা এরই মধ্যে গোলমেলে হয়ে উঠেছে। তোমার জন্যেও এটা একটা সমস্যা হয়ে দেখা দেবে।'

'গোলমেলে?'

'হ্যাঁ। যাকে ভাল লাগে তার ক্ষতি করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'আমার ক্ষতি করার দরকার হবে তোমার, তাই বা ভাবছ কেন?' অবাক হয়ে জানতে চাইল টিনা।

'তোমার ভাইয়ের পেছনে লেগে আছি আমি, তাই না?' অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল রানা। 'তাকে আমি পুলিসের হাতে তুলে দিতে চাই। কিন্তু এখন আমার মনে দ্বিধা এসে গেছে।'

'আবিদকে পুলিসের হাতে তুলে দেবার কোন দরকার হবে না,' শান্ত স্বরে বলল টিনা। 'তুমি শুধু শুধু দুশ্চিন্তা করছ।'

'মানে?'

'কতবারই তো বললাম। আবিদ শামিমাকে বা আর কাউকে খুন করেনি। ফিরোজ চৌধুরীর সাথে বেঈমানীও করতে পারে না সে। তাকে আমি চিনি। অনেকটা তোমারই মত সে। এ-ধরনের কাজ তার দ্বারা হবার নয়।'

'কিন্তু শোনো,' বলল রানা। 'কেউ না কেউ ফিরোজ চৌধুরীর সাথে বেঈমানী করেছে। কেউ না কেউ জাফর আর মনসুরকে খুন করেছে। তোমার ভাই যদি নাই হয়, তাহলে কে সে?'

'কে তা আমি জানি না, বা জানার ভানও করতে চাই না। কিন্তু আমি জানি, আবিদ করেনি।'

'এই উত্তর আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারছে না। দুঃখিত, কিন্তু এই ব্যাখ্যা টিকবে না।'

'আবিদ বেঁচে আছে, এ-কথাও আমি বিশ্বাস করি না। বিশ্বাস করতে চাই, কিন্তু সম্ভব নয়। তুমি যখন প্রথম কথাটা শোনালে, প্রায় বিশ্বাস করে ফেলেছিলাম। কিন্তু পরে ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছি আমি। বেঁচে থাকলে আমার সাথে যোগাযোগ রাখত আবিদ। আবিদ শুধু আমার ভাই ছিল না, সে আমার বন্ধু ছিল, ছিল একমাত্র আপনজন। বিশ্বাস করবে, খবর পাবার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে জানতে পারি আমি? গভীর এক রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় আমার, অন্তরের অন্তঃস্তল থেকে বুঝতে পারি, আবিদ মারা গেছে। এর প্রায় একমাস পরে আমেরিকা থেকে খবর আসে। কিন্তু সেটা আমার জন্যে কোন আঘাত হয়ে দেখা দেয়নি। আমি তো জানতামই।'

টিনার হাতে মৃদু চাপড় দিল রানা। 'এসব কথা থাক। বরং তোমার সেই নাবিকের কথা শোনা যাক। কেমন দেখতে সে? গোঁফ রাখে?'

অসহায়ভাবে কাঁধ ঝাঁকাল টিনা।

বারো

বোটটা আঠারো ফুট লম্বা। দশ ঘোড়ার এঞ্জিন। কংক্রিট আর কাঠ দিয়ে তৈরি একটা শেডের নিচে নোঙর করা রয়েছে। বেশ পুরানো, কিন্তু খুব কম ব্যবহার করা হয়েছে বলে দেখতে এখনও একেবারে ঝকঝকে নতুনের মত লাগে। জেটির ওপর দিয়ে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে ছোট্ট একটা লাফ দিল টিনা, ডেকে নামল। সেখান থেকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল এঞ্জিন রুমে। এঞ্জিনটা পরীক্ষা করে ডেকে ফিরে এল একটু পরই, রেলিঙে ভর দিয়ে তাকাল রানার দিকে, হাতছানি দিয়ে ডাকল ওকে। 'চলে এসো, সব ঠিক আছে।'

কিন্তু রানার ঠিক উল্টোটা মনে হলো। অশুভ কোন লক্ষণ নেই, তবু কেন যেন খুঁত খুঁত করছে মন। বারবার সন্দেহ জাগছে, আড়াল থেকে কেউ নজর রাখছে ওদের ওপর। অথচ এই রকম মনে হবার সঙ্গত কোন কারণ খুঁজে পেল না রানা। সন্ধে নামছে, ভুরু কুঁচকে বনভূমির চারদিকে আরেকবার তাকাল ও।

বঙ্গোপসাগর মাইল পঁচিশ ত্রিশ দূরে থাকতে, পশুর নদীর তীরে, সুন্দরবনে ওদেরকে নামিয়ে দেয় লঞ্চ। পিছনের লঞ্চ তখনও আগের সেই দূরত্ব বজায়

রেখেছে—দু'মাইল। কিন্তু ওদের লঞ্চ যখন তীরে ভিড়ল, বাঁকের আড়ালে রয়েছে সেটা।

লঞ্চ থেকে নেমেই রানার হাত ধরে ছুটতে শুরু করেছে টিনা। পায়ে হাঁটা সরু পথ ধরে সিকি মাইলটাক এগিয়ে আবার নদীর ধারে চলে এসেছে ওরা। এটাও পশুর নদী, তবে শাখা। ধনুকের মত বেঁকে গিয়ে, ছোট বড় বেশ কয়েকটা দ্বীপকে পাশ কাটিয়ে এগিয়েছে শাখাটা।

খুঁত খুঁতে ভাবটা মন থেকে তাড়াবার চেষ্টা করল রানা। জেটির ওপর দিয়ে এগোল ও। জানতে চাইল, 'কতক্ষণ লাগবে পৌঁছুতে?'

'মিনিট বিশেক,' বলল টিনা। 'ওখানে আমাদের কোন অসুবিধে হবে না। বাড়িতে প্রচুর টিনের খাবার আছে। অন্তত হপ্তাখানেক তো চলবেই।'

ডেকে উঠে এল রানা। 'অতদিন থাকতে হবে বলে মনে হয় না।' মেইন কেবিনের দিকে পিছন ফিরে নদীর পাড়, তারপর জঙ্গলের দিকে আরেকবার তাকাল ও। 'ঠিক আছে, এঞ্জিন স্টার্ট দাওগে যাও।'

রানার অস্বস্তি টের পেয়ে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল টিনার দৃষ্টি। 'কি ব্যাপার, ডিউক?'

'কিছু না। বোধহয় নার্ভের বেয়াদবি। বার বার মনে হচ্ছে, কেউ লক্ষ করছে আমাদেরকে।'

'দূর!' কথাটা হেসেই উড়িয়ে দিল টিনা। 'পুলিসকে আমরা খসিয়ে দিয়েছি। আন্দাজ করে এদিকে যদি আসেও, অনেক সময় লেগে যাবে। পুলিস নয়। আর কে হতে পারে?'

'না,' খানিক ইতস্তত করে বলল রানা। 'আর কেউ হতে পারে না।'

ঘটাং করে আওয়াজ হলো পিছনে, খুলে গেল মেইন কেবিনের দরজা। ঝট্ করে পিছন ফিরল ওরা, তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরিয়ে এল টিনার গলা থেকে। মেইন কেবিনের ভেতর কে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে, একটা ছায়ামূর্তি। একটা হাত তুলে দরজার পাশের সুইচ অন করে আলো জ্বালল সে। ডেকের ওপর তার ছায়া পড়ল।

সতর্ক পায়ে এগোল রানা। 'কে?'

আলোর নিচ থেকে বেরিয়ে, ডেকে এসে দাঁড়াল কেয়া। কোমরের পাশে রয়েছে হাতে ধরা মাউজার, ওদের দিকে তাক করা। কালো সালোয়ার আর কালো কামিজ পরে আছে সে। নঈমের ফ্ল্যাটে প্রথম যেদিন ওকে দেখেছিল রানা, সেদিনও এই পোশাক পরেছিল ও। আজও ওকে মূর্তিমান শোক বলে মনে হলো। ছোটখাট গড়ন, কিন্তু ভারি সুন্দর। উজ্জ্বল শ্যামলা মুখ থমথম করছে, চোখ দুটো জ্বলজ্বলে। 'আমিও যাচ্ছি তোমাদের সাথে,' এক নিঃশ্বাসে বলল সে।

স্বস্তির ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল রানা। সঙ্গত কোন কারণ ছাড়াই সন্দেহ হয়েছিল ওর, কেবিন থেকে হয়তো ফয়েজ আহমেদ বেরিয়ে আসবে। 'অসময়ে হাজির হবার বিদঘুটে একটা প্রবণতা আছে তোমার!' বলে মুচকে হাসল রানা। 'এখানে তুমি এলে কিভাবে?'

'এখানেই তো আবার দেখা হবার কথা ছিল,' ঠাণ্ডা সুরে বলল কেয়া। 'এত সহজে আমাকে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে, নিশ্চয়ই সেটা আশা করোনি

তুমি?'

'তোমার কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম,' মাউজারের দিকে কড়া নজর রেখে বলল রানা। 'আকরাম বুঝি কেবিনের ভেতর থেকে কাভার দিচ্ছে তোমাকে?'

হেসে উঠল কেয়া। ঠিক হাসি নয়, কর্কশ, বেসুরো একটা শব্দ বেরিয়ে এল গলার ভেতর থেকে। গা ছমছম করে উঠল রানার। এতক্ষণে খেয়াল হলো ওর, শুধু ক্লান্ত নয়, রীতিমত অসুস্থ দেখাচ্ছে কেয়াকে। ঠোঁট জোড়া ফ্যাকাসে, যেন রক্ত নেই। চোখের নিচে কালি। এলোমেলো হয়ে আছে মাথার চুল।

'আকরাম? বেচারা!'

'মানে?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইল রানা।

রানার পাশে চলে এসে ওর একটা কব্জি চেপে ধরল টিনা।

'আকরাম মারা গেছে,' ফিসফিস করে বলল কেয়া।

'মারা গেছে?' বিস্মিত দেখাল রানাকে। এটা আশা করেনি ও। 'কিভাবে? কি ঘটেছিল? পুলিস কি ওকে···?'

হঠাৎ হিংস্র হয়ে উঠল কেয়ার চেহারা, টিনার দিকে তাকাল সে। ঠোঁটের কোণ বাঁকা করে বলল, 'ওকে জিজ্ঞেস করো। ও জানে। ওর ভাই আবিদ তাকে খুন করেছে!'

এক হাত দিয়ে রানাকে জড়িয়ে ধরল টিনা।

'তোমার কথা বুঝলাম না,' কেয়াকে বলল রানা। 'কিভাবে বুঝলে আবিদ তাকে খুন করেছে?'

'কিভাবে আবার! ঘটনাটা নিজের চোখে ঘটতে দেখেছি,' হিসহিস করে উঠল কেয়ার গলা। টিনার দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত চাপল সে। তারপর রানার দিকে তাকাল। একটা হাত তুলল মাথায়। রানা লক্ষ করল, আঙুলগুলো কাঁপছে। মাথার চুলে আঙুল চালাতে শুরু করল সে। তারপর বলল, 'প্রথম থেকেই আমাদেরকে অনুসরণ করছিল আবিদ।'

'অনুসরণ করছিল?' এক হাত দিয়ে টিনাকে ধরে রাখল রানা। 'সব কথা শুরু থেকে বলো দেখি?'

কাঠ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল কেয়া, তারপর হড়বড় করে বলতে শুরু করল, 'সরাফতের বাংলোয় মারা গেল শাহেদ। আমাদেরকে পালাবার সুযোগ করে দেবার জন্যে নিজের ইচ্ছায় প্রাণ দিল সে। আকরাম মারাত্মকভাবে আহত হলো। পুলিস আমাদেরকে প্রায় ধরে ফেলেছিল। আমরা একটা মসজিদের ভেতর লুকিয়ে ছিলাম।' বার বার ঢোক গিলতে দেখে মনে হলো, কেয়ার মুখের ভেতরটা শুকিয়ে গেছে, তাই কথা বলতে পারছে না। কেমন যেন শূন্য হয়ে উঠল চোখের দৃষ্টি, নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকল ওদের দিকে। তারপর ধীরে ধীরে ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল। একটা হাত থেমে নেই, আঙুল দিয়ে খুলি টেপাটেপি করছে।

'তারপর?' তাগাদা দিল রানা। 'তারপর কি হলো?'

'আমরা একটা মালগাড়িতে উঠি,' আবার শুরু করল কেয়া, কিন্তু এবার তাকে অনিশ্চিত দেখাল, কথা বলছে থেমে থেমে। 'ভাগ্য আমাদেরকে সহায়তা

করে। কোথাও না থেমে সোজা খুলনার দিকে আসছিল ট্রেন। কিন্তু আকরামের অবস্থা সিরিয়াস হয়ে উঠল। পানি পানি করে জান দিচ্ছিল সে। তাকে রেখে পানি আনতে যাই আমি। এক এক করে অনেকগুলো ওয়াগন দেখি, কিন্তু কোথাও পেলাম না। ফিরে আসছি, এই সময় তার চিৎকার শুনতে পেলাম। পাশের ওয়াগন থেকে দেখতে পেলাম ট্রেন থেকে বাইরের দিকে অর্ধেক ঝুলে পড়েছে সে। ঝুলছিল দরজার হাতল ধরে।' গলাটা প্রায় বুজে এল কেয়ার, ফিসফিস করে বলল, 'ওর গলা টিপে ধরেছিল আবিদ। পাশের ওয়াগন থেকে আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব ছিল না। ট্রেন থেকে নিচে পড়ে গেল আকরাম। ঠিক সেই সময় পাশের লাইনে, উল্টো দিক থেকে একটা ট্রেন আসছিল। আকরামের ওপর দিয়ে চলে গেল সেটা। জাফর যেভাবে মারা গিয়েছিল, সে-ও সেভাবে মারা গেল—আবিদ ওকে খুন করেছে।'

রানার শিরদাঁড়ার কাছটা শিরশির করে উঠল। 'আবিদকে তুমি দেখেছ?' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল দৃষ্টি।

'হ্যাঁ।'

'চিনতে পেরেছ তাকে? আর কাউকে দেখে আবিদ বলে মনে করোনি তো?'

কেয়ার চেহারা কঠোর হয়ে উঠল। গলা চড়িয়ে ঝাঁঝের সাথে জানতে চাইল সে, 'তুমি কি ভাব আমাকে? আবিদকে দেখেও চিনতে পারব না?'

'মিথ্যে কথা বলছে ও!' ফিসফিস করে বলল টিনা। রানার গায়ের সাথে সেঁটে রয়েছে সে। তার কাঁপুনিটা অনুভব করতে পারল রানা।

'থামো,' নিচু গলায় টিনাকে বলল রানা। 'বলতে দাও ওকে।' কেয়ার দিকে ফিরে বলল, 'আকরাম মারা যাবার পর কি ঘটল?'

শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কেয়া। ভুরু জোড়া আগের মতই কুঁচকে আছে। চেহারা দেখে মনে হলো কি যেন স্মরণ করার চেষ্টা করছে, কিন্তু ঠিকঠাক মনে করতে পারছে না। অবশেষে বলল, 'তারপর? তারপর আবিদের পিছু নিয়ে এখানে পৌঁচেছি আমি। দ্বীপে গেছে সে।'

'সংক্ষেপে সারছ তুমি,' বলল রানা। 'আকরামের সাথে ট্রেনে তুমিও যে আছ, আবিদ সেটা জানত। তাহলে তোমাকে কিছু না বলে ছেড়ে দিল কেন?'

বোকা বোকা দেখাল কেয়াকে। মনে হলো, চিন্তাশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে তার। মাউজার ধরা হাতটা ওপর-নিচে ওঠা-নামা করছে। বিড় বিড় করে বলল সে, 'দ্বীপে গেছে সে।'

'কিভাবে বুঝলে দ্বীপে গেছে সে?'

'আমি তাকে যেতে দেখেছি।'

'কিন্তু গেল কিভাবে? এটা তার বোট। কিভাবে গেল?'

মাথা থেকে কপালে নেমে এল কেয়ার হাত। চোখের একটা পাশ টিপে ধরল আঙুল দিয়ে। 'বলছি তো, তাকে আমি যেতে দেখেছি। মংলা থেকে একটা বোট নিয়ে রওনা হয়েছিল সে।' খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার শুরু করল, যেন নিজের সাথে কথা বলছে, 'আমিই নয়জনের শেষ জন। বাকি সবাই শেষ হয়ে গেছে, এক এক করে। ওদের তুলনায় অনেক বেশি বুদ্ধি আর সাহস রাখে আবিদ।

কিন্তু চালাকিতে আমার সাথে পেরে উঠবে না সে।' সামনে এগোতে শুরু করল কেয়া। হুমকি দেয়ার ভঙ্গিতে নাড়ল মাউজারটা। 'বোট ছাড়ো!' হঠাৎ গলা চড়াল সে। 'জলদি! যথেষ্ট সময় নষ্ট হয়েছে, আর নয়। দ্বীপে আছে সে। এবার আর তার পালাবার কোন উপায় নেই! বোট ছাড়ো।'

'সাবধান,' ফিসফিস করে টিনাকে বলল রানা। 'ও পাগল হয়ে গেছে! যা বলছে করো।'

হুইল হাউসে ঢুকল ওরা। দোরগোড়ায় মাউজার হাতে দাঁড়িয়ে থাকল কেয়া। ম্লান, পাংশু হয়ে গেছে টিনার চেহারা, কাঁপা হাতে এঞ্জিন স্টার্ট দিল সে। শেডের তলা থেকে বেরিয়ে মাঝ নদীর দিকে ছুটল বোট।

যতটা আশা করেছিল রানা, নিরিবিলি দ্বীপ তার চেয়ে অনেক বড়। ভেবেছিল শ'দুয়েক গজ পলিমাটি নিয়ে নদীর বুকে একটা চর, সেখানে কুঁড়ে ঘর টাইপের মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই আছে। কিন্তু বোট যতই দ্বীপের দিকে এগোল, ওর ধারণা বদলে যেতে লাগল। পশুর নদী এখানে বিশাল আকার পেয়েছে, সাগর এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয় বলে ঢেউগুলোও প্রকাণ্ড। ছোট কিন্তু সুন্দরভাবে আড়াল করা একটা হারবারে ঢুকল মোটরবোট। ডেকে দাঁড়িয়ে চোখ তুলল রানা। সাঁঝের আবছা আলোতেও পরিষ্কার দেখা গেল আকাশ ছোঁয়া মাটির ঢিবি, সারি সারি পাহাড়ের আকৃতি ভীষণ গাম্ভীর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোন কোনটা একেবারে খাড়া উঠে গেছে, কোনটা আবার ঢালু। কয়েকটা ঢিবি শুধু ঘাস মোড়া, বাকিগুলোর গায়ে গভীর জঙ্গল গজিয়েছে। এতই গভীর আর ঘন জঙ্গল, ওখানে হিংস্র জানোয়ার থাকা বিচিত্র নয়। টিনা বোধহয় ঠিকই বলেছিল, নতুন লোকের জন্যে দ্বীপটা বিপদসংকুল হতে পারে।

বেশ ঘন কুয়াশার পর্দা ঢেকে রেখেছে দ্বীপের ওপরের আকাশটাকে। তীব্র বাতাস, শোঁ শোঁ আওয়াজ ছাড়া আর কিছু ঢোকে না কানে। হারবারে বোট ভেড়ার সময় আশপাশ থেকে একদল সী-গাল ডানা মেলল। পাখনার ঝটপট ঝটপট আওয়াজ তুলে অন্ধকারে হারিয়ে গেল তারা। মোটর বোট থেকে জেটিতে নেমে এল ওরা। সবার পিছনে রয়েছে মাউজার হাতে কেয়া।

জেটির পর মাটি কেটে সিঁড়ি তৈরি করা হয়েছে। একটা ঢিবির মাথায় উঠে গেছে ধাপগুলো। গুনল রানা। দুশো ধাপ। সিঁড়ির মাথায় পাথরের তৈরি প্ল্যাটফর্ম। ওখানে দাঁড়িয়ে আকাশ ছোঁয়া ঢিবিগুলোর দিকে তাকাল রানা। বাতাসে ওদের কাপড়চোপড় উড়ছে, ঠেলে নিয়ে যেতে চাইছে প্ল্যাটফর্মের কিনারার দিকে। কিনারা থেকে ঝপ্ করে নিচে নেমে গেছে ঢিবির গা, নিচে উথালপাথাল নদী। বাতাসের দাপট এড়াবার জন্যে মাথা নিচু করে টিনাকে অনুসরণ করল ও। সরু, পাথরের স্ল্যাব বসানো পথ। সামান্য একটু ঢালু, আরও ওপর দিকে উঠে গেছে। শেষ মাথাটা অন্ধকারে দেখা গেল না। পিছু পিছু আসছে কেয়া। কোথাও হোঁচট খেলেই আপনমনে বিড়বিড় করে কি যেন বকছে সে।

হঠাৎ করেই বাড়িটার কাছে চলে এল ওরা। প্রথমে পাথুরে একটা চাতাল আর

ভিত তৈরি করা হয়েছে, তার ওপর দাঁড়িয়ে আছে দোতলা বাড়িটা। আকারে ছোটই, কিন্তু যেমন গম্ভীর দর্শন তেমনি শক্ত। ছাদ, ফ্লোর আর দেয়ালগুলো কংক্রিটের। এক পাশে আরেক প্রস্থ সিঁড়ি দেখা গেল, প্রায় খাড়াভাবে উঠে গেছে ওপর দিকে। টিনাকে প্রশ্ন করে জানতে পারল রানা, সিঁড়িটা শেষ হয়েছে খুদে একটা সমতল চূড়ায়, দ্বীপের সবচেয়ে উঁচু জায়গা ওটা, সাগর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়।

গোটা বাড়ি অন্ধকারে ডুবে আছে। জানালাগুলো কালো আয়নার মত, অলস ভঙ্গিতে ভেসে যাওয়া মেঘের প্রতিবিম্ব পড়ছে গায়ে। সামনের দরজার দিকে পা বাড়াল টিনা, তার হাত ধরে পিছু টানল রানা। 'তাড়াহুড়ো কোরো না। কেউ যদি ভেতরে থাকে...'

'কেউ নেই,' নিচু গলায়, কিন্তু জোর দিয়ে বলল টিনা। 'ওর কথা নিশ্চয়ই তুমি বিশ্বাস করোনি?'

'তবু ঝুঁকি নেবার কোন মানে হয় না।'

'যেখানে ভয় পাবারই কিছু নেই, সেখানে ঝুঁকি নেবার প্রশ্ন ওঠে না,' জবাব দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল টিনা। রানা তাকে বাধা দেবার আগেই ছুটে গিয়ে সামনের দরজার সামনে দাঁড়াল সে। 'টর্চ কিনলে, সেটা কোথায়?' কাঁধের ওপর দিয়ে রানার দিকে ফিরে বলল। 'এখান থেকে চলে যাবার সময় মোম দিয়ে দরজা সীল করে দিই আমরা। সীল যদি ঠিক থাকে মনে করতে হবে ভেতরে নেই কেউ।'

টিনার পাশে চলে এল রানা। টর্চের আলো ফেলল দুই কবাটের মাঝখানে। দরজা খোলা হলে মোমের সীল ভেঙে পড়ার কথা। টর্চের আলোয় দেখা গেল, দুই কবাটের ফাঁকে লেগে রয়েছে মোম।

'ভেতরে ঢোকার আর কোন রাস্তা আছে?' জানতে চাইল রানা। পিছন দিকে না তাকিয়েও বুঝল ও, ধীরে ধীরে, সতর্কতার সাথে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে কেয়া।

'যা বলবে জোরে বলো,' হুমকি দেয়ার সুরে বলল কেয়া। 'আমার সাথে ষড়যন্ত্র করে সুবিধে করতে পারবে মনে করলে মস্ত ভুল করবে।'

'কেউ তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে না,' নরম সুরে বলল রানা। 'আমরা তোমাকে নিয়ে কথা বলছি না।'

'বুঝব কিভাবে? জোরে কথা বলতে কি হয়?' খেঁকিয়ে উঠল কেয়া।

'ঠিক আছে,' মেনে নিয়ে বলল রানা। 'এবার থেকে তাই বলব। কিন্তু হাতের মাউজারটা এবার সরাও না? আমাকে তোমার এত কেন ভয়?'

'তোমাকে নয়, ভয় পাই ওদেরকে!'

'ওদেরকে?'

'আবিদ আর আবিদের বোনকে,' বলল কেয়া। 'সুযোগ পেলেই আমাকে মেরে ফেলবে ওরা। ঘটনাটা যদি ঘটতে শুরু করে তোমার ভূমিকা কি হবে তাও আমার জানা আছে। প্রেমে একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছ, তা তো আর আমাকে চোখে

আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে না!'

'কি সব আজেবাজে বকছ!'

'ওর কথায় কান দিয়ো না,' ভয়ে ভয়ে বলল টিনা। 'তুমিই না বললে, ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে?'

'হুঁ,' বলল রানা। স্বাভাবিক গলায় জানতে চাইল, 'ভেতরে ঢোকার আর কোন রাস্তা আছে, টিনা?'

'না। এটাই একমাত্র পথ। নিচের জানালাগুলো তো দেখেছই, সবগুলোয় শাটার লাগানো আছে, ভেতর থেকে বন্ধ করার সিস্টেম।'

'ভেতরে ঢোকার আর কোন রাস্তা থাকলেও ও তা স্বীকার করবে নাকি?' পিছন থেকে হুল ফোটাল কেয়া।

পাল্টা কিছু না বলে চামড়ার ব্যাগ খুলে কোটটা বের করল টিনা, কোটের পকেট থেকে চাবি নিয়ে দরজার তালা খুলল।

'সাবধান!' কঠিন সুরে বলল কেয়া। 'ছুটে ভেতরে পালাবার চেষ্টা করছ টের পেলেই আমি কিন্তু গুলি করব!'

'আমি কাউকে ভয় করি না,' শান্ত কিন্তু দৃঢ় সুরে বলল টিনা। 'পালাব কেন?'

'আবিদের বোনের এত বড় স্পর্ধা, মুখে মুখে তর্ক করে?' বলেই খিলখিল করে হেসে উঠল কেয়া। নির্জন দ্বীপে হায়েনার হাসির মত শোনাল গলার আওয়াজটা। রানার আরও গায়ের কাছে সরে এল টিনা।

'কি হলো, তুমি নাকি ভয় পাও না?' হাসি থামিয়ে বিদ্রূপের সুরে জানতে চাইল কেয়া। 'তোমাদের ঢলাঢলি দেখে ঘেন্না ধরে গেছে আমার। নাও, অনেক হয়েছে, কবাট খোলো।'

জেনারেটর চালু করে দিল টিনা, তারপর সুইচ টিপতেই জ্বলে উঠল বাইরের ইলেকট্রিক বাতি।

একটা হাত দিয়ে কবাটের গায়ে ধাক্কা দিল রানা। খুলে গেল দরজা। টিনার হাত ধরে ভেতরে ঢুকল ও।

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে সুইচ টিপল টিনা।

বেশ বড় আকারের একটা ড্রইংরুম। আরাম কেদারা, সোফা ইত্যাদি দিয়ে সুন্দরভাবে সাজানো। টিনাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল রানা, বলল, 'অপেক্ষা করো এখানে। ভেতরটা ঘুরে দেখে আসি আমি।'

'এখানে নেই কেউ!' জোর দিয়ে বলল টিনা।

'হয়তো, কিন্তু আমি কোন ঝুঁকি নিতে রাজি নই,' বলল রানা।

রানাকে বাধা দিয়ে কি যেন বলতে যাচ্ছিল কেয়া, কিন্তু কি মনে করে চুপ করেই থাকল। রানা ভেতর দিকের দরজার কাছে পৌঁছেছে, এই সময় মুখ খুলল সে, 'যাও, কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরে এসো। আর হ্যাঁ, কোনরকম চালাকি করার চেষ্টা করলে ভুল করবে তুমি।'

'ভুল করা আমার পোষাবে না,' ঘাড় ফিরিয়ে কেয়াকে বলল রানা। 'তাই চালাকি করাকরির মধ্যে নেই আমি।'

'তবু কথাটা মনে করিয়ে দিলাম,' আড়চোখে টিনার দিকে তাকাল কেয়া। 'মনে থাকে যেন, আবিদের বোন আমার কাছে জিম্মি হিসেবে থাকল।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ড্রইংরুম থেকে বেরিয়ে গেল রানা। গোটা বাড়ির ভেতরটা ঘুরে দেখতে পাঁচ মিনিটের বেশি লাগল না ওর। দোতলাতেও উঠল। প্রতিটি রুমে ঢুকল ও। ভেতরে যে কেউ লুকিয়ে নেই, নিশ্চিতভাবে বুঝল সেটা। জানালা দরজা সবগুলো ভেতর থেকে বন্ধ।

ফিরে এল রানা। অস্থিরভাবে পায়চারি করছে কেয়া। আলোর নিচে, দরজার পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে টিনা। রানাকে দেখেই চোখে রাজ্যের প্রশ্ন নিয়ে তাকাল সে। রানা যে ফিরে এসেছে, সেদিকে কেয়ার কোন খেয়ালই নেই।

'কিছু দেখলে?' ফিসফিস করে জানতে চাইল টিনা।

'না।'

পায়চারি থামিয়ে প্রথমে টিনা, তারপর রানার দিকে তাকাল কেয়া। 'ফের তোমরা গুজুর গুজুর করছ?'

'বাড়ির ভেতর কেউ নেই,' বলল রানা। 'এই রাতে আর দ্বীপটা ঘুরে দেখা সম্ভব নয়। তুমি কি বলো?'

'কত বড় দ্বীপ এটা?' জানতে চাইল কেয়া। 'আমার সাথেও টর্চ আছে। কতক্ষণই বা লাগবে?'

'আকাশের অবস্থা ভাল নয়,' বলল রানা। 'খুব বড় নয় দ্বীপটা, কিন্তু ছোটও নয়। অনেক ঢিবি আছে, দেখোনি? কেউ যদি থাকেও, কোথায় আছে বুঝবে কিভাবে? চারদিকে তো শুধু জঙ্গল।'

খানিক চিন্তা করে হেসে উঠল কেয়া।

চট্ করে রানার দিকে একবার তাকাল টিনা।

'হাসছ যে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ঠিক আছে, সকাল হোক, তারপর দেখা যাবে,' হাসি থামিয়ে বলল কেয়া। 'আবিদ পালিয়ে যাবে, সে ভয় নেই। আমিই তার শেষ শত্রু, আমাকে না মারতে পারলে এত খুন-খারাবির কোন অর্থ থাকবে না। কাল সকালেও তাকে খুঁজতে যাবার কোন দরকার নেই। আমি জানি, সে নিজেই আমার কাছে আসবে।'

'ওকে বলো, ইচ্ছে করলে একটা বেডরুমে রাতটা কাটাতে পারে ও,' রানাকে বলল টিনা।

'না!' কেয়ার চেহারায় অকারণ জেদ ফুটে উঠল। 'এই ড্রইংরুমেই থাকব আমি।'

'চাপাচাপি কোরো না,' নিচু গলায় টিনাকে বলল রানা, আড়চোখে লক্ষ করল ওদের অস্তিত্বের কথা ভুলে গিয়ে আবার অস্থিরভাবে পায়চারি শুরু করেছে কেয়া। 'চলো, ওর কাছ থেকে দোতলায় পালিয়ে যাই।'

ড্রইংরুমের এক কোণ থেকে উঠে গেছে সিঁড়িটা, ধীর পায়ে সেদিকে এগোল ওরা। সিঁড়ির নিচে পৌঁছে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। ঠোঁট জোড়া নড়ছে কেয়ার, কিন্তু শব্দগুলো শোনা যাচ্ছে না। এখনও পায়চারি করছে আপনমনে। পা টিপে

টিপে দোতলায় উঠে এল ওরা। আগেই দেখে গেছে ও, ওপরে চারটে বেডরুম। একটা সিঁড়ির মাথার কাছেই, সেটাতেই ঢুকল ওরা। এটা থেকে পাশের কামরায় যাবার দরজা আছে। ভেতরে ঢুকে আলো জ্বেলেই ফোঁস করে স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলল টিনা। 'উফ্, ধড়ে প্রাণ ফিরে এল।'

দরজা বন্ধ করে ওর দিকে তাকাল রানা। 'রাতটা ভালয় ভালয় কাটলে হয়,' বলল ও।

ভুরু কুঁচকে উঠল টিনার। 'কেন, তুমি কোন বিপদের আশঙ্কা করছ নাকি?'

'আমি নই, পরিস্থিতি এবং আমার মন।'

ঝাড়া পাঁচ সেকেন্ড রানার মুখের দিকে সন্ধানী চোখে তাকিয়ে থাকার পর ব্যগ্র কণ্ঠে জানতে চাইল টিনা, 'ওর কথা বিশ্বাস করেছ তুমি? তোমারও ধারণা আবিদ এই নিরিবিলিতে আছে?'

সাথে সাথে কিছু না বলে সিগারেট ধরাল রানা। চিন্তিতভাবে তাকাল টিনার দিকে। 'কেয়া যে সুস্থ নয় সে তো বোঝাই যাচ্ছে,' শান্তভাবে বলল ও। 'আকরাম সম্পর্কে যে গল্পটা শোনাল, ধোপে টেকে না। আবিদ ওর মাথার ভেতর এমনভাবে গেঁথে আছে, যা দেখছে বলে মনে করছে ও তার বেশির ভাগটাই বোধহয় ওর নিজের মনের কল্পনামাত্র, আসলে ঘটছে না।' হাতের তালু দিয়ে চোয়াল ঘষল ও। দু'দিন দাড়ি কামানো হয়নি, খোঁচা লাগল। 'কে জানে, হয়তো সবটাই তাই, কল্পনা। কিন্তু জাফর, মনসুর আর শামিমা যে খুন হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ওদের খুন হবার কারণটা কি, তার যদি একটা অন্য কোন ব্যাখ্যা বের করতে পারতাম! মুশকিল হলো, কেয়া না হয় পাগল, কিন্তু তোমার ভাই যে বেঁচে আছে সেটা ও শুধু একাই বলছে না। আকরাম আর শাহেদও তাই ভাবত।'

'আকরামকে আবিদ খুন করেছে, তোমারও কি এই ধারণা?'

'না,' বলল রানা। 'কেয়ার এই কথাটা অন্তত বিশ্বাস করা যায় না। শুনলে তো কি বলল, আবিদ আর আকরাম যখন ধস্তাধস্তি করছিল, ওর নাকি তখন কিছু করার ছিল না। কিন্তু ওর কাছে মাউজার ছিল! নিশ্চয়ই ছিল! আকরামের কাছে ছিল না সে তো বোঝাই যায়, কারণ এক ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে আরেক ট্রেনে কাটা পড়ে সে, মাউজারটা তখন তার কাছে থাকলে কেয়ার পক্ষে সেটা উদ্ধার করা সম্ভব ছিল না। তারপর ধরো, টার্গেট মিস হয় না কেয়ার। আকরামকে যখন খুন করছিল আবিদ, পাশের ওয়াগন থেকে অনায়াসে গুলি করতে পারত সে। না, ওর গল্প ধোপে টেকে না।'

'তাহলে?'

'আমরা জানি, ভয়ানক আহত হয়েছিল আকরাম। হয়তো তাতেই মারা গেছে সে, এবং হয় কেয়া গোটা ব্যাপারটা কল্পনা করছে, নয়তো বানিয়ে মিথ্যে কথা বলছে।' চুলের ভেতর আঙুল চালাতে শুরু করল রানা। 'কিন্তু কেন? মিথ্যে কথা বলছে কেন? এর ভেতর কোথাও কোন রহস্য আছে। না থেকেই পারে না। কিছু একটা জানা নেই আমাদের। আরও চিন্তাভাবনা করে দেখতে হবে আমাকে। এসবের পেছনে কিছু একটা না থেকেই পারে না। হয়তো ছোট্ট কোন ব্যাপার,

কিন্তু সেটাই সবকিছুর জন্যে দায়ী।' হাত বাড়িয়ে টিনার কাঁধ ধরল ও। 'যাও, টিনা, শুয়ে পড়োগে। আমাকে একটু ভাবতে দাও। আর শোনো, দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই।'

'তুমি ওর কথা বিশ্বাস করোনি, সেজন্যে আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ,' মৃদু গলায় বলল টিনা। 'কিন্তু তুমি যদি বিশ্বাস করতে এসব কিছুর সাথে আবিদের কোন সম্পর্ক নেই...'

'কেয়ার বিশ্বাস, আবিদ নাকি এই দ্বীপেই আছে। থাকলে, তার সাথে আমার দেখা হবে। আমার মন বলছে, কালই গোটা ব্যাপারটার শেষ দেখতে পাব আমরা।'

'আবিদকে তুমি পাবে না,' ফিসফিস করে বলল টিনা। 'আমি জানি পাবে না!'

'শোবে না?' নরম সুরে জানতে চাইল রানা। 'যাও, তোমার বিশ্রাম দরকার। বলেছি তো, কেয়ার সব কথা আমি বিশ্বাস করিনি। সম্ভব হলো না, কিন্তু মাউজারটা হাত করতে পারলে ভাল হত। আমি তো আছিই, তোমার চিন্তার কিছু নেই। আজ রাতে কিছু করা যাবে না। সকাল হোক, তারপর দেখা যাবে। যাও।'

রানার একটা হাত ধরল টিনা। 'একটা কথা বলছি। ভয় হচ্ছে, সেটাকে পুঁজি করে তুমি আবার কল্পনার লাগাম ছেড়ে দেবে না তো?'

হেসে ফেলল রানা। 'না।'

'তোমার অনেক কিছুই আবিদের মত। এখন যেভাবে কথাগুলো বললে, ঠিক এই সুরে, এই বাচনভঙ্গিতে আমার সাথে কথা বলত আবিদ।' একটু বিরতি নিল টিনা। তারপর গলা একেবারে খাদে নামিয়ে আবার বলল, 'ওকে আমি ভালবাসতাম। নিজের চেয়েও অনেক বেশি ভালবাসতাম।'

টিনাকে কাছে টানল রানা। কাঁধে একটা চাপ দিয়ে ছেড়ে দিল।

'যাও, শুয়ে পড়ো গে।'

চোখ তুলে রানার চোখে তাকাল টিনা। নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল অনেকক্ষণ। কি দেখল সে-ই জানে। চোখ নামিয়ে নিয়ে মৃদু কণ্ঠে বলল, 'ধন্যবাদ! আমি জানতাম! আমি জানতাম, আসলে তুমি সত্যিকারের ভদ্রলোক।' ঘুরে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে এগোল দরজার দিকে। দরজা খুলল। চৌকাঠ পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল অন্ধকারে।

পাশের ঘরে আলো জ্বলে উঠল। দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল টিনা। মিষ্টি একটুকরো হাসি ফুটে উঠল ঠোঁটে। রানার চোখে চোখ রেখে ধীরে ধীরে দরজাটা বন্ধ করে দিল সে।

গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটা সোফায় বসে পড়ল রানা। কিন্তু একটু পরই উঠে দাঁড়াল ও। পায়চারি করতে করতে মাথার চুলে আঙুল চালাচ্ছে।

খানিক পর বৃষ্টি নামল। বন্ধ জানালায় ঝমঝম আওয়াজ হচ্ছে। সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠল বাতাসের শোঁ-শোঁ শব্দ। চাপা, গুরু-গম্ভীর আরেকটা আওয়াজ ভেসে আসছে। ফুঁসে উঠেছে নদী, বিশাল সব ঢেউ একের পর এক আছাড় খাচ্ছে দ্বীপের কিনারায়। দুর্যোগের রাত। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করল রানা।

অস্থিরভাবে গায়ের কোট খুলে ছুঁড়ে দিল বিছানার ওপর। একটা আর্মচেয়ারে বসল। মনে পড়ল দু'রাত ঘুমানো হয়নি। ট্রেনে ঝিমিয়েছে, তাকে ঘুম বলে না। চোখ দুটো ভারী হয়ে এল। কিন্তু জানে, বিছানায় গেলেও ঘুম আসবে না তার।

চোখ বুজে শরীরটা ঢিল করে দিল রানা। তারপর আবিদের কথা ভাবতে শুরু করল।

আবিদ—অন্ধকারে একটা কণ্ঠস্বর। কিছু লোকের দেয়া বর্ণনা থেকে তৈরি করা একটা ছবি। কেউ বলে ভাল মানুষ, কেউ বলে খারাপ। নিষ্ঠুর একটা চরিত্র, ঠাণ্ডা মাথায় খুন করে। এমন একজন মানুষ, শাহেদ যার প্রশংসা করেছে, টিনা যাকে ভালবেসেছে। কিন্তু আকরাম আর কেয়ার ঘৃণার পাত্র সে। একজন বিশ্বাসঘাতক। এমন একজন বন্ধু, বন্ধুদের কাছে বিশ্বস্ত থাকত। অথচ নিজের দলের সাথে বেঈমানী করেছে। হয় এখানে এই নিরিবিলি দ্বীপে আছে সে, নয়তো আমেরিকায় মারা গেছে।

চেয়ারের হাতলে দুম করে একটা ঘুসি বসিয়ে দিল রানা। কিছু একটা বাদ পড়ে যাচ্ছে। এখন আর ওর মনে কোন সন্দেহই নেই। গোটা ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল ফিরোজ চৌধুরীর সাথে আবিদ বেঈমানী করেছিল বলে। আবিদ যদি মুখ বন্ধ রাখত, এসব কিছুই ঘটত না। জাফর, মনসুর এবং শামিমা বেঁচে থাকত। সাহায্যের জন্যে ওর কাছে আসত না ওরা তিনজন—শাহেদ, আকরাম আর কেয়া। আবিদ যদি মুখ না খুলত! আবিদ ফিরোজ চৌধুরীর সাথে বেঈমানী করতে গেল কেন? এমন কি, এই রহস্য শাহেদও উদঘাটন করতে পারেনি। এটাই কি তবে সব রহস্যের চাবি? এই প্রশ্নের উত্তরই কি খুঁজছে ও?

হঠাৎ আলো চলে যেতেই সিধে হয়ে গেল শিরদাঁড়া। হয় বাল্‌বটা ফিউজ হয়ে গেছে, নয়তো মেইন সুইচ বা জেনারেটর অফ করে দিয়েছে কেউ। নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল ও। পা টিপে দরজার দিকে এগোল। কোন আওয়াজ না করে দরজা খুলতে চেষ্টা করল। কবাট একটু ফাঁক করে বাইরে তাকাতেই দেখল, বারান্দা, নিচের ড্রইংরুম সব অন্ধকার। বাড়ির সব আলো নিভে গেছে। কোথাও কোন নড়াচড়া হলেও, টের পাবার উপায় নেই। চারদিকে শুধু বৃষ্টি আর বাতাসের শব্দ।

কবাটের ফাঁকে চোখ রেখে আরও কিছু শুনতে পাওয়া যায় কিনা তারই জন্যে অপেক্ষা করছে ও। পাঁজরে বাড়ি খাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। শুনতে পেল, নিচ থেকে কথা বলল কেউ। গলার আওয়াজ কানে যেতেই গায়ের রোম খাড়া হয়ে উঠল ওর। কর্কশ, ফ্যাঁসফেঁসে গলা। হয়তো অন্ধকার বলেই, দিক নির্ণয় করতে পারল না ও। নিচে থেকে এল, কিন্তু কতদূর থেকে, নিচের ঠিক কোন্‌খানটা থেকে, কিছুই ধরতে পারল না। এই গলাই নঈমের ফ্ল্যাটে শুনেছিল ও। আবিদের গলা।

'তুমি কোথায়, কেয়া?' সেই একই গলা থেকে আবার বেরুল খসখসে আওয়াজ।

পরমুহূর্তে বিস্ফোরণ। আগুনের চোখ ঝলসানো শিখা চিরে দিল অন্ধকারটাকে। সেই সাথে পিস্তলের কান ফাটানো গর্জন। তারপরই শোনা গেল একটা আর্তস্বর। কেয়ার গলা এটা। পরমুহূর্তে শুনতে পেল রানা। দরজার হুড়কো খোলার আওয়াজ। সেই সাথে বাড়ির ভেতর হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল একরাশ

বন্ধমাতাল ঝড়ো হাওয়া।

ছুটে বেরিয়ে এসে রানার সাথে ধাক্কা খেলো টিনা। হাঁপাচ্ছে সে। 'কিসের আওয়াজ? কি হয়েছে?' ভয়ে, উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে সে।

টিনাকে সরিয়ে দিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এল রানা। রেলিঙের সামনে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়ল নিচের দিকে। টর্চের আলো ফেলল ড্রইংরুমে।

ড্রইংরুম খালি। সামনের দরজাটা হা হা করছে।

'কেয়া! কোথায় তুমি?' চিৎকার করে ডাকল রানা।

জবাব পাওয়া গেল না।

টিনার দিকে ফিরল রানা। 'মেইন সুইচ কোন্ দিকে?'

'কিচেনে।'

'এখানে অপেক্ষা করো,' বলেই ছুটল রানা। তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল নিচে। এক মুহূর্ত পরই আবার জ্বলে উঠল আলো। কিচেন থেকে বেরিয়ে এসে ড্রইংরুমের চারদিকে তাকাল ও।

'কেয়া চলে গেছে,' মুখ তুলে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়ানো টিনার দিকে তাকাল রানা।

'কিন্তু গুলির আওয়াজ হলো যে? কে কাকে গুলি করল?' দ্রুত নিচে নেমে এসে রানার সামনে দাঁড়াল টিনা।

উত্তর না দিয়ে খোলা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। চোখেমুখে বৃষ্টির ছাট এসে বিঁধতে লাগল। ঘোর অন্ধকার রাত, কিছুই দেখতে পেল না ও। দরজা বন্ধ করে হুড়কো লাগিয়ে দিল, ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকাল টিনার দিকে।

'ভাল করে খোঁজো, টিনা,' বলল ও। 'বুলেটটা দেখতে চাই আমি।' বলে নিজেও দেয়াল আর ফার্নিচারের গা পরীক্ষা করতে শুরু করল। উত্তেজনায় উদ্ভাসিত, আলোকিত হয়ে উঠেছে চেহারা।

রানা নয়, বুলেটটা পেল টিনা। মেহগনি কাঠের প্যানেলের ভেতর সেঁধিয়ে গিয়েছিল। ছুরি দিয়ে কাঠ খোদাই করে সেটা বের করল রানা। চ্যাপ্টা হয়ে গেছে বুলেটটা, তালুতে ফেলে আলোর নিচে গিয়ে দাঁড়াল ও। তারপর আঙুল দিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে ভুরু কুঁচকে তাকাল টিনার দিকে।

'মাউজারের বুলেট,' বলল ও। কিছুক্ষণ কেটে গেল, চেহারায় কোন ভাব ফুটল না। তারপর মধুর, নিঃশব্দ হাসি দেখা দিল ঠোঁটে। 'বলিনি, কিছু একটা জানতে বাকি আছে? গলার আওয়াজটাই বোকা বানিয়ে রেখেছিল আমাকে!'

'কি বলছ কিছুই বুঝছি না আমি...'

'সমাধান পেয়ে গেছি, টিনা!' উজ্জ্বল হাসি ফুটল রানার চোখে। 'রহস্যের মীমাংসা হয়ে গেছে।'

তেরো

বাড়ির মাথা থেকে অনেক উঁচু, সমতল চূড়ায় দাঁড়িয়ে গোটা দ্বীপটা দেখতে পেল রানা। উত্তর দিকে তাকাল ও। সকালের আকাশের গায়ে জঙ্গল মোড়া ঢিবিগুলোকে গাঢ় সবুজ, কোথাও কোথাও কালচে দেখাল। পশ্চিমে দুই ঢিবির মাঝখানে সমতল জলাভূমি, আগাছার ভিড় সেখানে, আর কাদায় থকথকে। পুব দিকে ঢেউ খেলানো একের পর এক বালিয়াড়ি, রোদ লেগে চিকচিক করছে। দক্ষিণে খোলা নদী, নদীর পারে যেতে হলে খোলা মাঠ পেরুতে হবে।

আরও কিছুক্ষণ পরীক্ষা করার পর সিদ্ধান্ত নিল ও, পশ্চিম আর দক্ষিণ দিক বাদ দেয়াই ভাল, ওদিকে গেলে কোন কাভার পাওয়া যাবে না। খানিক ইতস্তত করার পর পুব দিকটাকেও বাদ দিল ও। কেউ যদি গা ঢাকা দিতে চায়, উত্তর দিকটাকেই বেছে নেবে সে। শুধু জঙ্গল নয়, এবড়োখেবড়ো কিছু পাথর আর বোল্ডারের স্তূপও মাথাচাড়া দিয়ে আছে ওদিকে।

চূড়া থেকে সাবধানে নামতে শুরু করল রানা। কোন ঝুঁকি নিতে রাজি নয় ও। নিচে নেমে আসতে দু'ঘণ্টার মত লেগে গেল। দুপুর বারোটা। বাড়ির পেছন দিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে আছে বোল্ডার, লুকিয়ে থাকার জন্যে নিরাপদ। শিরদাঁড়া বাঁকা করে কুঁজো হলো ও, মাথা নিচু করে পেরিয়ে গেল জায়গাটা। এরপর জঙ্গল। একটু ভেতরে ঢুকতেই গভীর হয়ে উঠল। ডালপালা আর পাতার ফাঁকে, বেশ দূরে দেখা গেল প্রথম সারির প্রথম ঢিবিটাকে। এগুলো ঠিক পাথুরে ঢিবি নয়, কিন্তু মাথার দিকে এবড়োখেবড়ো পাথরের বড় বড় চাঁই দেখা যাচ্ছে। যতদূর আন্দাজ করা যায়, বিশাল একটা প্রাসাদ বা দুর্গ তৈরি করার জন্যে প্রাচীনকালে কেউ এই পাথর আমদানী করেছিল দ্বীপে, কিন্তু যে-কোন কারণেই হোক শেষ পর্যন্ত আর তৈরির কাজে হাত দেয়া হয়নি। সেই থেকে রোদ-বৃষ্টিতে পড়ে মাটির সাথে একাত্ম হয়ে গেছে পাথরের চাঁইগুলো।

জঙ্গল পেরিয়ে প্রথম ঢিবির মাথায় চড়ল রানা। এখান থেকে দ্বীপের আরেক প্রান্তের নদী দেখা যায়। কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থেকেও প্রাণের কোন লক্ষণ দেখল না রানা। চোখ গিয়ে পড়ল পুবদিকে। বালিয়াড়িগুলো আরও কাছে চলে এসেছে। হঠাৎ ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল ওর। এত উঁচু থেকেও, কম পক্ষে একশো ফিট তো হবেই, পায়ের ছাপগুলো একটু বড় বড় লাগল চোখে। একটার কাছ থেকে আরেকটার দূরত্ব যেন বেশি বেশি লাগল। একটা মাত্র লাইন এগিয়ে গেছে, তার মানে একজন লোক গেছে ওদিকে।

পায়ের ছাপগুলো প্রচণ্ড একটা আঘাত হয়ে দেখা দিল রানার জন্যে। এটা সে ঘুণাক্ষরেও আশা করেনি। আবিদ! যেন ওর বিস্ময় মেশানো প্রশ্নের উত্তরেই বেশ খানিক দূরে কি যেন নড়ে উঠতে দেখল রানা চোখের কোণ দিয়ে। সরাসরি

সেদিকে তাকাল ও, কিন্তু আর কিছু দেখতে পেল না। তবে কি চোখের ভুল? দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে যাবে ও, এই সময় পরিষ্কার দেখতে পেল। চওড়া কাঁধ, লম্বা একজন লোক। বালিয়াড়ির শেষ মাথায় কিছু বোল্ডার দেখা যাচ্ছে, তার ওপারে ঘন ঝোপ-ঝাড় থেকে বেরিয়ে ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়াল লোকটা। দাঁড়াল, আবার চোখের পলকে সরেও গেল।

ঢিবি থেকে নামার সময় আগের চেয়েও সতর্কতা অবলম্বন করল রানা। প্রথমে হামাগুড়ি দিয়ে খানিকটা নামল ও, যখন বুঝল দাঁড়ালে দিগন্তরেখার ওপর ওর মাথা দেখা যাবে না, সিধে হয়েই ছুটতে শুরু করল। নিচে নেমে একের পর এক বালিয়াড়ি পেরিয়ে জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়ল ও। তারপর পা টিপে টিপে এগোল। বোল্ডারগুলোর কাছে পৌঁছুবার আগেই লোকটাকে দেখতে পেল আবার। একটা এবড়োখেবড়ো পাথরের ওপর বসে আছে পা ঝুলিয়ে। ওর কাছ থেকে দশ ফিটও দূরে নয়। ওর চেহারা থেকে সতর্ক, সদা প্রস্তুত ভাবটা আগেই দূর হয়ে গেছে. এবার ধীরে ধীরে সারা মুখে ফুটে উঠল উজ্জ্বল, নিঃশব্দ হাসি।

লোকটা সাদা ট্রাউজার আর নীল শার্ট পরে রয়েছে, শার্টের ওপর ছাই রঙের কোট। নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে গভীরভাবে কি যেন ভাবছে সে। চেহারায় রাজ্যের তিক্ততা। হঠাৎ মুখ তুলে তাকাল। রানাকে দেখতে পেয়ে কেমন যেন হতভম্ব হয়ে পড়ল সে, পরমুহূর্তে বাঁকা হাসি ফুটল ঠোঁটে।

'এই যে, বখাটে ছেলে,' বলল সে। 'কেমন আছ? নিজের দেশে এই রকম একটা দ্বীপ আছে, এখানে আসা না হলে জানাই হত না। বসে বসে ভাবছিলাম, তোমার সাথে দেখা হয়ে যেতে পারে। অনেক হাঁটাহাঁটি করে একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, বুঝলে? কাজের কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে প্রকৃতির রূপসুধা পান করছিলাম।' বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হা হা করে হেসে উঠল ইন্সপেক্টর ফয়েজ আহমেদ।

'আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না,' বলল রানা, 'কিন্তু আপনাকে দেখে আগে কখনও এত খুশি হইনি আমি।'

হাসিটা লেগে থাকল মুখে, কিন্তু ইন্সপেক্টরের চোখের দৃষ্টিতে একটা সতর্ক ভাব ফুটে উঠল। অনেকটা যেন অন্যমনস্কভাবেই সড় সড় করে একটা হাত কোটের পকেটে ভরল। 'আমাকে দেখে কি হয়েছ বললে? খুশি?' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল সে। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। 'ডাহা মিথ্যে কথা বলছ। হতে পারে অবাক হয়েছ, কিন্তু খুশি হও কি করে?'

'উঁহুঁ,' পাল্টা মাথা নেড়ে বলল রানা। 'অবাক নয়, খুশিই হয়েছি। ভাল কথা, পকেটে হাত ভরে পিস্তল হাতড়াতে হবে না।' ইন্সপেক্টরের সামনে, মাত্র হাত তিনেক দূরে, একটা পাথরের ওপর বসল ও। 'আপনাকে দৌড় খাটাবার কোন ইচ্ছে আমার নেই। আমি একটা থিওরির ওপর কাজ করছিলাম, আপনি সেটা কনফার্ম করেছেন। বলুন তো, সিকি মাইল পেছনে, বালির ওপর দিয়ে হেঁটে এসেছেন আপনি?'

'এসেছি,' বলল ফয়েজ আহমেদ। হাসি হাসি ভাবটা মুখে ধরে রেখেছে বটে, কিন্তু অনেক কষ্টে। চোখে তার কেমন যেন অনিশ্চিত ভাব।

'আপনার পা অত বড়?' চাপতে না পেরে হেসে ফেলল রানা। 'জানেন, পায়ের ছাপ দেখে আমি আরেকজনের কথা ভাবছিলাম। আমারই ভুল, বোঝা উচিত ছিল পুলিস ছাড়া আর কারও পায়ের ছাপ অত বড় হতে পারে না। তা, আপনি আমাকে এই দ্বীপে নামতে দেখেননি। এখানে আমি আছি জানলেন কিভাবে?'

'সব কৃতিত্ব আকরামের। সেই তো সব ফাঁস করে দিয়েছে,' বলল ফয়েজ আহমেদ। 'কেয়া নামের মেয়েটা এখানেই আছে, তাই না?'

'আছে। আপনারা তাহলে আকরামকে মুঠোয় পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ। তাকে পেয়েছি না বলে বলা উচিত তার যেটুকু অবশিষ্ট আছে সেটুকু পেয়েছি। আমাদের লোকেরা যশোরের কাছে রেললাইনের ওপর পড়ে থাকতে দেখে তাকে। বিচিত্র এক গল্প শুনিয়েছে লোকটা।'

'কেমন আছে সে?'

'ভাল নয়। আবার তাকে জ্যান্ত দেখতে পাব বলে মনে হয় না। চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে গিয়েছিল। কথা বলতে পেরেছে সেটাই আশ্চর্য।'

'পড়ে গিয়েছিল? ফেলে দেয়া হয়নি?'

'কি যেন নাম মেয়েটার? হ্যাঁ, কেয়া। ওই কেয়াই তার মাথায় বাড়ি মেরে ট্রেন থেকে ফেলে দেয়।'

'ঠিক এই কথাই শুনব বলে আশা করছিলাম আমি,' বলল রানা।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইল ফয়েজ আহমেদ, 'এ-ব্যাপারে কি জানো তুমি?'

রানার ডান পাশ থেকে একটা শব্দ ভেসে এল। নুড়ি পাথর গড়িয়ে পড়ার আওয়াজ। ঝট্ করে মুখ তুলে তাকাল ফয়েজ আহমেদ। কিন্তু রানা ঘাড় ফেরাল না।

'জানি অনেক কিছুই,' প্রশ্নের উত্তরে বলল রানা। 'গোটা ব্যাপারটার উৎস হলো আবিদুর রহমান নামে একজন মুক্তিযোদ্ধা। তার কথা বলেনি আকরাম?'

'বলেনি মানে?' গম্ভীর দেখাল ফয়েজ আহমেদকে। 'শুধু তার কথাই তো বকেছে। সেই সাথে, তাকে খুঁজে দেবার জন্যে তোমাকে ভাড়া করার ঘটনাটাও জানিয়েছে।' চেহারা কঠোর হয়ে উঠল, জানতে চাইল, 'ওরা কি তোমাকে সত্যি চল্লিশ হাজার ইন্ডিয়ান টাকা দিয়েছে? আমার কাছে মিথ্যে বোলো না!' শেষ কথাটা হুমকির মত শোনাল।

দেঁতো হাসি দেখা গেল রানার মুখে। 'দূর! টাকা দিয়েছে ঠিক, কিন্তু অত নয়। বাড়িয়ে বলেছে আকরাম।'

সন্ধানী চোখে তাকিয়ে থাকল ফয়েজ আহমেদ। 'আকরামের অভিযোগ, আবিদ নাকি ওর দুই বন্ধু জাফর আর মনসুরকে খুন করেছে। আরও বলল, শামিমার খুনীও ওই আবিদই। ওর এই সব কথা আমার কানে আসার সাথে সাথে ওয়্যারলেসে যোগাযোগ করি ঢাকার সাথে। ঢাকা থেকে আবিদের ব্যাপারটা চেক

করা হয়। রিপোর্টও পেয়ে গেছি আমি। প্রায় বছর দেড়েক আগে ক্যান্সারে মারা গেছে সে, আমেরিকায়। জেনুইন খবর, ভুল হবার কোন সম্ভাবনা নেই।'

'কোন সম্ভাবনাই নেই? একেবারে খাঁটি খবর?'

'সরাসরি হাসপাতালের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছিল,' বলল ফয়েজ আহমেদ। 'হাসপাতালের ডিরেক্টর নিজে জবাব দিয়েছেন। এর চেয়ে খাঁটি খবর কাকে বলে, আমার জানা নেই। আমি সন্তুষ্ট।'

'এই সব ঘটনার পেছনের ইতিহাসও নিশ্চয় বলেছে আকরাম?' জানতে চাইল রানা। 'ফিরোজ চৌধুরীর কথা, তার সাথে বেঈমানী করার কথা?'

মাথা ঝাঁকাল ইন্সপেক্টর। 'সব। সমস্ত ঘটনা চেক করা হচ্ছে। তবে ওরা যে মুক্তিযোদ্ধা ছিল, বিনা বিচারে আটক ছিল পাকিস্তানে, জেল ভেঙে পালিয়ে ইন্ডিয়া হয়ে বাংলাদেশে এসেছে, এসব সত্যি বলে জানা গেছে। যদিও, এসব ব্যাপারে আমরা তেমন উৎসাহী নই। আমার মাথাব্যথা হলো শামিমা মার্ডার কেস। এ-ব্যাপারে কেয়া চৌধুরীর সাথে কথা বলতে চাই আমি।' চোখের দৃষ্টি আরও সন্ধানী হয়ে উঠল তার। 'তার আগে তোমার সাথে আলাপটা সেরে নিই। শামিমা আখতার সম্পর্কে কি জানো তুমি? সে যখন খুন হয়, তুমি তো তখন ওর সাথেই ছিলে, তাই না?' গলার সুরটা নিরীহ করে তুলল ইন্সপেক্টর।

কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সাথে বলল রানা, 'শুধু আপনাকে বলতে পারি—হ্যাঁ, ছিলাম। কিন্তু তাকে আমি ছুঁইনি। তার চিৎকার শুনে ছুটে যাই, দেখি ঘাড় মটকে মারা গেছে। কেউ ধাক্কা দিয়েছিল, নাকি পড়ে গিয়েছিল, বলতে পারব না। আমার রেকর্ড খারাপ, তাই অকওয়ার্ড পজিশনে পড়ে গিয়েছিলাম। লাশটা দেখার পর তাড়াতাড়ি বিদায় নিই ওখান থেকে।'

'মেডিকেল এভিডেন্সে দেখা যাচ্ছে, তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়া হয়েছে, তারমানে এটা একটা খুন, ডিউক,' চেহারা থমথমে হয়ে উঠল ফয়েজ আহমেদের।

'প্রমাণ করা কঠিন হবে,' বলল রানা। 'প্রত্যক্ষদর্শী নেই, জজ সাহেবকে কনভিন্স করা যাবে না।'

'চেষ্টা করে দেখতে পারি তো?' বলল ফয়েজ আহমেদ, উজ্জ্বল হয়ে উঠল চেহারা। 'তোমার যা ব্যাকগ্রাউন্ড আর রেপুটেশন...' কাতর একটা মুখভঙ্গি করল সে। 'তুমি যদি ফেঁসে যাও, আমি খুব আশ্চর্য হব না।'

'আপনি আমার বিরুদ্ধে আদৌ অভিযোগ আনতে পারবেন কিনা সে-ব্যাপারেই সন্দেহ আছে আমার,' বলল রানা। 'কিন্তু আসুন, আরও জরুরী প্রসঙ্গে আলাপ করি আমরা।' বলে চোখ মটকাল রানা। 'তাড়াহুড়ো করে কিছু করতে যাবেন না। গুলি খেয়ে পটল তুলতে পারেন।' চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল ফয়েজ আহমদের। হাসি চেপে আবার বলল রানা, 'হ্যাঁ, আপনার জন্যে ছোট একটা সারপ্রাইজ অপেক্ষা করছে। মনে রাখবেন, ওর টার্গেট কখনও ব্যর্থ হয় না। তিন মিনিট ধরে আমাদের দিকে পিস্তল তাক করে রেখেছে। আওয়াজ পাননি?' ডানদিকে তাকাল রানা, তারপর গলা চড়িয়ে বলল, 'বেরিয়ে এসো, কেয়া। ইন্সপেক্টর ফয়েজ আহমেদের সাথে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই।'

আড়াল থেকে একটা বোল্ডারের ওপর উঠে দাঁড়াল কেয়া। হাতে মাউজার। মুখে হাসির ছিটেফোঁটাও নেই, শুধু ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ একটু বাঁকা রেখা মত দেখা গেল।

'অন্তত এই একবার, একেবারে ঠিক সময়ে হাজির হয়েছ তুমি,' বলল রানা। হতচকিত ফয়েজ আহমেদের দিকে তাকাল ও। 'এরই নাম কেয়া চৌধুরী, ইন্সপেক্টর। আমি আপনাকে ওর সাথে কোনরকম ট্রিকস খাটাবার পরামর্শ দেব না। তার চেয়ে চুপচাপ বসে থাকুন, ঢিল করে দিন শরীরটা। আর, যদি পারেন, মুখ বুজে থাকুন। কেয়ার সাথে জরুরী কিছু কথা আছে আমার। তাই না, কেয়া?'

'তাই কি?' পাল্টা প্রশ্ন করল কেয়া। গলার আওয়াজটা ঠাণ্ডা, নির্বিকার শোনাল।

'দাঁড়াও, ব্যাপারটা আমাকে...' শুরু করল ফয়েজ আহমেদ, কিন্তু হাত নেড়ে তাকে থামিয়ে দিল রানা।

কেয়াকে বলল রানা, 'আমাদের কথা আড়াল থেকে তুমি শুনেছ কিনা জানি না। না শুনে থাকলে এখন শুনে নিশ্চয়ই খুব আশ্চর্য হবে যে পুলিস আকরামকে গ্রেফতার করেছে। আর আকরাম কি করেছে জানো? সব বলে দিয়েছে। সব কথার মধ্যে এই কথাটাও আছে—আবিদ নয়, ট্রেন থেকে ধাক্কা দিয়ে তুমিই তাকে ফেলে দিয়েছ। এখন বলো, কার কথাটা সত্যি? তোমার, নাকি আকরামের?'

কিছু না বলে ছোট্ট লাফ দিয়ে বোল্ডার থেকে নামল কেয়া। পাথরের গায়ে হেলান দিল সে। মাউজারটা ওদের দিকে এখনও তাক করে আছে। ঠোঁটের কোণে বাঁকা রেখাটা আগের মতই ক্ষীণ, কিন্তু তার চেহারা দেখে মনে হলো, সাংঘাতিক ক্লান্ত, যে-কোন মুহূর্তে জ্ঞান হারাতে পারে।

'কে, কেয়া? কে ধাক্কা দিয়েছে আকরামকে?' নরম-সুরে জানতে চাইল রানা, যেন ছোট একটা মেয়েকে অপরাধ স্বীকার করতে বলছে ও। 'তুমি?'

'হ্যাঁ, আমি,' নিচু, কিন্তু বিকৃত, হিসহিসে শোনাল কেয়ার কণ্ঠস্বর। 'কি আসে যায় তাতে?'

'যায়,' বলল রানা। 'অনেক, অনেক কিছু আসে যায়।' একটু থেমে আবার বলল ও, 'দুঃখের বিষয়, আবিদ যে বছর দেড়েক আগে মারা গেছে সেটা তুমি জানতে না।'

শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল কেয়ার। 'মিথ্যে কথা!' গলার রগ ফুলে উঠল। চিৎকার করে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু হঠাৎ যন্ত্রণায় কাতর হয়ে উঠল চেহারা, একটা হাত উঠে গেল কপালে।

'না, কথাটা সত্যি। আবিদ বেঁচে নেই,' বলল রানা। খুঁটিয়ে, তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ্য করছে কেয়াকে। 'তুমি যদি জানতে আবিদ মারা গেছে তাহলে এত সব কিছুই ঘটত না, ঘটত কি? কাল রাত পর্যন্ত আমাকে তুমি বোকা বানিয়ে রেখেছিলে। কিন্তু ধরা পড়ে গেলে নিজেরই দোষে, ওভার অ্যাকটিং করতে গিয়ে। আবিদের গলা অনুকরণ করাটা প্রথমবার কাজে লেগে গিয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয়বার ওটাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করা উচিত হয়নি তোমার। বাড়িটার জানালা-দরজা

আগেই পরীক্ষা করা ছিল আমার, কাজেই জানতাম বাইরে থেকে কেউ ভেতরে ঢুকতে পারে না। ঢোকেনি। এরপর পেলাম বুলেট। বুঝলাম, তোমার পিস্তল থেকেই গুলিটা ছোঁড়া হয়েছে। বাড়ির ভেতরে তখন মাত্র একজনই ছিল যে গুলি ছুঁড়তে পারে এবং তোমার নাম ধরে ডাকতে পারে। সে তুমিই। দুয়ে দুয়ে চার, যোগ করতে শুরু করলাম। তুমি যদি কাল রাতে আবিদের গলা অনুকরণ করে থাকো, তাহলে নঈমের ফ্ল্যাটেও সেই তুমিই তার গলা অনুকরণ করেছিলে। এখন বলো, এ-কাজ তুমি করলে কেন? এর কারণ কি এই নয়, আবিদকে খোঁজার ব্যাপারটা যতটা সম্ভব গোলমেলে করে তোলার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছিলে তুমি?'

কেয়ার মুখে একটা পেশী বার কয়েক কেঁপে উঠেই থেমে গেল। কোন কথাই বলল না সে।

'এরপর যে সমস্যাটা ভোগায় আমাকে—জাফর, মনসুর আর শামিমা মারা গেল কেন? একটা ব্যাপার কমন ছিল ওদের—আবিদ সম্পর্কে কিছু না কিছু তিনজনই জানত। এমন কিছু, যা তাদেরকে আবিদের কাছে পৌঁছুতে সাহায্য করবে। আবিদ যদি বেঁচে না থাকে, কে তাদেরকে খুন করল?'

রানার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে ঘন ঘন চোখের পাতা ফেলল কেয়া। রীতিমত আওয়াজ করে হাঁপাতে শুরু করেছে সে। চোখে অসুস্থ, ক্লান্ত দৃষ্টি।

'আবিদ ফিরোজ চৌধুরীর সাথে বেঈমানী করেছে, শাহেদের এই কথাটা বিশ্বাস করাই মস্ত ভুল হয়ে গেছিল আমার,' আগের মত শান্ত, ঘরোয়া আলাপের সুরে বলে চলল রানা। 'শাহেদ মিথ্যে কথা বলেনি, কথাটা নিজেও সে বিশ্বাস করত। কিন্তু কিছুই তার নিজের চোখে দেখা নয়, শোনা। শুনেছিল তোমার মুখ থেকে, তাই না, কেয়া? কিন্তু ফিরোজ চৌধুরীর গোপন আস্তানার কথা পাঞ্জাবীদেরকে আবিদ নয়, বলে দিয়েছিলে তুমি। হ্যাঁ, বেঈমানী আবিদ নয়, করেছিলে তুমিই। কি, ভুল বললাম?'

থরথর করে কেঁপে উঠল কেয়া। একটা হাত উঠে গেল মুখে।

'সম্ভাব্য, একমাত্র সম্ভাব্য ব্যাখ্যা এটাই হতে পারে,' বলল রানা। 'আমি তোমাকে দোষ দিচ্ছি না। পাঞ্জাবীরা কি রকম পাষণ্ড, আমি জানি। প্রথমে তারা তোমার ওপর অত্যাচার চালায়, কিন্তু সব তুমি মুখ বুজে সহ্য করো, কিছুই ফাঁস করে দাওনি। এরপর তারা শাহেদকে নিয়ে পড়ে। শাহেদ জ্ঞান হারাবার পর আবার তারা তোমার কাছে ফিরে আসে, তাই না? এবং এইবার তারা তোমাকে দিয়ে কথা বলাতে পারে। ফিরোজ চৌধুরীর আস্তানার কথা ওদেরকে তুমি বলে দিলে, পাশে বসে সবই শুনল আবিদ। তোমার জন্যে দুঃখ হলো তার, মায়া হলো, তাই তোমার বদনাম তুলে নিল নিজের কাঁধে। যুদ্ধের সময় এই ধরনের অবিশ্বাস্য ত্যাগ স্বীকারের কাহিনী অনেক শুনেছি আমরা। এক ধরনের মহত্ত্ব দেখাবার তাড়না থেকে মানুষ এইরকম আশ্চর্য সব আচরণ করে থাকে। শাহেদ জ্ঞান ফিরে আবিদের মুখে শুনল ফিরোজ চৌধুরী এবং দলের সাথে বেঈমানী করেছে সে। অপরাধী নিজেই নিজের অপরাধ স্বীকার করছে, কাজেই অবিশ্বাস করার কোন কারণ ছিল না শাহেদের। কি, কেয়া, কোথাও ভুল হচ্ছে আমার?'

কিছু বলার জন্যে মুখ খুলল কেয়া, কিন্তু ভেতর থেকে কোন শব্দ বেরুল না। মাছের মত বার কয়েক খাবি খেয়ে আবার বন্ধ হয়ে গেল মুখ। মুখের রঙ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। মাঝেমধ্যে টলে টলে উঠছে শরীর, যে-কোন মুহূর্তে পড়ে যেতে পারে।

'গোটা রহস্যের এটাই চাবি,' কেয়ার ওপর নজর রেখে বলে চলল রানা, 'প্রতিশোধ নেবার তাগাদাটা আসে আকরামের তরফ থেকে। আসল কথা ফাঁস হয়ে যাবে, সব জেনে ফেলবে আকরাম, এই ভয়ে অস্থির হয়ে উঠলে তুমি। তুমি মনে করেছিলে আকরাম যদি আবিদকে পায়, এবং মারতে যায়, নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে সব কথা বলে দেবে আবিদ। সেজন্যেই ওকে খোঁজার ব্যাপারটা যতটা সম্ভব গোলমেলে করে তোলার জন্যে সম্ভাব্য সব কিছু করো তুমি। তারপর জাফর আর মনসুর যখন ক্লু পেয়ে আবিদের খোঁজে বেরুল, ওরা আবিদের সন্ধান পেয়ে যাবে মনে করে ওদেরকে তুমি খুন করলে। শামিমা আর আমার পিছু নিলে তুমি, তারপর যখন শুনতে পেলে শামিমা এই দ্বীপের কথা বলে দিয়েছে আমাকে, ভয় পেয়ে তাকেও তুমি খুন করলে।' ঝট্ করে একটা হাত কেয়ার দিকে লম্বা করে দিল রানা, তর্জনী খাড়া করল তার দিকে, বলল, 'এসবের পেছনে তুমিই দায়ী, কেয়া! আবিদ নয়।'

আগাম কোন আভাস না দিয়ে হঠাৎ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল কেয়া, 'হ্যাঁ! আমি! আমিই ফিরোজের সাথে বেঈমানী করেছি! তুমি জানো না, কল্পনাও করতে পারবে না আমার ওপর কি অত্যাচার করেছিল ওরা! আমার দোষ নিজের ঘাড়ে নিক আবিদ, আমি সেটা চাইনি। বোকাটা আমাকে ভালবাসত! যেন ওর মত একটা হাঁদারামের ভালবাসা পেলে আমি বর্তে যাব! হ্যাঁ, সব আমিই করেছি! এক এক করে খুন করেছি ওদেরকে!' এক পাশে সরে গিয়ে পিছু হটতে শুরু করল সে। পিস্তল নেড়ে ভয় দেখাল ওদেরকে। 'নোড়ো না!' ফয়েজ আহমেদ উঠে দাঁড়াতেই চিৎকার করে বলল সে। 'জেলে ভরবে, সেটি হবে না। খবরদার! সামনে বাড়লেই গুলি করব আমি।'

ঘুরে দাঁড়াল কেয়া, তারপর ছুটল। চোখের পলকে জঙ্গলের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

হুঙ্কার ছেড়ে ছুটল ফয়েজ আহমেদ, কিন্তু জঙ্গলের আরেক দিক থেকে দু'জন লোককে বেরিয়ে আসতে দেখে থমকে দাঁড়াল সে। 'ওকে ধরো, আলতাফ!' বাজখাঁই গলায় নির্দেশ দিল সে। 'কোনমতেই যেন পালাতে না পারে!'

কেয়ার পিছু নিল বটে, কিন্তু আলতাফ বা অপরজন কেয়ার সাথে পেরে উঠবে বলে মনে হলো না রানার। শান্তভাবে বলল ও, 'বেশি দূর যেতে পারবে না ও।'

মিনিট সাতেক অপেক্ষা করল ওরা। রানার দৃষ্টি অনুসরণ করে কাছের একটা ঢিবির দিকে তাকাল ফয়েজ আহমেদ। মাথায় দাঁড়িয়ে আছে কেয়া। বাতাসে তার চুল উড়ছে। আরও একটু এগিয়ে এসে ঢিবির কিনারায় দাঁড়াল সে। ওর পায়ের কাছ থেকে ঝপ্ করে নেমে এসেছে ঢিবির গা। সেখান থেকে লাফ দিল কেয়া। তীক্ষ্ণ আর্ত চিৎকারটা পরিষ্কার শুনতে পেল ওরা। মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকাল রানা।

দু'জন কনস্টেবল খোলা মাঠের ওপর দিয়ে পুলিস বোটের দিকে এগোল। দু'জনের কাঁধে একটা বোঝা রয়েছে, কম্বল দিয়ে মোড়া।

একটা বোল্ডারের ওপর বসে সিগারেট ফুঁকছে রানা। সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে ইন্সপেক্টর ফয়েজ আহমেদ। হাত দুটো কোটের পকেটে ভরা। কপালে চিন্তার রেখা। মাঝেমধ্যে মুখ তুলে তাকাচ্ছে রানার দিকে। টিনাকে দেখতে পাচ্ছে না কেউ।

'হুম,' ভোঁতা একটা আওয়াজ করল ফয়েজ আহমেদ। 'দেখা যাচ্ছে, এবারও তোমাকে আমরা ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছি।' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল সে। 'তোমার মত ভাগ্যবান লোক এ লাইনে আমি আর দেখিনি, ডিউক!'

'আমার সম্পর্কে আপনার ধারণাটা আগাগোড়াই ভুল,' একটু হেসে বলল রানা। 'লোক আসলে আমি খারাপ না! কিন্তু দোষ একটাই, মানুষকে আমি সাহায্য করতে রাজি হয়ে যাই।'

'জানি,' বিদ্রূপের হাসি দেখা গেল ফয়েজ আহমেদের ঠোঁটে। 'চল্লিশ হাজার রূপী কেউ সাধলে আমিও তোমার মত মানুষকে সাহায্য করতে রাজি হয়ে যাব। এই শেষবার সতর্ক করে দিচ্ছি তোমাকে আমি, ডিউক, ভাল হয়ে যাও!'

'যত টাকাই ও আমাকে দিয়ে থাকুক,' বলল রানা, 'যা খাটিয়ে নিয়েছে আর ভুগিয়েছে, তার তুলনায় এই মজুরি খুবই কম। দেশের সমস্ত লোক আমার চেহারা দেখে ফেলেছে। শুধু কি তাই? বেয়াড়া একদল পদাতিক বাহিনী পিছু ধাওয়া করেছে আমাকে। তারপর, আমাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হয়েছে। কত আর বলব! এখন আবার আরেক ঝামেলা, আপনার সাথে যেতে হবে আমাকে, জবানবন্দী লিখতে হবে। আপনিই বলুন, লাইফ হেল হতে আর বাকি থাকল কি?'

'ঢাকায় পৌঁছে বেশিক্ষণ আটকে রাখব না তোমাকে,' কথা দিল ফয়েজ আহমেদ। 'সাথে কিছু নেবে নাকি?'

খানিক ইতস্তত করে মাথা নাড়ল রানা। 'না। আপনি তৈরি হলেই রওনা হতে পারি আমরা।'

হাসল ফয়েজ আহমেদ। 'তোমার বোট কোথায়? দ্বীপে এলে কিভাবে?' চোখেমুখে সবজান্তার একটা ভাব ফুটে উঠল।

'ওটা দ্বীপের আরেকদিকে আছে,' বলল রানা। 'শুধু শুধু সময় নষ্ট করে লাভ কি? চলুন।'

'আর সেই মেয়েটা,' জানতে চাইল ফয়েজ আহমেদ, 'যে ট্রেন থামিয়ে তোমাকে পালাবার সুযোগ করে দিয়েছিল? সে কোথায়? পুলিসের কাজে বাধা সৃষ্টি করলে ফাইন দিতে হয়, জানো না? তাকে তো আমরা এখানে রেখে যেতে পারি না।'

'চেইন টানতে কেউ দেখেনি ওকে,' বলল রানা। 'কসম খেয়ে বলছি, এসবের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। কোর্টে যাবেন, সে উপায় নেই আপনাদের। যথেষ্ট এভিডেন্স কোথায়? তার চেয়ে, ওর কথা ভুলে যান।'

কান খাড়া হয়ে গেল ঝোপের আড়ালে দাঁড়ানো টিনার।

'ভুলে যাব? উঁহুঁ, দুঃখিত, তা সম্ভব নয়। অন্তত তার সাথে একবার দেখা না করে ফিরে যেতে পারি না আমি।'

'দেখুন, ইন্সপেক্টর,' আবেদনের সুরে বলল রানা, 'মেয়েটা···ওর মত ভাল মেয়ে হয় না। শুধু শুধু এসবের সাথে ওকে জড়ালে বেচারীর মান-সম্মান নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে। অথচ আপনাদের তাতে লাভ হবে না কিছুই। এটা ওদের দ্বীপ। বোটটাও ওদের। যখন ইচ্ছে হবে, মেইনল্যান্ডে ফিরে যেতে পারবে সে। একবার অন্তত মিষ্টি, ভদ্র একটা মেয়েকে তার মর্যাদা বাঁচাবার সুযোগ দিন, প্লীজ!'

চোয়াল চুলকাতে শুরু করল ফয়েজ আহমেদ। 'ও তো আবিদুর রহমানের বোন, তাই না?'

'ও কে তা আপনি ভাল করেই জানেন,' বলল রানা। 'আপনি যদি এসবের সাথে জড়ান ওকে, খবরের কাগজে ওকে নিয়ে নানা কথা লেখা হবে। আমার নামের সাথে ওর নামটা জড়িয়ে পড়ুক, এ আমি চাই না। ডিউকের একটা বদনাম আছে, আমি চাই না তার ছোঁয়া ওকে লাগুক। আপনারও তো একটা মেয়ে আছে, তাই না? আমার সাথে যদি আপনার মেয়ের নাম জড়িয়ে খবরের কাগজে আজেবাজে কিছু ছাপা হয়, আপনার কেমন লাগবে? প্লীজ, ইন্সপেক্টর···'

'ওতে কাজ হবে না, ডিউক। আমার মেয়ে নেই, ছেলে আছে।' তারপর নিঃশব্দে খানিক হেসে জানতে চাইল, 'এই মেয়েটা কি মুক্তিযুদ্ধের সময় মেসেজ আনা-নেয়া করত?'

'আপনি তো সবই জেনেছেন!'

'হুঁ,' গম্ভীর দেখাল ফয়েজ আহমেদকে। 'ঠিক আছে, তোমার কথা রাখতে পারি আমি, তবে এক শর্তে।'

'কি শর্ত?' ব্যগ্রভাবে জানতে চাইল রানা।

'কেয়াই যে সব কিছুর পেছনে ছিল, সেটা তুমি আবিষ্কার করেছ,' বলল ফয়েজ আহমেদ। 'কিন্তু আসলে তুমি নও, আবিষ্কার করেছি আমি। অর্থাৎ কেসটা সল্‌ভ করেছি তুমি নও, আমি।' নিজের বুকে আঙুল ঠুকে নিজেকে দেখাল সে। 'এই আমি। রাজি আছ?'

'আছি!' তাড়াতাড়ি বলল রানা। 'সব কৃতিত্ব আপনার।'

এক গাল হাসল ফয়েজ আহমেদ। 'সত্যি, মাঝেমধ্যে লোক তুমি খুব একটা খারাপ নও!'

একটু পর। পুলিস বোটের দিকে এগোল ওরা।

কাঁপা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল টিনা।

'আরে, মেয়েটাকে গুডবাই জানাবে না তুমি?' অবাক হয়ে জানতে চাইল ফয়েজ আহমেদ। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। 'যাও, যাও, আমরা তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি। দেখো, বিদায় নিতে গিয়ে আবার যেন প্রেম না উথলে ওঠে! বেশি দেরি আমি সহ্য করব না।'

'উঁহুঁ,' বলল রানা। 'বিদায় নেবার দরকার নেই। মেয়েটা অন্যরকম···মানে

আমার টাইপের না। তাছাড়া, নেভিতে ওর একজন বয়-ফ্রেন্ড আছে। জটিলতা এড়িয়ে চলাই ভাল, তাই না?'

'তুমি দেখছি আমাকে হতাশ করলে, হে! আমার ধারণা ছিল, মেয়েদের ব্যাপারে ভারি এক্সপার্ট লোক তুমি। এটাকে বুঝি বাগে আনা গেল না?'

ফয়েজ আহমেদের কথা বোধহয় শুনতেই পায়নি রানা। হাঁটছে, কিন্তু মাঝে মাঝে পিছন ফিরে চাইছে ও। তাকাচ্ছে টিবির ওপর বাড়িটার দিকে। আশা, শেষ একবার যদি একটু দেখতে পায় মেয়েটাকে।

কেউ জানল না, ঝোপের আড়ালে একটা জিগে গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দু'হাতে চোখ ঢেকে ডুকরে ডুকরে কাঁদছে তখন মেয়েটা।